অনন্ত সিংহ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৬৬

প্রকাশক

ময়ূখ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর

অনিলকুমার ঘোষ

শ্রীহরি প্রেস

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী

রবীন দত্ত

আট টাকা

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন

মাস্টারদা—ভারতগৌরব চট্টল রবি—সূর্য সেন—হে বীর মহানায়ক আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর। জন্মভূমির পরাধীতার গ্লানি—দেশবাসীর চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের কালিমা গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তোমার অন্তরের অন্তঃস্থল—সাম্রাজ্যবাদীর উৎপীড়ন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানাতে তাই ডাক দিয়েছিলে দেশের ছাত্র ও যুবকদের। অন্তরভরা ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা দিয়ে জয় করে নিয়েছিলে তাদের হৃদয়। তোমার অতলস্পর্শী স্বদেশ-প্রেমের যাদুস্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল শত শত ম্রিয়মান প্রাণ—উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল শত সহস্র হৃদয়—কণ্ঠে কণ্ঠে তাই ঝঙ্কৃত হয়েছিল—"বন্দে মাতরম্"—"ভেঙেছো দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়!" আকাশ-পাতাল কাঁপানো সেই ধ্বনিতে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের ভিত! অলিখিত অক্ষরে সেইদিনই লেখা হয়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের ভাগ্যলিপি!

হে জননায়ক! তোমার পরিচয় শুধু বিপ্লবী বীরই নয়—তুমি যে আমাদের সকলেরই অতি প্রিয়—অতি নিকটের প্রতিদিনের মাস্টারদা! তুমি দুর্গম পথের সাথী—ব্যথার ব্যথী—জীবনের সুখ-দুঃখ বিপদ-আপদ সকলের সাথেই প্রতিনিয়ত সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছ। সবাইকার সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রাগ-বিদ্বেষ হাসিমুখেই পদে পদে ক্ষমা করেছ—বিনিময়ে সব কাজের মাঝে—সকলের মাঝে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছ! তোমার অটুট ধৈর্য, অতুলনীয় মনোবল, সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করেছিল বাংলা মায়ের অশান্ত দামাল ছেলের দলকে; সৃষ্টি হয়েছিল তোমারই একান্ত চেষ্টায় বাংলার তথা বিশ্বের গৌরব—তরুণ ছাত্র-বাহিনী—সুকুমার কোমল হাতের বজ্রকঠিন আঘাতে যারা ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছিল পর-সম্পদ লুণ্ঠনকারী অত্যাচারী প্রতিপক্ষকে—নীরব করে দিয়েছিল বৃটিশ সিংহের সিংহনিনাদ—!

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বেদীমূলে কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘাযতীন বিপ্লবের যে দীপশিখা জ্বালিয়েছিল—সেই দীপশিখা তোমার

হাতে ভীষণ মশাল আকারে চারিদিক উদ্ভাসিত করে জ্বলে উঠেছিল। অভ্রান্ত চিন্তার নির্ভুল বিচারে রচিত হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস। দুর্বল কোমল অহিংসা-নীতি তোমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিশ্চয়ই বুঝেছিলে যে—উগ্র ও কঠোর দমননীতির পদতলে আত্মসমর্পণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন উগ্রতর ও কঠোরতম প্রতিঘাত শক্তির।

একদা রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী নেতারা যদি চরকার গুঞ্জন ও অহিংসা নীতির আড়ালে আত্মগোপন করে রক্তক্ষরা বিপ্লবের বিভীষিকাময় দুর্গম পথের ঝড়-ঝঞ্ঝা পরিহার করে চলার সংকল্প গ্রহণ না করতেন—যদি তাঁরা তোমারই মতো স্থির লক্ষ্যে অবিচলিত থেকে—গান্ধীজীকে fair trial দেওয়ার সুযোগের নামে অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী না হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হতেন--তবে হয়তো ভারত আজ প্রকৃত স্বাধীনতাই অর্জন করতো—সাম্রাজ্যবাদীর কারখানার ছাঁচে ঢালাই—ইংরেজের হাতে তৈরী ভাঙা পাকিস্তান ও ভাঙ্গা হিন্দুস্তানে ভিক্ষার ঝুলি ভর্তি করে সন্তুষ্ট থাকার দরকার হতো না।

হে সত্যের—সাহসের পূজারী সূর্য সেন—আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রিয় মাস্টার দা—নিজ সংকল্পে অবিচলিত থেকে অবাঞ্ছিতের বিরুদ্ধে অবিরাম রক্তক্ষরা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই তুমি শ্রেয় এবং কাম্য মনে করেছিলে—তাই রাইফেলের গুলি, ফাঁসির দড়ি তোমাকে সাদর আলিঙ্গনের জন্য প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত জেনেও, তোমার মস্তকের মূল্য সরকারী ঘোষণায় ক্রমবর্ধমান—এ তথ্য অবগত থাকা সত্বেও, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পরেও মাসের পর মাস—একটার পর একটা মারাত্মক আঘাত সাম্রাজ্যবাদীদের উপর অবিরত হেনে গিয়েছিলে। তোমার চোখে—তোমার আদর্শে--জীবনমৃত্যুর কোন সত্বা ছিল না আলাদা—সংজ্ঞা ছিল না ভিন্ন। মৃত্যুভয় তোমাকে পারেনি কোনদিন আদর্শচ্যুত—লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে! তাই তুমি বেছে নিয়েছিলে আমরণ সংগ্রামের কাঁটা বিছানো পথ!—মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচনের জন্য নিজের জীবন—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তোমার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। তাই তুমি পারনি—বাংলা দেশ তথা ভারতে তোমার বৈপ্লবিক ভূমিকায় যবনিকা টেনে—রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ আরো অনেক বিপ্লবী নেতাদের পথ অবলম্বনে—সুদূর বিদেশে সুখে শান্তিতে বসবাস করে—সুদূর ভারতের বিপ্লব পরিচালনার সুপ্রশস্ত পথ বেছে নিতে। যদি পারতে

—যদি চাইতে—তাহলে হয়তো—এত অকালে এত অনায়াসে দুঃখীনী বাংলা মায়ের কোল খালি করে বাংলার গৌরব সূর্য এত অসময়ে অস্ত যেতো না—!

বাংলার সেই লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক্—বাংলার তরুণ প্রাণে সঞ্চারিত হোক মাস্টারদার মাভৈঃ বাণী—নিজেদের দীক্ষিত করে নিক তারা চির ভাস্বর সূর্য সেনের অগ্নিমন্ত্রে—"করিব অথবা মরিব এ পণ ধ্বনিয়া তুলুক ভারত গগন"—সামান্য এ আশা নিয়ে—জীবনের সায়াহ্নে যুব-বিদ্রোহের শেষ পর্ব রচনা সুরু করলাম—

মাস্টারদার জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে তিনটি গ্রন্থে—

১। অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

২। চট্টগ্রাম-যুব-বিদ্রোহ—১ম খণ্ড

৩। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ—২য় খণ্ড

প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে ওই তিনটি গ্রন্থের চুম্বক—এই পুস্তকের প্রথম কয়টি পাতায় সন্নিবেশিত হলো।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক—মাস্টারদা (সূর্য সেন), অনুরূপদা (অনুরূপ সেন—বুড়ুল হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষক), চারুবিকাশ দত্ত, অম্বিকাদা (অম্বিকা চক্রবর্তী), জুলুদা (নগেন্দ্রনাথ সেন), প্রমুখের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একটি গোপন বিপ্লবীদল সংগঠনের কাজ সুরু হয়েছে।

জনগণের স্বাধীনতা-বিরোধী কুখ্যাত রাউলাট্ আইনের প্রতিবাদ কল্পে গভর্নমেন্টের আদেশের বিরুদ্ধে জালিয়ানওয়ালাবাগে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ একটি সভায় মিলিত হয়।

বৃটিশ শাসকবর্গের নির্দেশে সেনাপতি মিঃ ডায়ার আইন অমান্য করার শাস্তিস্বরূপ সেই প্রতিবাদ সভায় সমবেত শত শত নর-নারীকে নির্বিচারে হত্যা করেন। এই অমানুষিক নৃশংসতায় সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-সরকারের শাসন ও দমননীতির বিরুদ্ধে অহিংসা মন্ত্রের উপাসক মহাত্মা গান্ধীজী অহিংসনীতিতে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। এই সময় ভারত তথা বাংলার বিপ্লবী-সমাজও চুপচাপ বসে ছিল না। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ বিপ্লবীদল সংগঠনের প্রস্তুতি-পর্ব অপ্রতিহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধীজী এই অধিবেশনে অহিংস-অসহযোগ-নীতিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার প্রস্তাব করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বিজয় রাঘব চারিয়ার সভাপতিত্বে নাগপুর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২০—২১ খৃষ্টাব্দে এই অহিংসনীতির ভিত্তিতে কংগ্রেসের 'গণ-আন্দোলন আরম্ভ হলো। ছাত্র-ছাত্রী সরকারী বিদ্যালয় বর্জন করলেন। অনেক প্রখ্যাত উকিল ব্যারিস্টার আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করলেন—ঘরে ঘরে চরকার গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল। দেশময় সেবা ও ত্যাগের বন্যা বয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসককুল বিচলিত হয়ে কঠোর দমননীতি শুরু করলেন। দলে দলে স্বেচ্ছসেবকেরা গ্রেফতার হলেন, পুলিশদলের বেপরোয়া লাঠিচার্জে—সভা, শোভাযাত্রা সমস্ত তচ্‌নচ হয়ে গেল!

কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে ১৯২০—২১ সালের গণ-আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতে বাংলার বেশীর ভাগ পুরাতন বিপ্লবী নেতারাও গা ভাসিয়ে দিলেন। চট্টগ্রামে আমাদের বিপ্লবী সমিতির সকলেও অহিংস—অসহযোগ-আন্দোলনের প্রভাব-মুক্ত থাকতে পারলেন না।

এই সময় চট্টগ্রামের এই বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। চারুবিকাশ দত্ত অনুশীলন পার্টির পুরাতন নেতাদের প্রভাবে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সর্বান্তকরণে যোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন। মাস্টারদার নেতৃত্বে গুপ্ত-সমিতির অন্যান্য তিনজন নেতা চারুবাবুর ঐরূপ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করলেন!

এই মতবিরোধ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠলো। আমরা, যারা, এই গুপ্ত-সমিতির প্রথম শ্রেণীর সদস্য ছিলাম, চারুবাবু আমাদের একভাবে বোঝাতে লাগলেন আর অন্য চারজন নেতাই—চারুবাবু এই গুপ্ত-সমিতির নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধতা করছেন বলে তাকে অভিযুক্ত করলেন। সভা ডাকা হোল। নিম্নলিখিত প্রথম সারির সংগঠকেরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন :—

(১) নির্মলদা (নির্মল সেন) আমার সহপাঠি ও বিশেষ বন্ধু—

(২) শহীদ প্রমোদ চৌধুরী, (জেলে ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যাপরাধে যার ফাঁসি হয়।)

(৩) আমার দাদা নন্দলাল সিংহ

(৪) আমাদের সহপাঠী নবীন চক্রবর্তী

(৫) মহেন্দ্র—

(৬) কেদারেশ্বর দাসগুপ্ত

(৭) আমি—অনন্ত সিংহ

অম্বিকাদা ভিন্ন—চারজন নেতাই—১। অনুরূপ দা ২। মাস্টার দা ৩। জুলু দা ৪। চারুবিকাশ দত্ত—এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় সমিতির Constitution লেখা খাতাটি খুলে অনুরূপদা আমাদের পড়ে শোনালেন যে, তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে গোপন বিপ্লবী-সমিতি গড়ে তুলছেন। কোন প্রাক্তন বিপ্লবী বা বিপ্লবী দলের নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁরা বর্তমানে থাকবেন না। যদি কোন বিপ্লবী দাদা বা কোন বিশেষ পুরোনো বিপ্লবী দল পর্যাপ্ত পারমাণে অস্ত্রশস্ত্র দিতে পারেন ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের পরিচালিত করতে পারেন তবেই সেইরূপ নেতৃত্বকে তাঁরা আনুগত্য জানাবেন। এই নিয়ম ভঙ্গ করে যদি কেউ এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের সেই বিপ্লবী সমিতি ছাড়তে চায় তাহলে তাকে তাঁরা প্রাণদণ্ড দেবেন। ইংরেজীতে হুবহু লেখা ছিল"……In that case, he will be done away with !"

চারুবাবুকে নেতারা ও আমরা সকলে মিলে অনুনয়-বিনয় করলাম যাতে তিনি একা এককভাবে দলত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন। চারুবাবু বললেন: "আমি শঙ্করদার (গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী) রিক্রুট। শঙ্করদা ঢাকার অনুশীলন পার্টির সদস্য। কাজেই আমি মনে করি আমাদের এই বিপ্লবী সংঘ অনুশীলন সমিতিরই একটি অংশ!" চারুবাবু একাই এই মতের একমাত্র সমর্থক। আমাদের মধ্যে প্রমোদ চৌধুরী ভিন্ন অন্য কারও সমর্থন তিনি পেলেন না। চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র এই বিপ্লবী দলটি ভাগ হয়ে গেল। চারুবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সংশ্লিষ্ট যেসব বিপ্লবী যুবকেরা ছিল তাদের নিয়ে তিনি অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিলেন।

মাস্টারদা তখনও জেলা কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারী। কিন্তু তিনি অহিংস-অসহযোগ নীতি অন্তর থেকে কখনও সমর্থন করেন নি। রক্তক্ষরা বিপ্লবের পথ ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আসবে—এ বিশ্বাস মাস্টারদার আদৌ ছিল না। আমরাও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ

চালাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা দরকার। জুলুদার চেষ্টায় সামান্য কয়েকটি অস্ত্র মাত্র জোগাড় হয়েছিল। প্রস্তুতির জন্য আরও অস্ত্রশস্ত্র চাই এবং তার জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন।

অহিংস-অসহযোগ-আন্দোলন তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে—নীতিগত বিরোধ থাকা সত্বেও বাংলার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলিও এই সঙ্গে হাত মেলাল—আমরাও বাদ গেলাম না। দুই তরফেই এটা একটা কূটনৈতিক চাল। অহিংস-নীতিতে বিশ্বাসী কংগ্রেস সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান—অহিংসাই তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের হাতিয়ার—অপর পক্ষে কংগ্রেসের নন্‌ভায়োলেন্স নীতি—আমরা সবাই কখনই অন্তর থেকে সমর্থন করি নাই। মাত্র কৌশল হিসেবে—সাময়িক ভাবেই মাস্টারদার নেতৃত্বে এই নীতি আমরা মেনে চলবো—এই নন্ ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালেই সশস্ত্র যুব বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হবো। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুদের লোভজর্জর ক্ষুধাটিকে আঘাতে আঘাতে স্তব্ধ করে দেবো। শক্ত হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে আঘাতের পর আঘাত হানবো—এই আমাদের সিদ্ধান্ত। বিভিন্ন তরুণ বিপ্লবী দলও এই আন্দোলনকে বিপ্লবের অস্ত্ররূপেই শুধু নয় বিপ্লবের প্রাণ রূপেও গ্রহণ করলেন। বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসে প্রবেশ করে তরুণ দলকে আরও ব্যাপক ভাবে নিজেদের ভাবধারার প্রতি আস্থাবান করে তোলা। কিন্তু বৃটিশ সরকারের নৃশংস অত্যাচারের মুখে অহিংস আন্দোলন অহিংসার গণ্ডিতে আবদ্ধ রইল না। বিহারের চৌরী চৌরাতে বিক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ফলে ২২ জন পুলিশ মৃত্যুমুখে পতিত হলো। চৌরী-চৌরার এই হিংসাত্মক কার্যে অহিংস মন্ত্রের উপাসক মর্মাহত গান্ধীজী এই আন্দোলন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ যখন শতাব্দীর ঘুম-ভাঙা সংগ্রাম-মুখর বিরাট গণ-আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনাকে শোচনীয় ভাবে নিষ্ফলতায় পর্যবসিত করে দিল তখন ভারত তথা বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মত ওসব আবেদন নিবেদনে আস্থাহীন চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীদল দেশবাসীর জঙ্গী মনোভাব জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মাস্টারদার নেতৃত্বে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যক্তিগত ভাবে হলেও আক্রমণ চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

সংগঠনের প্রস্তুতির পথে অর্থের প্রয়োজনে পড়োইকোরায় এক মহাজনের বাড়িতে তাঁরা রাজনৈতিক ডাকাতি করলেন। তারপর এই গুপ্ত-সমিতির

প্রত্যেকেই নিজের নিজের বাড়ি থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করলেন। কিছু অর্থ সংগৃহীত হলে আমরা কেউ কেউ কলকাতায় চলে গেলাম। দেবেন দে, গোপীনাথ সাহা ও আমি কলকাতার তালতলায় এক বাড়িতে আত্মগোপন করে স্যার চার্লস্ টেগার্টকে হত্যা করবার একটি নির্দিষ্ট কর্ম-সূচী গ্রহণ করলাম। গোপীনাথের নেতৃত্বে আমরা তিনজন নির্দিষ্ট সময়ে বোমা ও পিস্তল নিয়ে বিভিন্ন নির্দিষ্ট পথে রওনা হলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দেবেন দে নিজের পকেটে রক্ষিত বিস্ফোরক দ্রব্যের আকস্মিক বিস্ফোরণে আহত হন। আমাদের "টেগার্ট হত্যার" পালা সেইবারের মত এই ভাবেই শেষ হল।

সন্তোষদার নেতৃত্বে কলকাতা ও কলকাতার চারপাশে কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত হয়। শাঁখারীটোলার পোস্টমাস্টার নিহত হন। এর পরেই "রেগুলেশন থ্রি"—এই আইনের জোরে বাংলা-সরকার জ্যোতিষদা প্রমুখ পুরোনো অভিজ্ঞ নেতাদের গ্রেফ্তার করে। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য বলে মনে হল। দেবেন দে ও আমি কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে এলাম। কলকাতায় জুলুদার সঙ্গে রইল গোপীনাথ, গণেশ ঘোষ ও যশোদা পাল।

কয়েকমাস আগে মা-বাবার অজ্ঞাতে বাড়ি থেকে আমি কয়েক হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে আসি। এতে বাবা আমার উপর খুব রাগ করেছিলেন। বাড়িতে ফেরার পথ আমার বন্ধ। খোকা (দেবেন দে) আমার প্রায় সমবয়সী। চটগ্রাম স্টেশনে নেমে ট্রাঙ্ক বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিয়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবো এ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। অল্প বয়স—মাত্র স্কুলের ছাত্র—প্রতিপত্তি বলতে আমাদের কিছুই নেই। সাহস করে সতীদার (সতীভূষণ সেন) বাসায় গিয়ে উঠলাম। তাঁরা দু' ভাই মিলে নিজেদের সাবানের কারখানায় সাবান প্রস্তুত করতেন ও নিজেরাই ব্যবসা চালাতেন। সতীদা (M. Sc.), মাস্টারদার সমবয়সী, আমার বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। তবু তিনি আমাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করলেন না।

তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নির্মলদা ও মাস্টারদাকে আমাদের আগমন-বার্তা জানালাম। দিন-দুই পরে মার সঙ্গে গোপনে দেখা করলাম। বাবার সঙ্গে দেখা করার সাহস হলো না। অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে আমাদের প্রচুর অর্থ

চাই। পাহাড়তলী Railway Factory-তে বেতন দিতে রেল-কোম্পানীর টাকা শহর থেকে নিয়ে যাওয়া হোত। অর্থের প্রয়োজনে রেল-কোম্পানীর এই টাকা আমরা লুঠ করে নেবার প্ল্যান করেছিলাম। দু'বছর আগেকার এই পরিকল্পনাটি কেবল কাগজপত্রেই নিবদ্ধ ছিল। যদিও আমরা বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নিয়ে এগোব বলে মুখে বলতাম তবু আমাদের মধ্যে সত্যিই একপ্রকার জড়তা ছিল যার জন্য আমরা ওই প্ল্যানটি বাস্তবে রূপায়িত করতে ইতস্ততঃ করছিলাম।

এই মানসিক জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রভাব হতে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে আমি "বিদ্রোহ" ঘোষণা করলাম। মাস্টারদার কাছে দাবী জানালাম প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ী এ্যাক্‌শান্ করবার অধিকার দেওয়া হোক্—প্রত্যেককে অস্ত্র দেওয়া হোক্। একের নিষ্ক্রিয়তা যেন অন্যকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে না পারে সেইজন্যই মাস্টারদার কাছে আমার এই দাবীর উত্থাপন। ঐরূপ বিদ্রোহ ঘোষণার সুফল পাওয়া গেল। বহু দিনের নিষ্ক্রিতার মোড় ঘুরে গেল। তারপর দিনই সকলে মিলে ওই টাকা লুঠ করে নেওয়া সাব্যস্ত হোল। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা চারজন—দেবেন দে, রাজেন দাস, অবনী ভট্টাচার্য ও আমি, সেই রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করলাম।

দিনদুপুরে সেই সশস্ত্র ডাকাতি সংঘটিত হোল। একটিও গুলির আওয়াজ হোল না। কেউই চেঁচামেচির সুযোগ পেলো না—আমাদের বাধা দেবার সাহসও কারও ছিল না। অতর্কিতে হঠাৎ এসে এই ডাকাতি সুসম্পন্ন করে ঝটিকাবেগে আমরা প্রস্থান করলাম।

এই সময় আমরা শহরের উপকণ্ঠ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে মুসলমান প্রধান এলাকার ছাদ-দেওয়াল ঘেরা একটা পুরোনো পাকা বাড়িতে থাকতাম। এই বাড়িটির নাম ছিল "সুলুক-বাহার"। এই ডাকাতিতে শহরে নিদারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হোল। পুলিশ অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠ্‌লো, কিন্তু "ডাকাত দলের" ও লুণ্ঠিত অর্থের কোন হদিস মিললো না। কয়েক দিন পরে পুলিশের বড়-কর্তারা আমার খোঁজে শহরে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। পুলিশের এই তৎপরতায় তাঁরা যে আমাকে ও আমার সংস্পর্শে কাউকে কাউকে সন্দেহ করছেন এটা সহজেই অনুমান করা গেল। মাস্টারদা—ওরিয়েণ্টাল হাই-স্কুলের শিক্ষক, সতীদা সাবানের ব্যবসা করেন, আমার বন্ধুরাও কলেজে পড়ে—এদের কারো কাছে পুলিস গেল না বা এদের কাউকে থানায় নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করলো না।

গোপনীয়তা বজায় রাখাই ছিল আমাদের গোপন সংগঠনের একটি অমূল্য সম্পদ। মানুষের identity গোপন রাখার দরকার হয় না, প্রয়োজন—বৈপ্লবিক Function গুলিকেই সযত্নে গোপন রাখা। মানুষ খাবে, বেড়াবে, চাকরী করবে, ব্যবসা করবে এবং সেইসব মানুষকে পুলিশ সাধারণভাবে চিনবেও—এতে কিছু আসে যায় না। বিপদ হয়, যদি পুলিশ তাদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার সুযোগ পায়।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সংগঠনের ভিত প্রথম থেকেই মাস্টারদার নেতৃত্বে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুড়ঙ্গ পথে দলের অভ্যন্তরে একটি বিভীষণকেও প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা, অবনী ভট্টাচার্য, রাজেন দাস, দেবেন দে ও আমি—মাত্র আমরা এই ক'জনেই আমাদের "সুলুক বাহার" গৃহটির অবস্থান জানতাম। মুসলমান পাড়ায় অবস্থিত ও নারী বর্জিত এই বাড়িটিতে অতগুলি হিন্দু যুবকের আনাগোনাতে সাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। ছাত্রদের 'মেস বা বোর্ডিং হিসাবেই বাড়িটির ব্যবহার করছি বলে প্রতিবেশীদের আমরা বলতাম। এইরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলেও নিরাপত্তার দিক দিয়ে এটা যথেষ্ট ছিল না; তবু অন্য আর কোন বাড়ির সুব্যবস্থা না থাকাতে ডাকাতি করার পরেই সতেরো হাজার টাকা নিয়ে আমরা প্রথমে "মুলুক-বাহারেই" গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অম্বিকাদা ও অবনী ভট্টাচার্য টাকাগুলো নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে ফেলেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় জুলুদার কাছে সেই টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এভাবে পনেরো দিন কেটে গেল। সেইদিন সকালে অম্বিকাদা ভোরের ট্রেনে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। অম্বিকাদাকে সঙ্গে নিয়ে মাস্টারদা আমাদের এই বাড়িতে উপস্থিত। তাঁদের এই আকস্মিক আগমনে আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দিল। অম্বিকাদার কাছে কলকাতার সাংগঠনিক খবর পেলাম এবং জানতে পারলাম দেবেন ও আমাকে জুলুদা কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন। মাস্টারদারও ইচ্ছা আমরা কলকাতায় যাই। কাজেই আমরা কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ পুলিশ দল "মুলুকবাহার" বাড়ি ঘেরাও করলো। তখন সেখানে আমরা ছ'জন—উপস্থিত। পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমরা বেরিয়ে এলাম। প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রমের পর দুপুর দু'টোর সময় নাগারখানা পাহাড়ে চট্টগ্রামের পুরো পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে আমাদের এক খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল।

রাজেন দাস, মাস্টারদা ও অম্বিকাদা খুব পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। জীবিত ধরা না দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাঁরা তিন জনেই তীব্র পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ গলাধঃকরণ করলেন। আমরা তিন জন পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে চলে গেলাম। তারপর সাতদিন পদব্রজে বহু পথ ঘুরে—জেলে নৌকায সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, সন্দীপের ষ্টীমার ঘাট থেকে ষ্টীমার যোগে বরিশাল খুলনা পথে কলকাতায উপস্থিত হলাম ও বিপিনদা (বিপিন গাঙ্গুলী) এবং জুলুদার সঙ্গে গোপন আশ্রয় স্থলে গা ঢাকা দিয়ে রহলাম। তাঁদের কাছেই প্রথম শুনলাম মাস্টারদা ও অম্বিকাদা বন্দী হয়েছেন—পটাসিয়াম সাযানাইডে তাঁদের মৃত্যু হযনি জেনে অবাক হলাম। রাজেন দাসকেও বিষ খেয়ে পড়ে থাকতে দেখে এসেছি—তা'র ধরা পডবার বা মারা যাবার কোন সংবাদ পেলাম না। তবে সে গেল কোথায়? তারপর কয়েকদিন পরে সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে রাজেন দাস অক্ষত শরীরে এসে উপস্থিত। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই রহস্যময় অদ্ভুত ঘটনা কেবল ৺মায়ের অসীম কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। আরও মনে হযেছিল শ্রীঅরবিন্দের ঐশ্বরিক নির্দেশেই আমরা পরিচালিত হযেছি এবং অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছি।

জুলুদা ও আমি শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে ও তাঁর কাছ থেকে বৈপ্লবিক নির্দেশ পাওযার আশায পণ্ডিচেরীতে গেলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কাছ থেকে কোন বৈপ্লবিক নির্দেশই পেলাম না, তিনি আমাদের নিরাপত্তার জন্য একটু ঘোরা পথেই কলকাতায় ফিরে যেতে বললেন। শ্রীঅরবিন্দের আদেশ পালনার্থে আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য মাদুরা, রামেশ্বর, প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করে মাদ্রাজ মেলে কলকাতা ফেরবার পথে খবরকাগজে দেখলাম চৌরঙ্গীর রাস্তায গোপীনাথ স্যার-চার্লস্ টেগার্ট ভ্রমে আর্নেস্ট ডে-কে গুলি করে হত্যা করেছে। গোপীনাথ দু'টি পিস্তলসহ বন্দী হয়েছে। আমার আর বিলম্ব সইছিল না। পুরীতে আমাদের ক'দিন থাকার প্রোগ্রাম বাতিল করে পরদিনই কলকাতায় এসে পৌছলাম। দেবেনের কাছে গোপীনাথের এই এ্যাক্‌শানের ব্যাপার শুনলাম। জানতে পারলাম গোপীনাথ দেবেনকে না জানিয়েই চলে গিয়েছিল এবং পরের দিন সকালে খবরের কাগজ দেখেই দেবেন আর্নেস্ট-ডে-র মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছে।

একে একে দিন গেল, মাস ফুরালো বিচারে গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের হুকুম হোল। জুলুদা দেবেন দে-র সঙ্গে আবার উত্তর প্রদেশ ও কাশ্মীর বেড়াতে গেলেন। কিছুদিন পরে দেবেন ফিরে এলো—জুলুদা সেখানেই

রয়ে গেলেন। কলকাতায় আমরা হরিদার (হরিনারায়ণ চন্দ্র) তত্ত্বাবধানেই ছিলাম।

গোপীনাথের ফাঁসির দিন ধার্য হয়েছে। গোপীনাথের ফাঁসি উপলক্ষ্যে বীরত্বপূর্ণ Statement-টি ও বাংলার বিপ্লবী যুবকদের আহ্বান জানিয়ে হরিদা একটি প্রচারপত্র ছাপালেন। দেবেন ও আমি ঠিক করলাম 'পুলিশ গ্রাউণ্ডে' খেলা শেষ হওয়ার পর ১০০ নম্বরের মোটরগাড়িতে ডেপুটি-কমিশনার মিঃ কিড্ ওঠার সময় তাঁকে গুলি করবো। আমি ও দেবেন যথাসময়ে রিভলভার নিয়ে সাইকেলে চেপে, যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-কিড্ সাহেব সেদিন সেই পথেই আর এলেন না।

কিছুদিন পরে জুলুদা ফিরে এলেন এবং দেবেনকে সঙ্গে নিয়ে আবার কাশ্মীর ভ্রমণে বেরোলেন। গণেশ, প্রেমানন্দ ও যশোদা পালের সঙ্গে সংযোগ রেখে আমি তখন ফেরারী জীবন কাটাচ্ছি। গণেশ সেই সময়ে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়তো। সে Cast iron-এর হাতবোমার খোল ঢালাইয়ের বন্দোবস্ত করে প্রায় একশটি সেইরূপ খোল তৈযারী করেছিল। প্রেমানন্দ চট্টগ্রামে আমার দাদার কাছ থেকে আধমণ গান-পাউডার সংগ্রহ করে কলকাতায় নিয়ে আসে। সীমিত শক্তি নিয়ে আমরা এ্যাক্শান চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি ধরা পড়লাম।

বাঁধাঘাট-শালকিয়া থেকে ফেরী ষ্টীমারে চাপার সময় চট্টগ্রামের ডি, আই, বি সাব-ইন্সপেক্টার আমাকে অনুসরণ করে নৌকাঘাটেই গ্রেফ্তার করেন। বন্দী অবস্থায় আই. বি. পুলিশের অফিসে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সকলে মিলে আমার নাম জানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথম থেকেই আমি তাঁদের বার বার বলে এসেছি—"নাম আমি বলবো না; তবে জেনে রাখুন আমি অনন্ত সিংহ নই—আপনারা ভুল লোককে ধরেছেন।" তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও আমার কাছ থেকে এর বেশী আর কিছু জানতে পারলেন না।

ভেবেছিলাম বাবা মামলায় আমার আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করবেন না। কাজেই স্থির করলাম বিচারকের সামনেও এই অভিনবভাবে অভিনয় করে যাবো বলবো—"আমি অনন্ত সিংহ নই।"

কলকাতা থেকে আমাকে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ষ্টীমারে চট্টগ্রামাভিমুখে যাবার সময় পুলিশ-কবল থেকে বিভিন্নভাবে পালাবার চেষ্টা

করেও ব্যর্থ হলাম। শেষ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে কোতোয়ালী থানারও S. D. O-র কাছে উপস্থিত করল। চট্টগ্রাম পুলিশ ও S. D. O-কেও হার মানতে হোল। তাঁরাও আমার পরিচয় জানতে পারলেন না। আমাকে জেল-হাজতে পাঠানো হোল। নাগারখানা যুদ্ধের পর এই প্রথম মাস্টারদার ও অম্বিকাদার সঙ্গে দেখা। তাঁরা দুটি সেলে বিশেষ জেল-প্রহরায় আবদ্ধ ছিলেন। স্নানের সময় প্রহরায় রত জেল সেপাইয়ের অনুগ্রহে দু'চার মিনিটের জন্য তাঁদের সঙ্গে এই গোপন সাক্ষাৎ। মাস্টারদাদের কুশল সংবাদাদি নিলাম এবং তাঁরা আমার কাছ থেকে বাইরের সাংগঠনিক অবস্থার দু' একটি মূল বিষয় এইটুকু সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জেনে নিলেন এবং জেলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হতে ও সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে সদ্‌ভাব বজায় রেখে চলবার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন।

জেলে আমায় তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই দেখি আমার বাড়ি থেকে জামা-কাপড, বিছানাপত্র ও টিফিন বাক্‌সে মধ্যাহ্ন ভোজনের আহার্য এসে গেছে। এখানেই আমার আত্মগোপনের ড্রামার যবনিকাপাত।

নয়টি মাস ধরে আমাদের তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা চল্‌ল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যারিস্টারবৃন্দ মামলায় আমাদের পক্ষে সওয়াল জবাব করলেন। "নাগারখানা" পাহাডের উপর মাস্টারদা ও অম্বিকাদা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বন্দী হয়েছেন, আমাকেও বহু সাক্ষী সনাক্ত করেছে। কাজেই আমাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনিবার্য বলেই ধরে নিয়েছিলাম। সুদীর্ঘ কাল জেলে বাস করার সময় আমাদের নেই—সেজন্য আমরা প্রস্তুতও ছিলাম না! তাই জেল থেকে প্রাচীর টপ্‌কে উধাও হওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা গোপন পথে জেলের মধ্যে বোমা-পিস্তল আনালাম এবং জেলের অভ্যন্তরে আমাদের তিনটি সেলের দরজায় যে তালা ব্যবহৃত হত সেই তিনটি তালার চাবিও যোগাড করলাম। পুরোদস্তর মামলা চলা কালে যখন আমরা জেলভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে একাগ্রভাবে লিপ্ত তখন সাব্‌ইন্‌স্পেক্টার প্রফুল্ল রায় প্রেমানন্দের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। এই সাব্‌ইন্‌স্পেক্টরই গ্রেফতার করেছিলেন।

প্রেমানন্দও বন্দী হয়ে জেলে এল। প্রফুল্ল রায় মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে প্রেমানন্দের নামোল্লেখ করেন।

প্রেমানন্দের বিরুদ্ধে যথারীতি মামলা রুজু আমাদের বিরুদ্ধে যে তিনটি মামলা চলছিল, তার মধ্যে প্রধানতমটিকে জুরীর বিচারে আমরা তিনজন

বেকসুর খালাস পেলাম। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, আমাদের বিরুদ্ধে অন্য মামলাগুলিও আর টিকবে না। সংবাদপত্র মারফত জানতে পারলাম সন্তোষদা (সন্তোষ মিত্র) ও তাঁর সঙ্গে অন্যান্যেরা সকলেই মামলায় মুক্তি লাভ করেছেন এবং পরমুহূর্তেই আলিপুর কোর্ট-কম্পাউণ্ডেই আবার বেঙ্গল অর্ডিনান্সে বিনা বিচারে বন্দী হয়েছেন। প্রথম মামলায় আমরা মুক্তি পাওয়ার পর জেল থেকে বোমা পিস্তল বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা তিনজনও মুক্তি পেয়ে বাইরে এলাম।

প্রেমানন্দের বিরুদ্ধে মামলা চলতে লাগল। বাইরে এসে প্রেমানন্দের মামলার তদ্‌বির সুরু করলাম প্রেমানন্দের বিরুদ্ধে একজন আই. বি. পুলিশ ও সরকারী উকিল রায় সতীশচন্দ্র বাহাদুরের সাক্ষ্য অত্যন্ত মারাত্মকভাবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমাদের কথামত সাক্ষ্য দেবার জন্য তাঁদের ভয় দেখিয়ে রাজী করানো হলো। তাঁরা শেষ পর্যন্ত কথা রেখেছিলেন। মামলায় জজের হাতে প্রেমানন্দ জুরীর বিচারে মুক্তি পেলো না। জুরীদের সঙ্গে মত পার্থক্য হওয়াতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রেমানন্দের কেস জজসাহেব হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেন। আমাদের তিনজনের ও প্রেমানন্দের বিচার চলাকালে চট্টগ্রাম শহরে তারাচরণ সাধুর আবির্ভাব হয়। তিনি আমাদের মামলার পরিণতি ও ফলাফল সম্বন্ধে আগে থেকেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, আমাদের কারো শাস্তি হবে না—আমরা মুক্তি পেয়ে বাইরে আসব। সাধুর ভবিষ্যৎবাণী আশ্চর্যরূপে সফল হওয়াতে সাধুজীকে নিয়ে বড়লোক ও বুদ্ধিজীবী মহলে খুব হৈ চৈ পড়ে গেলে। সেই সময় শ্রীশ্রীকালী মায়ের প্রতি আমার অচল ভক্তি!--ভগবানে অন্ধবিশ্বাস। আমি তখন শ্রীঅরবিন্দ ও জোতিষদার (জোতিষচন্দ্র ঘোষ) প্রতি মনে প্রাণে আকৃষ্ট; তাঁদের শক্তি ও আশীর্বাদেই আমাকে পরিচালিত করেছে—এই ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মাস্টারদার সঙ্গেও ব্যক্তিগত জীবনে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাই এ নিয়ে মাষ্টারদার সঙ্গেও একান্ত নিবিড়ভাবে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। এ সম্বন্ধে তিনি নানাভাবে যা যা মত প্রকাশ করেছেন ও যেভাবে তাঁকে চলতে দেখেছি আমার তাতে তিনি যে ঐশ্বরিক ক্ষমতায় আমার মত অন্ধ-বিশ্বাসী নন সে বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তবে তিনিও মায়ের উপাসক ছিলেন।

আমরা তিনজন. জেল থেকে বাইরে এলাম। আরও কয়েক মাস পরে প্রেমানন্দও মুক্তি পেলো। আমরা তিনজন মুক্তি পাওয়ার দিন সাতেকের

মধ্যেই চট্টগ্রাম জেলার গ্রামে আর একটি রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। ওই রাজনৈতিক ডাকাতিটি অনুশীলন পার্টির সদস্যদের নেতৃত্বেই সংঘটিত এটা বুঝতে আমাদের দেরী হয়নি। আমার সহপাঠী ও বন্ধু প্রমোদ চৌধুরী আমাদের দল ভাগ হয়ে যাবার পর চারুবাবুর সঙ্গে একই সংগঠনে ছিল। সেই রাজনৈতিক ডাকাতিটি প্রমোদ চৌধুরীর নেতৃত্বেই ঘটে ছিল। আমাদের দল ভাগ হয়ে যাবার পরও প্রমোদ চৌধুরীর সঙ্গে সাধারণভাবে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বজায় ছিল।

জেল থেকে বাইরে এসে নির্মলদা, প্রমোদ চৌধুরী ও আমি কোন এক বৈঠকে সুদীর্ঘ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার পর একমত হই যে, আমরা দু'টি পৃথক দলে বিভক্ত না থেকে এক নেতৃত্বে সুসংগঠিতভাবে বৈপ্লবিক আদর্শে কাজ করে যাবো। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর দলের নেতা চারুবাবুও প্রথম সারির সংগঠনকাজের সঙ্গে আলোচনা করে যাতে আমাদের দু'টি অংশের মিলন হয়, প্রমোদ সে চেষ্টা করবার ভার নিল। কথা রইল তদনুরূপ চেষ্টা আমাদের সংগঠনের মধ্যেও আমি ও নির্মলদা করে যাবো। আমাদের উভয় দলের আন্তরিক চেষ্টায় অনুশীলন পার্টির এই অংশটির সঙ্গে সাংগঠনিক পর্যায়ে মিলন সম্ভব হয়েছিল এবং এক যুক্ত সভায় মিলিত হয়ে তখনকার মত একটি বৈপ্লবিক কর্ম-সূচীও গ্রহণ করা হলো।

এই সময় বাংলা সরকার বিপ্লবী কর্মতৎপরতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিনা বিচারে আটক রাখার জরুরী আইন প্রবর্তন করলেন। একরাতে সারা বাংলার তিরাশী জন বিপ্লবীকে হঠাৎ বাড়ি ঘেরাও করে গ্রেফতার হলো ও বিনা বিচারে জেলে বন্দী করে রাখা হলো। মাস্টারদা ও চারুবিকাশ দত্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ির গুপ্ত পথে পালিয়ে পুলিশের কবল হতে উধাও হলেন। বিনা বিচারে যশোর জেলে বন্দী থাকা কালীন চারুবাবুর মুখে শুনেছিলাম—চট্টগ্রামে আমাদের দু'টি দলের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ মিলন হয়েছিল এবং একত্রে ফেরারী জীবন অতিবাহিত করার সময় মাস্টারদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল।

মাস্টারদা প্রমোদ চৌধুরীদের সঙ্গে তখনও জেলের বাইরে আত্মগোপন করে আছেন। সেই সময় শচীন সান্যাল প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে বাংলা, আসাম ও যুক্তপ্রদেশ জুড়ে সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার জন্য একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী স্থির করেছিলেন। এই কর্মসূচী বাস্তবে পরিণত হওয়ার আগেই মাস্টারদা ধরা পড়েন এবং 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে' বিনা বিচারে আটক

থাকেন। প্রমোদ চৌধুরী, অনন্ত হরি মিত্র, হরি দা প্রভৃতি বিপ্লবী সাথীরা রাজাবাজার ও দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে আইন নিষিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদিসহ গ্রেফতার হন এবং মামলায় তাঁদের কারাদণ্ড হয়। তাঁরা তখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বম্-ইয়ার্ডে আবদ্ধ ছিলেন। ইন্টালিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশ্যাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জ্জী তখন প্রায় রোজই বম্-ইয়ার্ডের সামনে দিয়ে আটক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

একদিন বম্ ইয়ার্ডের দ্বারদেশে লোহার ডাণ্ডার আঘাতে ভূপেশ চ্যাটার্জি প্রাণ ত্যাগ করলেন। জেলের ভিতরে এতবড় চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি। অনুরূপ কোন ঘটনা পরেও ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই। ওদের বিরুদ্ধে মামলা সুরু হলো। অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসির হুকুম হোল এবং হরিদা ধ্রুব চ্যাটার্জি, অনন্ত চক্রবর্ত্তী ও রাখাল দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সুদূর ব্রহ্মদেশের জেলে প্রেরিত হলেন।

১৯২৭ সালে বাংলার লাট লর্ড লিটন্ বিদায় গ্রহণ করলেন। নতুন গভর্নর স্যার স্ট্যান্লি জ্যাক্সন অপেক্ষাকৃত উদার নীতি নিয়ে বাংলার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হলেন। নতুন লাটসাহেব—সুভাষবাবু, সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ ও আমরা—যারা বিনা বিচারে জেলে আটক ছিলাম, সবাইকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি দিলেন।

কলকাতায় ১৯২৮ সালে অখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কোন রাজবন্দী বিনা বিচারে জেলে আটক ছিলেন না। সমস্ত রাজবন্দীরা বাইরে আসার পর অনুশীলন পার্টির যুগান্তর পার্টি ও পূর্ণ দাসের মাদারীপুর পার্টি প্রভৃতি এক নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি মাত্র বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের চেষ্টায় আংশিকভাবে অল্প সময়ের জন্য 'নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী পার্টি' সংগঠিত হলো। বিপিনদা, জ্যোতিষদা প্রমুখ প্রাচীন বিপ্লবী নেতারা এই পার্টিতে যোগ দিলেন না। যতদূর মনে পড়ে ওই 'নিখিলবঙ্গ বিপ্লবী পার্টি' একত্রে মিলিত থেকে বেশীদিন কাজ করতে পারে নি—সকলে আবার নিজের নিজের গণ্ডীতে ফিরে গেলেন।

১৯২৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য আমাদের দলের প্রায় সকলেই কলকাতায় এলাম। বিভিন্ন জেল-প্রত্যাগত রাজবন্দীরা পরস্পরে এই সুযোগে মিলিত হবার ও ভবিষ্যত চিন্তা-ধারার আদান-প্রদানের সুযোগ নিলেন। কলকাতায় আমরা—বিশেষ করে জুলুদার

সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে অবহিত হতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাদের হতাশ করলেন। তাঁর অভিমত—পুলিশের প্রখর দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করা সম্ভবপর হবে না; অতএব বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে আমাদের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। জুলুদার এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের সঙ্গে মাস্টারদা, নির্মলদা, অম্বিকাদা, গণেশ ও আমি কোন মতেই একমত হতে পারলাম না।

কলকাতায় সেই কংগ্রেস অধিবেশনে সেই প্রথম বৃটিশ মিলিটারীর অনুকরণে থাকী ইউনিফর্ম পরিহিত জি. ও. সি. সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে এক সুবিশাল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী গঠিত হোল। অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্য-বাহিনীর অনুকরণে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সামরিক সজ্জায় সজ্জিত এই বিশাল ভলান্টিয়ার-বাহিনী সারা দেশের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়েছিল এবং দেশের তরুণ দলকে উৎসাহে উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। সেই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে কংগ্রেসে গ্রহণ করাবার জন্য প্রস্তাবাকারে উপস্থিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না। পরবর্তী কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলকাতা কংগ্রেসের অনুকরণে মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে আমরাও থাকী ইউনিফর্ম পরিহিত সুশৃঙ্খল ভলান্টিয়ার-বাহিনী গঠন করি। মাস্টারদা চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী, লোকনাথ Students Organisation-এর প্রেসিডেন্ট, গণেশ যুব-সমিতির সেক্রেটারী আর শরীর-চর্চার বহু ক্লাবের ভার আমার উপর ন্যস্ত হোল। এইভাবে চট্টগ্রামের যুব-শক্তিকে সংগঠিত করতে চেষ্টা চললো। কে হবে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি—এ নিয়ে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে বাংলার আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরোধ ও দলাদলি। আমরা সকলে চাই সুভাষচন্দ্রকে অনুশীলন দল যতীন্দ্রমোহনের সমর্থক জেলা-কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচন দ্বন্দ্বে মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা জয়ী হলাম। ইতিপূর্বে আমরা জেলা রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করি এবং সেইসঙ্গে যুব-কন্‌ফারেন্স, ছাত্র কন্‌ফারেন্স ও মহিলাদের কন্‌ফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। এই সব ক'টি কন্‌ফারেন্সেই আমরা উদ্যোক্তা ছিলাম পরিচালনাও আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। এই কন্‌ফারেন্স অনুশীলন দলের সঙ্গে আমাদের মারামারি হয় এবং এই মারামারি উপলক্ষ্যে আমার

চারমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও অন্যান্য কয়েক জন বন্ধুর অর্থদণ্ড হয়। এই মারামারির ব্যাপারে অযথা শক্তি অপচয়ে আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। তারপর আবার মাস ছয় পরে কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন দ্বন্দ্বে আমরা জয়ী হলাম বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে অনুশীলন পার্টি ও বিপক্ষ কংগ্রেসীদলের সংঘর্ষের ফলে চরম মূল্য দিতে হলো। আমাদের দলের তরুণ কর্মী শ্রীসুখেন্দু দত্তকে। এই অবাঞ্ছিত রক্তপাতের হাত হতে সেদিন স্বয়ং মাস্টারদাও রেহাই পেলেন না। এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে শক্তিক্ষয় আমরা কোন মতেই চাইনি। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সুখেন্দু কয়েকজন আক্রমণকারী হিন্দু ও মুসলমান যুবকের নাম বলে যায়। এদের বিরুদ্ধে সরকার মামলা রুজু করেন। অম্বিকাদা, গণেশও আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য আদালতে উপস্থিত হতে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এবং পরে সেসন কোর্টেও অভিযুক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইনি।

সুখেন্দুর মৃত্যুর পর মাস্টারদার সঙ্গে মিলিতভাবে আমরা স্থির করলাম আত্মকলহে শক্তিক্ষয় হেতু, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন কারণেই আমাদের বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে দুর্বল করবো না। সেই দিনই সিদ্ধান্ত নিলাম—"Thus far and no further।" সেইদিন থেকেই অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করলাম। অস্ত্র যোগাড়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থাভাব মেটাতে অতীতে কৃত রাজনৈতিক ডাকাতির পন্থা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে নিজের নিজের বাড়ি থেকেই অর্থ-সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিলাম।

যে-সকল বিপ্লবী সভ্যদের নিজের বাড়ি থেকে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব বলে আমরা মনে করেছি কেবলমাত্র সেইরূপ সদস্যদের কাছ হতেই টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলাম। তাদের উপর আমাদের নির্দেশ ছিল টাকা বা অলঙ্কার অথবা অন্য কোন মূল্যবান দ্রব্য তারা বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে। প্রত্যেককে বলা হয়েছিল—একশ' টাকার কম নয়, দু'শ টাকার বেশী নয়—টাকা বা জিনিস মা-বাবার ও অভিভাবকবর্গের অজ্ঞাতেই নিয়ে আসতে হবে; সন্দেহ করুক তা'তে আপত্তি নেই, কিন্তু কোন মতেই হাতেনাতে ধরা পড়া চলবে না।

১৯৩০ সালের অর্থনৈতিক অবস্থা আজকের মত ছিল না। সেদিনকার অল্প টাকার মূল্যও ছিল অনেক! আমাদের নিজের বাড়ি থেকেই প্রয়োজন অনুসারে বারো-তেরো হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। আমাদের দলের

বিত্তশালী পরিবারের চার-পাঁচ জন যুবক পাঁচশ' বা হাজার দেড় হাজার করে টাকা এনে দিয়েছিল। নির্ঝঞ্ঝাটে সংগৃহীত এই সামান্য অর্থ নিয়েই আমরা তখনকার মত প্রয়োজন, অনুযায়ী স্মাগলারদের কাছ থেকে রিভলভার—পিস্তল ইত্যাদি ক্রয় করি। অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ও হাতবোমা প্রভৃতিও ওই টাকার মধ্যেই প্রস্তুত করতে সমর্থ হই। তখনকার দিনে শেভ্রোলে ট্যুরার গাড়ির দাম ছিল মাত্র আড়াই হাজার টাকা। Higher purchase-এ মাত্র তেরশ' টাকা দিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের দিন সকালে একটি নতুন শেভ্রোলে গাড়ি আমরা কিনেছিলাম; কাজেই বুঝে নেওয়া যায় সেই যুগে—১৯৩০ সালে, তেরো হাজার টাকা আমাদের সশস্ত্র বৈপ্লবিক প্রস্তুতির পক্ষে যথেষ্টই ছিল।

আমরা জেল থেকে যখন বেরোলাম তখন বাংলাদেশে কিভাবে ও কি কর্মসূচী নিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানো যায় তা' মনে মনে চিন্তা করেই এসেছিলাম। ধরেই নেওয়া যায় যে প্রত্যেকের চিন্তাধারা ও চিন্তার সারমর্ম এক ছিল না। মাস্টারদা আমাদের বিপ্লবী সমিতির প্রেসিডেন্ট, নির্মলদা, অম্বিকাদা, গণেশ ও আমি সমিতির সদস্য। এই সমিতি স্থির করেছিল—ঘোষণাপত্রে আমরা 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি—চিটাগাং ব্রাঞ্চ' বলে নিজেদের পরিচয় দেবো।

এই ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা প্রথম থেকেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল :—

(১) রাজনৈতিক ডাকাতি করে তা' সামাল দিতে মূল বৈপ্লবিক কর্মসূচী ব্যাহত করবো না।

(২) অভিভাবকদের অজ্ঞাতে নিজের নিজের বাড়ি থেকেই প্রত্যেকে অর্থ সংগ্রহ করবো।

(৩) ছাত্র-যুবকদের সমিতি গঠন করবো, শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ও গ্রামে গ্রামে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করবো।

(৪) ভবিষ্যতে সশস্ত্র আক্রমণকালে কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করবার পরিকল্পনায় বৃটিশ সৈন্যদলের অনুকরণে প্রকাশ্য ভাবে খাকী ইউনিফর্ম পরিহিত শিক্ষিত সুশৃঙ্খল ভলেন্টিয়ার বাহিনী গঠন করবো।

(৫) ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীন ভারতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা ভারতীয় পুলিশ ও মিলিটারীর কাউকে হত্যা না করে আমরা ইংরেজ সরকারের শেতাঙ্গ প্রতিভূদেরই হত্যা করবার প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম।

অতীতে বিভিন্ন স্তরের অনেক কুখ্যাত ভারতীয় কর্মচারীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়েছে। সেই সকল ঘটনা পর্যালোচনা করে আমরা বুঝেছিলাম ইংরেজদের দৈহিক গঠনও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য তাদের আক্রমণ করা অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য, তাই বিশেষ দুর্বল মনোবৃত্তি বশতঃ অতীতে আমরা রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় ইংরেজ অনুচরদেরই হত্যার সহজ পথটি গ্রহণ করে এসেছি। ভারতীয় অনুচরবর্গের হত্যা ইংরেজ শাসকবর্গকে মোটেই বিচলিত করতো না। অর্থের বিনিময়ে ও রায়-বাহাদুর, খান-বাহাদুর, খেতার ভূষিত করে বহু ভারতবাসীকে যে তাঁদের গোলামী করবার জন্য অনায়াসে পাওয়া যায় ইংরেজ-সরকার তা খুব ভালভাবেই জানতেন; তাই আমরা স্থির করেছিলাম ইংরেজ প্রতিভূদেরই হত্যা করবো —ভারতবাসীকে দিয়ে ভারতবর্ষ শাসনের পথ রুদ্ধ করবো।

(৬) অতীতে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক হত্যা বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে প্রধান স্থান অধিকার করে ছিল। আমরা স্থির করেছিলাম এই ব্যক্তিগত আক্রমণের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৈপ্লবিক কর্মপন্থার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চালিয়ে অন্ততঃ একটি জেলাও অধিকার করে ভবিষ্যত বিপ্লবের গতিপথের নিদর্শন স্থাপন করতে হবে।

(৭) পূর্বেকার বিপ্লবী নেতারা রাজনৈতিক ডাকাতিতে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হওয়ার পর বিদেশ হতে হাজার হাজার অস্ত্র আমদানীর যে কর্মসূচী ও পন্থা গ্রহণ করেছিলেন সেই পথে অগ্রসর হওয়া আমরা অবাস্তব ও অবাঞ্ছনীয় বলেই মনে করেছিলাম। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে আমরা এই দেশেই স্মাগ্‌লারদের কাছ থেকে প্রয়োজন অনুসারে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র কিনে তাই দিয়ে অতর্কিত আক্রমণে বৃটিশের সযত্ন রক্ষিত সহস্র সহস্র রাইফেল প্রভৃতি দখল করে নেওয়াই সহজ মনে করেছিলাম।

(৮) যে বয়সে মানুষ সংসারের প্রলোভনে সহজে আকৃষ্ট হয় সেই বয়সের লোকদের দলের অন্তর্ভুক্ত করার চেয়ে যাদের সংসারিক বন্ধন ও পিছুটান অনেক কম সেই রকম অল্প বয়সের যুবকদেরই দলভুক্ত করবার সক্রিয় প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম।

(৯) কোন এ্যাক্‌শান হওয়ার আগেই—পুলিশ অতীতে যেভাবে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র নির্মূল করে দিয়েছে আমাদের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ যেন সেইরূপ কোন সুযোগ না পায়। সেইজন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করার প্ল্যান ছিল। স্থির করেছিলাম দরকার

হলে পুলিশের লোককে হাত করতে হবে এবং দলের কোন সদস্য পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগে গুপ্তচর বৃত্তি করছে বলে যদি জানতে পারি তবে তাকে বুঝতে দেওয়া হবে না যে আমরা তার স্বরূপ ধরে ফেলেছি। বরঞ্চ, তাকে অতিমাত্রায় বিশ্বাস করছি—এইভাব দেখিয়ে তার মাধ্যমেই কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ নিতে হবে।

উপরোক্ত এই কর্ম-পদ্ধতিতে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম। চট্টগ্রাম শহর আকস্মিক ভাবে দখল করে সাময়িক বিপ্লবীসরকার গঠন করার সঠিক পরিকল্পনাটি পরে স্থির করা হয়েছিল। চট্টগ্রাম শহর দখল করা ও চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবাত্মক আক্রমণ চালানো—এই দুই বিষয়ে দু'টি বিশেষ মত ছিল। আমার মত ছিল ঝটিকাবেগে অতর্কিত আক্রমণে শত্রুর বিভিন্ন অস্ত্রাগার দখল করা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাড়ে শিবির স্থাপন করে সেখান থেকে "গেরিলা যুদ্ধ" চালিয়ে সরকারের সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত করা। কর্তৃপক্ষ সৈন্য আমদানী করবেই ভেবে নিয়ে ও কোথায় কোথায় তারা বিভিন্ন ঘাঁটি স্থাপন করবে তা অনুমান করে নিয়ে আগে থেকেই সে সব জায়গায় ল্যাণ্ড-মাইন ও ডিনামাইট পেতে রাখা এবং সময় ও সুযোগ বুঝে বিদ্যুৎ সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মিলিটারী ট্রেন ও বিভিন্ন সৈন্য ঘাঁটি ধ্বংস করা।

গণেশের মত ছিল—তড়িৎবেগে সৈন্য ও পুলিশ-ঘাঁটি, টেলিফোন অফিস, প্রভৃতি দখল করা, ইউরোপীয়ানদের ক্লাবে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে সকলকে হত্যা করা এবং জয় সুনিশ্চিত করার পর অস্থায়ী বিপ্লবী-সরকার ঘোষণা করা। তারপর যে ক'দিন সম্ভব বিপ্লবী সরকার বজায় রাখবার জন্য শত্রুর প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করা—we will die at the post but enemy shall not pass!

গণেশের এই প্ল্যানটি শোনামাত্র বিনা দ্বিধায় আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম। আমার ও গণেশের একমত হয়ে স্থিরীকৃত প্ল্যানটি মাস্টারদা অনুমোদন করলেন। এই প্ল্যানটির নিঁখুত ও বাস্তব রূপ দেবার জন্য আমরা উঠে পড়ে লাগলাম।

বিভিন্ন শত্রু-ঘাঁটির সবিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য ম্যাপ ও ফটো ইত্যাদি সংগৃহীত হলো। আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবল নিয়ে সীমিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনাটি সফল করবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো।

চট্টগ্রাম পোর্ট টাউনটি দখলের জন্য শত্রু-ঘাঁটির উপর নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আক্রমণ চালানো স্থির হলো :—

পুলিশচাল[illegible] রাতের অন্ধকারে ঝটিকাবেশে অতর্কিত আক্রমণে সমস্ত অস্ত্রাগার-বিম[illegible] করা হবে।

[illegible]স্ত্রাগাব আক্রমণের পাঁচ মিনিট আগে টেলিফোন—আবাসটি [illegible] হবে। শহরের বন্দুকের দোকানটিও করায়ত্ব করতে হবে। মানসি[illegible] তার ছিন্ন, ও দু'টি স্থানে রেল—লাইন তুলে ফেলে চল্লিশ মাইল দু'হা[illegible]নে 'দু'টি চলন্ত ট্রেন লাইন-চ্যুত করে বাইরে থেকে সৈন্য আমদানীর [illegible]লম্ব ঘটাতে হবে—এবং ক্লাবগৃহে সমবেত ইউরোপীয়ানদের হত্যা করতে হবে।

এই কর্ম সূচীকে বাস্তব রূপ দিযে প্রথম আক্রমণ আরম্ভে আমরা চৌষট্টি জন যুবক সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের সবার খাকী মিলিটারী ইউনিফরর্ম। সবাইকে আমরা গোপনে অস্ত্রশিক্ষা ও হাতবোমা ছোঁড়া ও মোটরগাড়ি চালানো শিখিযেছিলাম। সর্বোপরি শিখিয়েছিলাম চরম স্বার্থ-ত্যাগ ও চরম যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি। দলের গণ্ডীতে ভয় ও ভীরুতার বিরুদ্ধে আমরা বহুদিন ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে "অভিযান" চালিয়ে এসেছি। মৃত্যু-বিভীষিকার ভযাবহ চিত্র সব সময়ে চোখের সামনে রেখে দিনে রাতে রিভলভাব নিযে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হবার পূর্বে এইরূপ মানসিক প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন। চট্টগ্রামের বড বড সভায ছাত্র যুবকদের আমরা ডাক দিযে বলেছি—আমাদের চাই সাহস, আমাদের প্রোগ্রাম হোল—

"Organisation, Andacity, and Death!"

১৯৩০ সাল, ১৮ই এপ্রিল। আজ রাত্রে আমরা যুগপৎ আক্রমণে সমস্ত শত্রুর ঘাঁটি দখল করবো। আমাদের হাতে আছে—তেরটি রিভলভার, ছটি শটগান ও চারখানা মোটরগাড়ি মাত্র।

এইটুকু সম্বল নিয়েই শহর দখলে আমরা চৌষট্টিজন বদ্ধপরিকর। অসীম সাহস ও সুদৃঢ় মনোবলই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটর চালকদের সময়মত বেঁধে রাখা হোল। এখন আমরাই সেইসব মোটরের অধিকারী। ধার্য সময়ে টেলিফোন-অফিস আক্রান্ত ও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো। সঙ্গে সঙ্গেই মিলিটারী ও পুলিশ অস্ত্রাগারগুলিও মুহূর্তের মধ্যেই অধিকৃত হলো। অন্ধকারে অতর্কিত আক্রান্ত হওয়াতে পুলিশ ও মিলিটারী আমাদের লোকবলের সঠিক ধারণা করতে পারেনি। চারিদিক থেকে গুলির আওয়াজ, 'বন্দেমাতারম্' ও 'ইন-কেলাব

পুলিশের
—জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ—আকস্মিক [illegible] তাকে
প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলো। পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই [illegible] কে
দখলে এলো। টেলিগ্রাফের তার কেটে ও ট্রেন-লাইন [illegible] পক্ষকে
সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমাদের কাজ সুসম্পন্ন হলেও [illegible] শহর
ইউরোপীয়ান সাহেবরা সেদিন ক্লাবে অনুপস্থিত থাকায় ইংরেজ
প্রোগ্রামটি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হলো না।

আমাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন স্থান আক্রমণ ও অধিকার করে পরিকল্পনা অনুযায়ী পুলিশ-লাইনে ফিরে এলো। এখানে মাস্টারদা উপস্থিত ছিলেন এবং এই পুলিশ-লাইনটিকেই আমরা বৈপ্লবিক হেড কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করা স্থির করেছিলাম। সকলে সমবেত হলে মাস্টারদা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করলেন।

শহরের একটি বিশেষ রেস্তোঁরাতে আমাদের চৌষট্টি জনের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা ছিল। আমাদের প্রোগ্রামে সুস্পষ্টভাবে স্থির করা ছিল—আমরা শহরে ফিরবো এবং পরের দিন সকাল থেকেই অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের অধীনে যুবকদের নিয়ে বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী গঠন করবো। এই বিপ্লবী সরকার রক্ষাকল্পে আমরা যতদিন সম্ভব মরণপণ যুদ্ধ করবো এবং নিজের নিজের পোস্টে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ করবো, তবু প্রাণ থাকতে কখনও শত্রুকে প্রবেশাধিকার দেবো না।

যুবক-সৈনিকদল নিয়ে আগে থেকেই শহরে ব্যারিকেট করে শত্রুর পরিশিষ্ট শক্তির গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হওয়াই আমাদের উচিত ছিল। কিন্তু অনভিজ্ঞতা ও দুর্বল মানসিকতা বশতঃ দ্বিধাগ্রস্থ হওয়াতেই সেইরূপ চেষ্টা করা হয়নি। তারই সুযোগে মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডবলমুড়িং জেটির অস্ত্রাগার হতে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে লুইস্ গান (একপ্রকার মেসিন কামান যা থেকে দুই সেকেণ্ডের মধ্যে সাতচল্লিশটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়) নিয়ে সন্নিকটস্থ ওয়াটার ওয়ার্কসের দোতলা গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ লুইস্ গানের গর্জনে রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে পড়লো। আমাদের গণতন্ত্রবাহিনীর সৈন্যদল পুলিশ-লাইনের টিলার উপরে বন্দুক হাতে লড়াইয়ের কায়দায় আগে থেকেই শোয়া পজিশনে ছিল। লুইস্-গানের অজস্র গুলী পুলিশ-লাইনের গৃহের দেওয়ালে, দরজায়, জানালায় এসে আঘাত করতে লাগলো। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজের

পুলিশ চালনায়, লুইসগানেরগুলি আমাদের একজনকেও স্পর্শ করলো না। [illegible]রা ভাবল, তাঁদের এই অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে আমরা হয়ত [illegible]বো নয়তো আত্মসমর্পণ করবো। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাববার সময় তাঁরা [illegible] লুইস্‌-গানের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিক থেকে মাস[illegible] সৈনিকদের আদেশ দেওয়া হোল—"ওয়াটর ওয়ার্কস লক্ষ্য ক'হরে [illegible]লি চালাও।" পুলিশ লাইনের টিলাটি প্রকম্পিত করে চৌষট্টিজন বিপ্লবীর হাতে চৌষট্টিটি পুলিশ মাস্কেট্রি (কম পাল্লার রাইফেল) আকাশ বিদীর্ণ করে একই সঙ্গে গর্জে উঠলো। মাস্কেট্রির মুহুর্মুহু গর্জনে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ওয়াটার ওয়ার্কস লক্ষ্য করে ছুটে গেল এবং আমাদের সাথীদের মুখের 'বন্দেমাতরম্' ও ইনকেলাব্—জিন্দাবাদ ধ্বনি পুলিশ লাইন মুখরিত করে তুললো। ইংরেজের শিক্ষিত হাতের লুইসগান নিস্তব্ধ হোল

সাথীদের মধ্যে জয়ের উল্লাস আবার কোন কোন নেতার মুখে ভীতি ও আশঙ্কার গুঞ্জনও শোনা গেল। কিন্তু মুষ্টিমেয় ইংরেজ-শাসক তাঁদের প্রধান প্রধান ঘাঁটিগুলি হারাবার পরেও সাহসের সঙ্গে আমাদের আক্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মেশিনগানের উত্তরে আমাদের বেপরোয়া গুলির মুখে তাঁরা সাময়িকভাবেই যুদ্ধ সংবরণ করেছিলেন মাত্র। আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ওয়াটার ওয়ার্কসের বাড়ির কোন এক স্থান হতে গুলি বর্ষণ সুরু হোল। গুলির শব্দ লক্ষ্য করে আমাদের সাথীরাও আবার বীর বিক্রমে মাস্কেট্রি চালাতে লাগলো। এই দ্বিতীয়বারের যুদ্ধ বিরামহীন ভাবে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে চলল। অবশেষে শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হোল। পুলিশ লাইনের টিলা থেকে আমাদের বিজয় নিনাদ চট্টগ্রামের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে লাগলো। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে আমরা বিজয়ী। আমাদের মধ্যে তখনও কেউ-ই আহত বা নিহত হয় নি। তবু—তবু কেন জানি না কিভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, পুলিশ লাইন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হোক্। পুলিশ লাইনে আগুন দেওয়া হোল। দাউ দাউ কোরে আগুন জ্বলে উঠলো; কিন্তু সেই অগ্নি সংযোগের সময় হিমাংশুর ইউনিফর্মে আগুন লেগে গেল। হিমাংশুকে দগ্ধ অবস্থায় মোটর যোগে শহরে আনা হোল। মোটর চালাচ্ছিলাম আমি আর আমার সঙ্গে ছিল মাখন, আনন্দ ও গণেশ। হেড্ লাইট জালিয়েই আমাদের গাড়ি শহরে প্রবেশ করল, কাজেই আমাদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে অন্যান্যদের কারোরই ভুল করবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু তাঁরা সকলেই পূর্ব নির্দ্ধারিত প্রোগ্রাম বাতিল করে শহরের

বাইরে পর্বতাঞ্চলে আশ্রয় নেওয়াই সাব্যস্ত করলেন ও সেইমত সবাই [illegible]
দিকে চলে গেলেন। হিমাংশুকে নিয়ে আমরা চারজন এইভাবে [illegible]
বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডলাম। বহুভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেও [illegible]কে
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হলাম। আমরা চারিটি দি[illegible]কে
শহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন আশ্রয় স্থলে কাটালাম। সেই সব বাডিও মাস্টা[illegible]
জানা ছিল। মাস্টাবদারা আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনেব উদ্দেশ্যে তিন[illegible]
বিপ্লবী সাথীকে পাঠান। কিন্তু তারা কেউ ই—মাস্টারদাদের জানা আমাদের
বিভিন্ন আশ্রয়স্থল গুলিতে খোঁজ করতে আসে নি। কাজেই আমাদের সঙ্গে
সংযোগ স্থাপন কষ্টসাধ্য না হলেও শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ ঘটে নি। রজতের
বাডি ও আনন্দের বাডিতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। এই দু'টি বাডিতেই
রাইফেল হাতে পুলিশদল অতর্কিতে এসে তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চালায়।
শহরের অন্যান্য বাডি থেকেও সন্দেহবশে আমাদের সদরঘাট ক্লাবের সদস্যদের
গ্রেফ্‌তার করে। অর্ধদগ্ধাবস্থায় হিমাংশু ও পুলিশের হাতে বন্দী হয়।
দেবপ্রসাদ ও আনন্দ গুপ্তের পিতাকেও পুলিশ গ্রেফ্‌তার করে। তাঁর কাছে
হিমাংশুর জন্য আনীত ওষুধের শিশি পাওয়া গিয়েছিল।

আনন্দের ও রজতের বাডিতে নিশ্চয়ই আমাদেব সন্ধান মিলবে—ঠিক এই
বিশ্বাস নিয়ে পুলিশদল সেসব বাডিতে হানা দেযনি। আমরা যে আমাদের
প্রধান দল হতে বিছিন্ন হযে পডেছি তখনও তা' পুলিশের জানার সুযোগ
হয় নি। এই দু'টি বাডিতে রজতের মা বাবা ও আনন্দের মা ও দিদির
সাহায্যে পুলিশের চোখে ধূলো দিযে আমরা আত্মরক্ষায সমর্থ হই।

চট্টগ্রাম শহরের বুকের উপর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এডিযে যে চার দিন
ধরে আমরা ফেরারী জীবন কাটাচ্ছিলাম, সেই চাব দিন ধরে ইণ্ডিয়ান
রিপাবলিকান আর্মির প্রধান অংশটিত আহার নিদ্রা ও বিশ্রাম ত্যাগ করে
পাহাড হতে পাহাডে রাতে গহন অরণ্যের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ও দিনে
শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় আত্মরক্ষার্থে ব্যূহ রচনা করে প্রস্তুত হয়ে দিন
কাটিয়েছে।

চতুর্থ দিনে জালালাবাদ পর্বত শিখরে ব্যূহ রচনা করে প্রস্তুত থাকাকালীন
বিকেল চারটার সময় দেখা গেল একটি ট্রেন বোঝাই মিলিটারী এলো।
কর্নেল ওলাস্‌ স্মিথের নেতৃত্বে প্রায় এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য পাহাডটিকে ঘিরে
ফেল্‌লো—জালালাবাদ পাহাডের সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রাম আরম্ভ হোল।
চারিদিক থেকে শত্রুপক্ষের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণে ছাপান্ন জন বিপ্লবীর হাতে

পুলিশ—মাস্কেট্রি মুহুর্মুহু গর্জে উঠলো বিপুল সৈন্যবাহিনী ও মেসিনগানের বিরুদ্ধে পুলিশ মাস্কেট্রি, আর কতটুকু কি করতে পারে? কিন্তু বিপ্লবীদের ... কেবল মাস্কেট্রি ছিল তা' নয়—তাদের বুকে ছিল অসম সাহস ও ... সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। ইংরেজের বেতনভোগী সেপাইরা সেই মানসিক দৃঢ়তা কোথায় পাবে? গণতন্ত্রবাহিনীর মরণ পাগল সৈনিকদলের দু'হাতে মাস্কেট্রি আর মুখে দিগন্ত কাঁপানো রণ-রোল—"বন্দেমাতরম" "ইন-কেলাব—জিন্দাবাদ"। মেসিনগানের গুলিতে বিপ্লবী যুবকেরা অনেকেই জালালাবাদ পাহাড়ে প্রাণ দিল। এই বিপ্লবী যুবকদের নাম (১) ত্রিপুরা সেন, (২) নরেশ রায়, (৩) বিধু ভট্টাচার্য, (৪) হরিগোপাল বল, (৫) প্রভাস বোস, (৬) জিতেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, (৭) মধুসূদন দত্ত, (৮) নির্মল লালা, (৯) পুলিনবিকাশ ঘোষ, (১০) মতিলাল কানুনগো, (১১) অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, (১২) শশাঙ্ক দত্ত।

জালালাবাদ যুদ্ধের সেনাপতি লোকনাথ বল। এই যুদ্ধে স্বয়ং মাস্টারদা নির্মলদা, অম্বিকাদা ও আমাদের যুবক সাথীদের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে সমানে লড়াই করেছেন। এই অসমান যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় ঘটে এবং তাদের বিভিন্ন দলিলপত্রে এই পরাজয়ের স্বীকৃতিও দেখা যায়। ইংরেজ সরকারের সেই সব নথিপত্রের বিবরণ "চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আমাদের বিপ্লবী সাথীরা অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করেছে। এক একজন সাথীর প্রাণত্যাগে প্রতিশোধপরায়ণ অবশিষ্টেরা দ্বিগুণ উদ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সরকারী তথ্যে প্রকাশ—ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে শত্রুসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে শহরে চলে যায়। যুদ্ধক্ষেত্র একেবারে শান্ত ও নিস্তব্ধ। শত্রু পক্ষের হতাহতের সংখ্যা আমাদের সঠিক জানা না থাকলেও জালালাবাদ যুদ্ধ প্রত্যাগত সাথীদের মুখে শুনেছি বিপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এখন করুণ বিদায়ের পালা। সামরিক কায়দায় শহীদদের অভিবাদন জানিয়ে বেদনা বিধুর চিত্তে অবশিষ্ট সাথীরা জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করে নীচে নেমে গেল। কপালে রাইফেলের গুলির আঘাতে অম্বিকাদা আহত হন। রক্তাক্ত দেহে তিনি মৃত বন্ধুদের পাশে পড়ে রইলেন। অপর দু'জন আহত সাথী—বিনোদ দত্ত ও বিনোদ চৌধুরী অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে রাইফেল হাতে পাহাড় হাত নেমে এলো।

অনাহারে অনিদ্রায় শ্রান্ত অবসন্ন শরীর বিপ্লবীদের পক্ষে নিজেদের মধ্যে

শৃঙ্খলা বজায় রাখা তখন আর সম্ভব ছিল না। দুর্গম অন্ধকার অরণ্যপথে তারা দু' ভাগে বিভক্ত পথে পড়লো। এক অংশ মাস্টারদা ও নির্মলদার পরিচালনায় গ্রামের বিভিন্ন আশ্রয়স্থলে গিয়ে পৌঁছালো। অপর অংশ লোকনাথ বল ও কালী চক্রবর্তীর পরিচালনায় অন্য পথে গ্রামে প্রবেশ করলো। কিছুদিনের মধ্যেই মাস্টারদা সবার সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করেন।

জাল'লাবাদ পাহাড়ে বিকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলা কালে—এদিকে আমরা চারজন—গণেশ, আনন্দ, মাখন (জীবন ঘোষাল) ও আমি, কলকাতা যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেনযোগে ভাটিয়ারী স্টেশন ত্যাগ করি। ভাটিয়াবীর স্টেশন-মাস্টারের টেলিগ্রাম পেয়ে সেই রাত্রেই দুটোর সময় ফেনী স্টেশনে পুলিশ আমাদেব চারজনকে গ্রেফতার করে ও ট্রেন থেকে নামিয়ে আমাদেব স্টেশনমাস্টারের ঘরে নিয়ে যায়। আমাদেব প্রত্যেকের সার্টের তলায় ঢাকা দুটো ক'রে রিভলভার কোমরে বাঁধা আছে। আমাদের দেহ-তল্লাসী না করে পুলিশ নিঃসন্দেহ হতে পারছিল না। পুলিশ দেহ তল্লাসীতে উদ্যোগী হতেই আমরাও আর কালক্ষেপ না করে ঝট্ করে কোমর থেকে রিভলভার বার করে গুলি চালালাম। পুলিশ-বেষ্টনী ও স্টেশনের একেবারে সামনেই দাঁড়ানো মিলিটারী বোঝাই ট্রেনটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে আমরা উধাও হ'লাম। নানা পথ, নানা বেশে আমরা চারজন শেষপর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছালাম।

ভূপেনদার (ভূপেন দত্ত) সাহায্যে আমরা কলকাতার বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে রইলাম এবং তাঁরই চেষ্টায় সুহাসিনীদির তত্ত্বাবধানে কলকাতার কাছে চন্দনগরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হোল।

জালালাবাদ যুদ্ধের পরে নানাদিকে মৃত্যুভীতি-হীন তরুণ বিপ্লবী সাথীরা বেশীদিন নিষ্ক্রিয় থাকতে চাইছিল না। সেইজন্য চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ঘটনাও কিছু কিছু ঘটতে লাগলো। ফেনীতে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ, ফিরিঙ্গী বাজারে "সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর" মত পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধে সমরেন্দ্র নন্দীর প্রাণত্যাগ—জালালাবাদ যুদ্ধের আঠারো দিন পরে, ৬ই মে। কালারপোলে মনোরঞ্জন, রজত, স্বদেশ ও দেবুর বিশাল মিলিটারী-বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড সম্মুখ যুদ্ধ। এক্ষেত্রে দু'পক্ষেই অবিরাম গুলি চলে। মিলিটারীর পক্ষ থেকে চোঙ্গা মুখে বিপ্লবীদের বারে বারে আত্মসমর্পণের অনুরোধ জানানো হল—কিন্তু সব বৃথা। আমাদের মামলায় সরকারী সাক্ষী

হেম দারোগা বলেছেন বিপ্লবীদের কাছ থেকে তাঁরা উত্তর পেয়েছিলেন—বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ কাকে বলে জানে না, তারা যতীন মুখার্জীর মত যুদ্ধ করে প্রাণ দেবে—ধরা দেবে না। বিপ্লবীরা ঝোপের আড়ালে ছিল। সেই ঝোপের ভেতর থেকে কয়েকবার রিভলবারের গর্জন শোনা গেল। পর-মুহূর্তেই সব স্তব্ধ। পুলিশ ও ডাক্তারের সাক্ষ্য থেকে আমরা জেনেছি তারা কেউ কেউ যুদ্ধে আহত অক্ষম সাথীকে গুলি করে তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছে। এই অমর অক্ষয় বীরত্বগাথা বিপ্লবী বাংলাকে যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করবে।

চন্দননগরের বাড়িতে আমরা চারজন নিকট ভবিষ্যতের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনায় ব্যাপৃত। ২৮শে জুন, ১৯৩০ সাল, আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যার নজির কোন বিপ্লবীই আত্মসমর্থনে কোনদিনই দিতে পারবে না। আমি সেদিন ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যান সাহেবের কাছে “ধরা” দিতে ইনটালিজেন্স ব্রাঞ্চ অফিস—১৩নং লর্ড সিন্‌হা রোডে উপস্থিত হলাম। লোম্যান সাহেবকে আগেই চিঠি লিখেছিলাম—“আমি অসহায় অবস্থায় পড়ে বা অনুতপ্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করছি না। আত্মসমর্পণ করার মত কোনই কারণ ঘটেনি।” আরও লিখেছিলাম—“আমার অর্থ বা অস্ত্রশস্ত্র বা নিরাপদ আশ্রয়—কোনটারই অভাব নাই, নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণেই আমি ধরা দিচ্ছি।”

আমি ধরা দেওয়াতে পুলিশ মহলে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধরা দেওয়ার পেছনে আমার বিশেষ কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন। চার দিন ধরে ক্রমাগত কেন আমি ধরা দিলাম—এইটি জানবার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁদের এই “কেন”র উত্তর আর পেলেন না।

যথারীতি আমাকে চট্টগ্রাম জেলে পাঠানো হোল। মামলায় অভিযুক্ত আমাদের অন্যান্য বন্দীসাথীদের আগে থেকেই জেল-হাজতে রাখা হয়েছিল। আমি ধরা দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ গেজেটে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের নাম ঘোষণা করলেন। আমাদের ত্রিশজনকে নিয়ে মামলা সুরু হোল।

তিনজন অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরকার ওই তিনজনকে জেলের বিভিন্ন স্থানে পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করেন। তারা যাতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে সেই জন্য আমি

জেলের অভ্যন্তরে ও আদালতকক্ষে নানাভাবে চেষ্টা করি এবং শেষ পর্যন্ত তিনজনেই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।

আমাদের মামলা চালাবার জন্য উপযুক্ত ব্যারিস্টার নিয়োগ করা ও পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমার দিদি, ইন্দুমতী সিং কলকাতায় গিয়ে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য দরদী সমর্থকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দিদি পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন এবং মামলায় আমার পক্ষ সমর্থনে শরৎচন্দ্র বসু স্বয়ং চট্টগ্রামে আসেন। প্রায় মাস দেড়েক মামলা চলার পর ১৯৩০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর, চন্দননগরে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে স্যার চার্লস্ টেগার্ট পরিচালিত একদল গোরা-সার্জেন্টের সঙ্গে মধ্যরাতে একটি বিভলভার-যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মাখন ঘোষাল শহীদের গৌরবময় মৃত্যু বরণ করে, লোকনাথ, গণেশ ও আনন্দ আহত অবস্থায় বন্দী হয়। তাদের তিনজনকেও চট্টগ্রাম জেলে আনা হোল এবং আমাদের বিরুদ্ধে দেড় মাস ধরে যে মামলা চলেছিল তা খারিজ করে গণেশ, লোকনাথ ও আনন্দকে নিয়ে আবার নূতন করে মামলা সুরু হয়।

প্রায় দু'বছর ধরে আমাদের এই মামলা চলে। আমরা স্থির করলাম দীর্ঘকাল মামলা টেনে নেবো এবং সেই সুযোগে জেল ভেঙ্গে পালাবার ব্যবস্থা করবো ও বিভিন্ন ধরণের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রের বাস্তব রূপ দেবো। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা তিনজন—লোকনাথ, গণেশ ও আমি মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের ভূমিকা নিলাম। সরকারী সাক্ষীদের একবার কাঠগড়ায় পেলে আমরা তাদের আর নামবার সুযোগ দিতাম না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ জেরায় জেরায় তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতাম। Investigation অফিসার মিঃ আজিমকে ছ'মাস কাঠগড়ায় রেখে দিয়েছিলাম। যত দীর্ঘকাল সম্ভব মামলা এইভাবে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। প্রথম থেকেই মাস্টারদার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। সাঙ্কেতিক অক্ষরে তাঁর সঙ্গে আমাদের পত্রের আদান-প্রদান চলতো। আমাদের সঙ্গেই অভিযুক্ত ও জামিনে মুক্ত অর্দ্ধেন্দু গুহের মারফৎ মাস্টারদাকে আমরা মৌখিক সংবাদ পাঠাতাম এবং তাঁর মৌখিক নির্দেশও অর্দ্ধেন্দুর মারফত পেতাম।

মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে জেলের ভিতরে ও বাইরে বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে যুগপৎ আক্রমণ চালাবার এক বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হোল। প্ল্যান অনুযায়ী "বিভিন্ন সুড়ঙ্গ পথে" জেলের মধ্যে নিম্নলিখিত অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হোল—(১) অর্ধমণ গান-পাউডার, (২) অনেক কার্তুজ-

সহ দু'টি আর্মি-রিভলভার, (৩) বারোটি ড্যাগার, (৪) প্রায় একশ' গজ ইলেকট্রিক তার, (৫) বিশটি টর্চ-লাইটের ব্যাটারী, (৬) মোটরগাড়িতে ব্যবহারের একটা Inductive-coil আনা হয়েছিল যাতে দূর থেকে বিস্ফোরক দ্রব্যে অগ্নি সংযোগ করা যায়। এই একই উদ্দেশ্যে, (৭) সূর্য-রশ্মি ব্যবহারের জন্য শক্তিশালী Magnifying glass, (৮) কিছু গান-কটন্ এবং আরও বহুবিধ যন্ত্রপাতি ; যেমন—ফাইল, স্ক্রু-ড্রাইভার, হাতুড়ি ইত্যাদি।

এই সব অস্ত্রাদি ও যন্ত্রপাতি জেলের মধ্যে আনা মোটেই সহজ সাধ্য নয় —তবুও আনা হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তৎপরতা ও অসংখ্য সেপাই-শাস্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে ছোট্ট ডিষ্ট্রিক্ট জেলের মধ্যে এই সব নানাপ্রকার অস্ত্রাদি লুকিয়ে রাখাই আরো কঠিন সমস্যা। আপাত-দৃষ্টিতে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন মাসের পর মাস একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে নানাপ্রকারে বিভ্রান্ত করে জেলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে গভীর গর্ত খুঁড়ে এই সব মারাত্মক অস্ত্রাদি লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যবস্থা অনুযায়ী বাইরে কাছারী বাড়ির টিলার উপর প্রতিটি দশ সের ওজনের পাঁচটি ল্যাণ্ড-মাইন বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণের অপেক্ষায় পাতা ছিল। আর একটি খালি বাড়িতেও অনুরূপ পাঁচটি ল্যাণ্ড মাইন পাতা ছিল। আমাদের প্ল্যান এই বাড়ি তল্লাসীর জন্য আমরা নিজেরাই পুলিশকে খবর পাঠাবো এবং তল্লাসীর সময় বিদ্যুতের সাহায্যে দুটো ল্যাণ্ড-মাইন বিস্ফোরিত হবে। পরে উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মচারীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে উপস্থিত হলে ভিন্ন সুইচে অন্য তিনটি মাইনও বিস্ফোরিত করা হবে। ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিরা "Love Lane" দিয়ে যাওয়ার সময় ল্যাণ্ড-মাইনের সাহায্যে তাঁদেরও উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে ছিল। কার্যে পরিণত হবার আগেই এই প্ল্যান পুলিশ কর্তৃক বিনষ্ট হয়। আমাদের বন্ধু অর্দ্ধেন্দু ও অন্যান্য কয়েকজন এই ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়।

আমাদের জেল আক্রমণের গোপন তৎপরতা সম্বন্ধে পুলিশ বেশ ভালোভাবেই অবহিত ছিল। প্রায় তিনমাস ধরে প্রতিদিনই আমরা আদালতে যাওয়ার পর, কর্তৃপক্ষ সমস্ত জেলটি তন্ন তন্ন করে সার্চ করতেন। বহু জায়গায় তাঁরা মাটি খুঁড়েও দেখেছেন। কিন্তু তিন মাসব্যাপী তাঁদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমাদের সঙ্গে বহুবার বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের Indirect কথা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের বন্দী

করে রাখা তাঁদের পক্ষে যে সম্ভব হবে না, একথা আমরা সদম্ভে ঘোষণা করেছি। জেরায় জেরায় সাক্ষীদের বিব্রত করে মামলা অযথা বিলম্বিত করে দুঃসাধ্য সাধনের জন্য জেলের অভ্যন্তরে ঐরূপ আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি দুর্নিবার গতিতে চালিয়ে গেছি।

শেষ পর্যন্ত একটা কিছু মারাত্মক অঘটন আমরা ঘটাবোই বুঝে কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে কোন প্রকারে সন্ধি করা যায় কিনা প্রাণপণে তার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব এলো—'আমরা যেন জেলের অভ্যন্তরের বৈপ্লবিক পরিকল্পনাটি ত্যাগ করি ও জেলের বাইরের বিপ্লবীদের উপরও আমাদের প্রভাব বিস্তারে এই মারাত্মক বৈপ্লবিক পথ পরিহার করবার অনুরোধ জানাই—এর বিনিময়ে তাঁরা আমাদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না।

যোগসূত্রের মাধ্যমে মাস্টারদার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাবটি নিয়ে আমরা আলোচনা চালাই ও তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত জানতে পারি যে, আমাদের ফাঁসির বিনিময়ে কেবলমাত্র আমরাই জেলে মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কিছু করবো না বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

জেলের বাইরে আমাদের প্রভাবে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান্ আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বন্ধ করার প্রস্তাব যে কর্তৃপক্ষ এনেছিলেন তার কারণ—সেই সময়ে বক্সার রাজবন্দী শিবির থেকে সুরেনদা (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) প্রমুখ দাদারা বাংলার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার দাবীতেও বিপ্লবী বন্দীদের বিরুদ্ধে মামলা, ওয়ারেণ্ট, প্রভৃতি প্রত্যাহার করার দাবীতে ও সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যান্লি জ্যাক্সনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিলেন। তা'ছাড়া চট্টগ্রামে মাস্টারদার নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবীদল তখনও অফুরন্ত শক্তি ও সাহসের সঙ্গে একটার পর একটা সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার-জেনারেল মিঃ ক্রগকে আক্রমণের ষড়যন্ত্র ও চাঁদপুরে পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার তারিণী মুখার্জীর প্রাণনাশ, চট্টগ্রামের কুখ্যাত ডি. এস্. পি খান—বাহাদুর আসানুল্লার হত্যা, সাব-ইন্‌স্পেক্টার শশাঙ্ক ভট্টাচার্যকে রিভলভারের গুলিতে আহত করা, প্রভৃতি ঘটনা অব্যাহত গতিতে চলেছিল। মিলিটারী ও পুলিশের সর্বপ্রকার কঠোর দমননীতিমূলক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মাস্টারদার নেতৃত্বে ল্যাণ্ড-মাইনের সাহায্যে এই ধ্বংসাত্মক আক্রমণের বিরাট আয়োজন সম্পন্ন করাতে বিভীষিকা আরও চরমে উঠ্‌লো। কর্তৃপক্ষ ভয়ানক বিচলিত হয়ে আমরা যেন জেলের

বাইরে আমাদের বিপ্লবী সাথীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার অনুরোধ জানাই—এইরূপ একটি অবাস্তব প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত মাস্টারদার নির্দেশে আমাদের কর্তৃপক্ষের চুক্তি সম্পন্ন হোল।—আমরা উভয় পক্ষই অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম—তাঁরা আমাদের কাউকেই মৃত্যুদণ্ড দেবেন না এবং বিনিময়ে কেবল আমরাই জেলের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী হতে বিরত থাকবো। কিন্তু সদিচ্ছার প্রমাণ কর্তৃপক্ষকেই আগে দিতে হবে—ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের খুব সামান্য শাস্তি দিয়ে মামলার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে—সেইরূপ প্রমাণ পেলে তবেই আমরা সরকারী সাক্ষীদের দীর্ঘদিনব্যাপী জেরা করে মামলা বিলম্বিত করার চেষ্টা হতে নিবৃত্ত হবো।

কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং প্রমাণ স্বরূপ আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে 'ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্ত বিপ্লবী সাথীদের নামমাত্র দণ্ডাদেশ দিলেন আবার কাউকে বেকসুর খালাস দিলেন। আমাদের এই সাথীদের সঙ্গে লোকনাথ, গণেশ ও আমি পরামর্শ করে স্থির করেছিলাম যে তারাও কর্তৃপক্ষের ঐরূপ সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেবে। বাস্তবেও তাই ঘটলো।—একদিনেই 'ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলার' ট্রাইব্যুনাল বিচার শেষ হোল। আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী কাউকে কিছু কিছু মামুলি দণ্ড ও কাউকে সম্পূর্ণ—অব্যাহতি দিয়ে জজেরা মামলার রায় দিলেন।

আমরাও আমাদের কথা রাখলাম—সাক্ষীদের জেরা করে করে মামলার বিলম্ব ঘটানোর কৌশল ত্যাগ করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মামলার সওয়াল জবাব সুরু হোল। সরকার পক্ষে এলেন ব্যারিস্টার মিঃ এন, এন্ ব্যানার্জী এবং আমাদের পক্ষাবলম্বন করলেন শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার বসু, দেশপ্রাণ বি. এন. শাসমল, চন্দননগরের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীশ বোস, স্বনাম ধন্য ব্যারিষ্টার জে কে. ঘোষাল এবং প্রখ্যাত আইনজ্ঞ কামিনী দত্ত ও অখিল দত্ত। আদালতে মামলা শেষ হোল। জজেরা তাঁদের সুচিন্তিত রায় লিপিবদ্ধ করবেন বলে দু'মাসের জন্য আদালতের কাজ বন্ধ রাখলেন।

এক শুভ প্রভাতে জেলের অভ্যন্তরেই বিচারকক্ষ সাজানো হোল। ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা এসে স্ব স্ব চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর সুদীর্ঘ রায়ের বিশেষ অংশটি পড়ে শোনালেন—আমাদের দশজনের প্রত্যেককে ফাঁসির হুকুমের পরিবর্তে পঁচিশ বছর করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। একজনকে তিন বছরের জন্য Borstal জেল ও আর

একজনকে দু' বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে জেলে পাঠানো হোল এবং বাকি আঠারো জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হলো।

প্রেসিডেন্টের রায় শোনার পর এই শুভ খবর অন্যান্যদের জানিয়ে দিলাম এবং সকলে মিলে আকাশ বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি দিলাম—'বন্দেমাতরম্,' 'ইন-কেলাব-জিন্দাবাদ'!

গুদাম থেকে ঝন্‌ঝন্ শব্দে দশ-জোড়া ডাণ্ডাবেরী এনে হাতুড়ির ঘায়ে রিবিট্ করে কামারেরা আমাদের পায়ে বেরি পরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি মিলিটারী ভ্যান্ এলো এবং তৎক্ষণাৎ আমাদের ঐ ভ্যানে তুলে নিয়ে জেলখানা পিছনে রেখে সমুখপানে ছুটে চললো।

আমরা তখনও জানিনা ওই সকাল দশটায় আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অবশেষে কর্ণফুলীর একটি জেটিতে এসে উপস্থিত হলাম। সেই জেটি থেকে "Badora" স্টীমারটি আমাদের নিয়ে বরিশালের পথে পাড়ি দিল। একশ' জন সশস্ত্র পুলিশের সতর্ক প্রহরায় আমাদের নিয়ে Mr. W. V. Hicks আমাদের সঙ্গে চললেন। স্টীমারে দু'রাত কাটিয়ে আমরা বরিশালে পৌঁছলাম। "Badora" কিন্তু ঘাটে ভিড়লো না। "Myola" নামে আর একটি স্টীমার নদীবক্ষে "Badora"-র পাশে এসে দাঁড়ালো এবং আমরা "Myola"-তে স্থানান্তরিত হ'লাম। বঙ্গোপোসাগরের বুকের উপর দিয়ে সুন্দর বনের কোল ঘেষে "Myola" আমাদের নিয়ে তিনদিন পরে কলকাতায় পৌঁছালো।

মুক্তি পাওযার পরেই যারা আবার বিনা বিচারে আটক বন্দী হয়েছিল তাদের কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আর আমাদের সবাইকে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে রাখা হোল।

মহানায়ক সূর্য সেন তখনও চট্টগ্রামের বুকে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের পর পর আক্রমণ চালিয়ে যাবার কর্মপন্থা স্থির করছিলেন। এই সময় "গোপন সংবাদ" পেয়ে ক্যাপ্‌টেন্ কেমারন রাতের অন্ধকারে মাস্টারদাদের নিরাপদ গোপন আশ্রয়স্থলটি অতর্কিতে মিলিটারী বাহিনীর সাহায্যে ঘিরে ফেললেন। রাত্রে সেই আশ্রয়স্থলে মাস্টারদা, নির্মলদা, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার উপস্থিত ছিলেন। দলের সকলের সাবিত্রী মাসীমা তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেই বাড়িতে বাস করতেন। সেই মাসীমাই মাস্টারদাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। মিলিটারীর সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে অপূর্ব সেন ও নির্মলদা মেসিনগানের গুলীতে প্রাণত্যাগ করলেন আর নির্মলদার গুলিতে ক্যাপ্‌টেন

কেশারণকেও চিরবিদায় নিতে হল। মাস্টারদাও প্রীতিলতা মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে রাতের অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নানাদিক ভেবে মাস্টারদা প্রীতিলতাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে তার পূর্বেকার কর্মস্থল 'নন্দন কানন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে' আবার যোগ দেবার নির্দেশ দিলেন ও জানালেন—প্রয়োজন হলেই প্রীতিকে তিনি ডেকে পাঠাবেন।

ধলঘাটের যুদ্ধে নিহত নির্মলদা ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর প্রীতি তখনই কোন একটা এ্যাকশানে অংশ নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। মাস্টারদা তার ভাবপ্রবণতা বুঝেও তাকে সাময়িকভাবে হলেও বাড়িতে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রীতি বিদায় নিল—প্রতিজ্ঞা করে গেল ইংরেজের বুকের রক্তে সে রামকৃষ্ণ, অপূর্ব ও নির্মলদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।

ফেরারী জীবনের অসংখ্য বাধা বিপত্তির মধ্যে মাস্টারদা তাঁর একমাত্র পুরাতন সাথী নির্মলদাকেও আজ হারালেন! যুব-বিদ্রোহের বীর বিপ্লবীরাই ছিল মাস্টারদার শক্তি এবং তাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাই ছিল তাঁর বিপ্লবী সংগঠনের ভিত্তি।

—শত্রুকে প্রতি পদে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। আজ তারা আর কেউই মাস্টারদার পাশে নেই।

কাজেই এই সময় তিনি খুব 'একা' বোধ করেছিলেন এবং পরবর্তী কর্মসূচী গ্রহণের জন্য কিছু সময় নিচ্ছিলেন।

আধুনিক সৈন্যবাহিনীর পরস্পর যুদ্ধের জয়-পরাজয় প্রধানতঃ নির্ভর করে অস্ত্র ও লোকবলের প্রাধান্যে! সেই পরিপ্রেক্ষিতে গেরিলাযুদ্ধের বিশেষরূপ হোল দুর্জয় শক্তির বিরুদ্ধে সামান্য শক্তি ও স্বল্প অস্ত্র নিয়ে সেই প্রবল শক্তিকে ধ্বংস করা এবং ক্রমাগত শত্রুবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রেখে তাদের দুর্বল করে তোলা। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধেই চূড়ান্ত জয় সুনিশ্চিত করা যায় না। কানাইলাল, ক্ষুদিরামকে নিয়ে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের চূড়ান্ত জয় কখন এবং কত বছর পরে সুনিশ্চিত হবে বিপ্লবীরা তখন তা' জানতো না! তবে সেই বিপ্লবী স্কাউটিং থেকে রণ-কৌশলের সন্ধান বিপ্লবী যুবকেরা পেয়েছিল—চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ তারই একটি বৃহত্তর রূপ। অতি সামান্য অস্ত্রবলের অধিকারী হয়ে যুব-বিদ্রোহের সৈনিকেরা অতর্কিত আক্রমণে বৃটিশ-শাসিত পোর্টটাউন চট্টগ্রাম দখল করে স্বল্প কালের জন্য হলেও সামরিক বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করেছিল। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

হিসাবে প্রবল শক্তিশালী শত্রুসৈন্য শহরের অধিকার পুনরুদ্ধারে সমর্থ হলেও ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির চট্টগ্রাম শাখা ইংরেজের প্রভুত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। সেই পরিস্থিতিতে সূর্য সেন তাঁর যুব-বাহিনীর বাকি অংশ নিয়ে "গেরিলা যুদ্ধ" পদ্ধতিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গেরিলা যুদ্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নেবে এবং অবস্থানুযায়ী তার কৌশলও পরিবর্তিত হবে। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি বিপ্লবী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে গেরিলা-যুদ্ধ-পদ্ধতি ও বিভিন্ন ingenuity বা সুচিন্তিত নূতন নূতন অস্ত্র শিক্ষা ও ব্যবহার কৌশলের প্রয়োজনীয়তা ও তেমনিই অপরিহার্য।

প্রবল শক্তিশালী শত্রুর বিপক্ষে সম্মুখ যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব। মহানায়ক লেলিনের মতে—"ছল-চাতুরী, সকল প্রকার বে-আইনী কাজ, মিথ্যা ভান, বিভিন্ন নীতি ও কৌশল এবং যে-কোন ভাবে যে-কোন উপায়ে, এমন কি যে-কোন মূল্যে সর্বতোভাবে শত্রুকে বিধ্বস্ত করতেই হবে।' কিন্তু সেই দিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় লেলিনের মহামূল্যবান-জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের নির্দেশগুলি আমাদের জানা ছিল না। আজ বুঝতে পারি যে, কোন বিপ্লবী নেতা কোন ক্ষুদ্র সংগ্রামও নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালিত করে গেছেন, তাদের সেইসব যুদ্ধের রণ-কৌশল লেলিনের লেখার মধ্যে সমর্থন খুঁজে পাবেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সীমিত গণ্ডিতে সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ-কৌশলের সমর্থন ও লেলিনের লেখায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

আমাদের দ্বীপান্তরের দণ্ড হওয়ার পর ধলঘাটের যুদ্ধে নির্মলদার গুলিতে ক্যাপ্টেন্ কেমাননের তিরোধান সেই থানার সৈন্য শরীরটিকে দুর্বল না করলেও কর্তৃপক্ষের Prestige যে বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। খাঁ বাহাদুর আসানুল্লা হত্যা, আই. জি. ভ্রমে ইন্‌স্পেক্টার তারিণী মুখার্জীর জীবন নাশ, ল্যাণ্ড-মাইনের তাণ্ডব, ইত্যাদি ঘটনায় সরকারী ফৌজ ব্যতিব্যস্ত। কর্নেল বাকল্যাণ্ডের হাতে জেলা-শাসনের ভার। কঠোর দমননীতির ব্যাপক আয়োজন শহর ও জেলার প্রতিটি অংশকে ষোল বা পঁচিশ স্কোয়ার মাইলে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশে মিলিটারী ও

পুলিস একযোগে হানা দিতে সুরু করেছে। বিপ্লবী যুবকদের অস্ত্রশস্ত্র সহ হাতে নাতে ধরবার চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ সমস্ত সহর তোলপাড় করে তুলেছেন। সর্বোপরি মাস্টারদার গতিবিধি অনুসরণ করে তাঁকে মৃত বা জীবিত গ্রেফ্তার করবার জন্যে পুলিশের সর্বশক্তি নিযুক্ত। শত্রুর এইরূপ প্রচেষ্টা যতই প্রবল হোক্ না কেন নিজেদের ভিতর থেকে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে তা' ব্যর্থ হতে বাধ্য। বেশ কয়েক মাইল জুড়ে বিরাট গ্রামাঞ্চল ও শহর এলাকা। এই বিরাট এলাকা একসঙ্গে ঘিরে ফেলা সহজসাধ্য নয়। কত শত লক্ষ সৈন্য হলে পরে একযোগে বেড়াজালের মত সমগ্র শহর ও গ্রামাঞ্চল ঘেরা যায়? আমাদের বিপ্লবী সাথীরা পরাক্রান্ত বৃটিশ সৈন্যের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে স্থান হতে স্থানান্তরে সুবিধামত গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করতো।

কিছুদিনের মধ্যেই বৃটিশ সমর নায়কেরা বুঝতে পারলেন তাঁদের সেইরূপ পালকোচিং গো ধরা অভিযানের demonstrative value যতই থাকুক না কেন বাস্তবক্ষেত্রে তার কার্যকারীতা অত্যন্ত কম।

তাঁদের এই একগুঁয়ে operational tacties-এর ব্যর্থতা বুঝে শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে বিপ্লবীদলের যোগাযোগ আছে সন্দেহে জেলার সবর দলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে লাল, নীল ও শাদা কাড ব্যবহারের বিধি প্রচলিত করলেন। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেককে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রঙের একটি রঙের কার্ড সর্বদা সঙ্গে রাখতে হোত। কাউকে চ্যালেঞ্জ করলে কাড দেখাতে না পারলে তার আর রক্ষা থাকতো না।

সুদীর্ঘকাল পরে জীবনস্মৃতির ধূসর হয়ে যাওয়া পাতা উল্টাতে বসে আজ হঠাৎ ১৯৩৪-এ চটগ্রাম জেল পাশের সেল থেকে শোনা মাস্টারদার গভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এলো—"অস্তাচলের পারে আমি পূর্ব কূলের পানে তাকাই।" গভীর অনুভূতি দিয়ে প্রায়ই তিনি এই গানটি গাইতেন। আজ আমার মনে হয় ধলঘাট যুদ্ধের পরে ও আমাদের নির্বাসনের আগে, সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টার অস্ত দেখে তিনি যেমন চিন্তিত হয়েছিলেন তেমনি আবার সেই অস্তাচলের সীমানায় পৌছে আগামী দিনের উদ্ভাসিত নব-দিগন্তের দিকে তাকিয়েই তিনি তার সংকল্প অটল ছিলেন।

সংগঠিত আক্রমণ চালাবার প্ল্যান কার্যকরী করতে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু বৈপ্লবিক কর্মপ্রেরণায় যাতে শৈথিল্য না আসে তার জন্য আশুঃকালীন ছোট ছোট অ্যাক্‌শন্ অপরিহার্য। কাজেই "ল্যাণ্ড-মাইন আক্রমণ" প্ল্যান সমাপ্ত করার পথে ছোট ছোট অ্যাকশন করে যেতে হয়েছে; যেমন—

আসানুল্লা, তারিণী মুখার্জী, শশাঙ্ক ভট্টাচার্য প্রমুখের উপর আক্রমণ চালানো। সংগঠিত আক্রমণে সাহেবদের পাহাড়তলী ক্লাবে অতর্কিতে হানা দিয়ে "জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে" প্রতিশোধ নেওয়ার প্ল্যান ছিল। ১৮ই এপ্রিল আমাদের সার্বিক প্ল্যানের এই অংশটি অসমাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে সীমিত অবস্থাতেও মাস্টারদা ও নির্মলদার নেতৃত্বে এই অসমাপ্ত কর্মটি সম্পন্ন করার চেষ্টা চলেছিল। ল্যাণ্ড-মাইন দিয়ে ব্যাপক ধ্বংসের আয়োজন বানচাল হওয়ার পর সাহেবদের ক্লাব আক্রমণ করতে হলে যেরূপ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন তা' অনেক সময় সাপেক্ষ। তা'ছাড়া পুলিশ ও মিলিটারীতে সমস্ত শহর ও গ্রামাঞ্চল যেভাবে ছেয়ে ফেলেছিল তা'তে তখন ক্লাব-গৃহ আক্রমণ করে ইংরেজ-হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ ছিল না। মিলিটারী ও পুলিশের যথেচ্ছাচার তাণ্ডবে জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলতে সরকার যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত, তখন মাস্টারদা দেশবাসীর মনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত হত্যার প্রয়োজন অনুভব করেন। গান্ধীজীও ভারতের অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের গতি স্তিমিত করার অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ নীতি ও কৌশলের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। বিপ্লবী যুবকদের মনোবল অটুট রাখবার জন্য মাস্টারদাও এইরূপ ব্যক্তিগত অ্যাকৃশন সমর্থন করেন।

চট্টগ্রামের বুকে পুলিশ ও মিলিটারীর প্রচণ্ড তাণ্ডব উপেক্ষা করেই মাস্টারদা পাহাড়তলী-ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য শত্রু-সৈন্য ও পুলিশদলকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম বাইরে কয়েকটি স্থানে বৈপ্লবিক অ্যাকশনের প্রোগ্রাম স্থির করা হোল। এই প্রোগ্রামের ভিত্তিতে ঢাকার জেলা-শাসক ও কুমিল্লার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টকে হত্যা করার প্ল্যান করা হয়।

ঢাকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ ডুর্ণ তখন কঠোর হস্তে আইন-অমান্য আন্দোলন দমনে রত। ভারতের কালা আদমীদের শাসনের নিমিত্ত ইংল্যাণ্ড থেকে ইংরেজ-যুবকদের কায়দা-কানুন শিখিয়ে I. C. S. পদে বরণ করে ভারতে আমদানী করা হচ্ছে। এঁরাই জেলা শাসক—প্রভূত শক্তির অধিকারী। শাসনকার্যে কার যোগ্যতা কত বেশী ভারত-সরকারের কাছে তা'র প্রমাণ দিতেই তাঁরা সর্বদা ব্যস্ত।

মেদিনীপুরের ও ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ বিপ্লবীদের 'টারগেট্' কুমিল্লার ডিস্ট্রিক্ট-ম্যাজিস্ট্রেট্ ইতিমধ্যে শান্তি-সুনীতির পিস্তলের গুলিতে জীবন দিয়েছেন।

ভারতের আরও অনেক ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের রিভলভারের গুলিতে চির-বিদায় গ্রহণ করেছেন।

মিঃ ডুর্ণ জেলা-শাসক—তাঁকে জেলার প্রধান প্রধান স্থানে প্রকাশ্যে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে হয়। তা'ছাড়াও দিনের কর্মশেষে প্রতিদিনই তিনি মদের দোকানে গিয়ে মদ কিনতেন। কাজেই তাঁর গতিবিধি closely watch করার কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু কোথায়, কিভাবে তাকে আক্রমণ করা হবে এবং আক্রমণের পর আক্রমণকারী কিভাবে আত্মগোপন করবে—এই ছিল বিচার্য।

সরোজকান্তি গুহ সদরঘাট ক্লাবের সদস্য। সরোজ ১৮ই এপ্রিল রাত্রে রিভলভার হাতে পুলিশ-লাইন আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে এবং ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সেই সরোজ রিভলভার নিয়ে ঢাকায় এলো। মিঃ ডুর্ণ তার টারগেট। এই কর্মভার গ্রহণের জন্য সে মাস্টারদা কর্তৃক নির্বাচিত।

পাঠকবর্গ ও প্রাক্তন বিপ্লবী বন্ধুদের বুঝে নিতে হবে, যদিও আর্মারি আমরা দখল করেছি এবং প্রায় সব রিভলভার-পিস্তল সেখানে থেকেই নিয়েছি, তবু রিভলভার-পিস্তল অপর্যাপ্ত ছিল না। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে ১৮ই ও ২২শে এপ্রিলের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ কেউ ভবিষ্যতে আর রিভলভার স্পর্শ করেনি। এমন বিপ্লবীও ছিলেন যাঁরা রিভলভার বর্জন করে বার্মার সুদূর গ্রামাঞ্চলে প্রায় ষোল-সতেরো বছর আত্মগোপন করে থেকে বাংলাভাষাও ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের রিভলভারটি দাদার হাতে লোকনাথকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ পেতে যত্নবান ছিলেন এমন ঘটনাও আছে। অবিশ্বাস্য হলেও এইরূপ অনেক সত্য ঘটনা আমাদের অনেক বিপ্লবী বন্ধুরই জানা আছে। এই ব্যক্তিগত কলঙ্ক ও দুর্বলতার কথা আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কেবল এই সত্যটুকুই মনে রাখা উচিত যে, আমরা নিজেরা কতখানি অক্ষম ছিলাম। মাস্টারদা এই সবই জানতেন। বিপ্লবী বন্ধুরাও এই কথা জানেন। খুব সাধারণজ্ঞান থেকেও নিঃসন্দেহে বলা যায় মাস্টারদা কখনই অক্ষমের হাতে রিভলভার দিতেন না এবং যাঁরা অক্ষম, তাঁরা নিজেরাও রিভলভার সঙ্গে রাখতে চাইতেন না পাছে রিভলভার সমেত ধরা পড়েন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে সরোজ গুহ রিভলভার রাখার অধিকারী

ছিল—মাস্টারদা তাকে রিভলভার দিয়ে মিঃ ডুর্ণকে হত্যা করার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।

এই অংশে আমার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। সমস্ত ঘটনা আমি আন্দামান সেলুলার জেলে বসে আমাদের দলে সভ্যদের কাছে বিশদভাবে শুনেছি। যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন আর যাঁরা অংশ গ্রহণের সুযোগ পাননি—এই দু'পক্ষের কাছেই ঘটনার বিবরণ শুনেছি। ঘটনা বর্ণনায় যখন কোন বিভেদ লক্ষ করিনি কেবলমাত্র তখনই সেইসব ঘটনা বলে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পেয়েছি তার বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে মাস্টারদার বিশ্বাসভাজন সাথীদের কথায় মূল্যই বেশী দিয়েছি।

১৯৩১ সালের ২৮শে অক্টোবরের সন্ধ্যা। মিঃ ডুর্ণের জীবনের চরম ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

বেল্টের সঙ্গে '৪৫০ ব্যাসের রিভলভার নিয়ে ঠিক সময়ে মদের দোকানের সামনে প্রস্তুত হয়ে সরোজ অপেক্ষা করছে। ডুর্ণ সাহেবের গাড়ি এসে থামলো। আর্দালী দরজা খুলে দিল। সাহেব তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকলেন। একটু পরেই দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠবেন—ঠিক এমন সময় সরোজ রাস্তার একপাশ থেকে লাফ দিয়ে সামনে এসে দু'বার গুলি ছুঁড়লো—গুড়ুম্ গুড়ুম্। মুহূর্তে সাহেব ধরাশায়ী হলেন। আর্দালী ও ড্রাইভার প্রমাদ গুনলো। তারা কিছু ভেবে স্থির করবার আগেই সরোজ ঢাকা শহরের অন্ধকারের অন্ধকার গলিতে মিলিয়ে গেল।

অতর্কিত আক্রমণ, গুলীর শব্দ, মিঃ ডুর্ণের আর্তনাদ এবং ভীত ত্রস্ত আর্দালী ও ড্রাইভারের চীৎকার আশেপাশের লোকদের আকৃষ্ট করলো। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত সাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালের সংবাদপত্র খবরটি খুব ফলাও করে পরিবেশন করলো। কর্তৃপক্ষ ভয়ানক বিচলিত ও ত্রস্ত। কারণ, '৪৫০ ব্যাসের আর্মি রিভলভারের গুলী পেয়ে তারা বুঝতে পেরেছেন রিভলভার ও বিপ্লবী যুবক—দুই-ই খুব সম্ভব চট্টগ্রাম থেকেই আমদানী। কিন্তু যাই হোক, মিঃ ডুর্ণের 'আততায়ীর' কোন identity পুলিশ পেলো না। সরোজ গুহ যে মিঃ ডুর্ণকে গুলী করেছে—এ তথ্য বহুদিন পরে পুলিশের গোচরে আসে। মিঃ ডুর্ণ খুব গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁর ডান চোখ শেষ পর্যন্ত আর replaced হয়নি।

"Secret Police Abstract of Intelligence, Vol. XXXIX; S.P. Chittagong"—এইরূপ একটি file থেকে "A Brief History of Terrorism" শিরোনামায় একটি Typed document থেকে নিম্নলিখিত কথাটি সরবরাহ করছি—

"28.10.31. Dacca—An attempt was made on the life of Mr. Durno, I.C.S, Dist Magistrate, Dacca on 28.10.31. He was severely wounded. It is said that Sarojkanti Guha, an absconder of Chittagong committed this outrage." (P. 41 of the Brief History of Terrorism.)

ট্রাইবুনালের বিচারে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড প্রাপ্তির পর সরকার স্পেশাল স্টীমার যোগে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে চতুর্থ দিনে আমাদের চট্টগ্রাম জেল থেকে কলকাতায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে এলেন। পূর্ব-নির্ধারিত গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের পরস্পরকে আলাদা করে রাখবার উদ্দেশ্যে কিছু পরের দিনই ছোট ছোট দলে ভাগ করে বাংলার বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থানুযায়ী সুরক্ষিত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী হলাম- রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, আমার দাদা (নন্দলাল সিংহ) ও আমি।

আলিপুর জেলের নম্বর ইয়ার্ডে আমাদের বিপ্লবী সাথী কালী চক্রবর্তী আকুল আগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষায় আছে। সেই ইয়ার্ডে রাজনৈতিক বন্দীদের আরও অনেকেই ছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল অভ্যুত্থানের রাত্রে এবং ২২শে এপ্রিল জালালাবাদের যুদ্ধে কালী চক্রবর্তী সাহসের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিল। তারপর আবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে সে চাঁদপুর স্টেশনে ইনস্পেকটার জেনারেল মিঃ ক্রেগকে হত্যার ভার নেয়। কিন্তু শীতের রাতের কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারে ভ্রমক্রমে মিঃ ক্রেগের পরিবর্তে তারা তাঁর পার্শ্বচর তারিণী মুখার্জীকে আক্রমণ করেও তিনি নিহত হন। পরে ঘটনাস্থল হতে প্রায় ১২ মাইল দূরে কালী চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বন্দী হয়। বিচারে রামকৃষ্ণের ফাঁসি ও কালী চকবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

এই সমস্ত খবরই আমাদের বিচার চলাকালীন সময়ে আমরা পেয়েছি। আমাদের দণ্ডাদেশের কয়েকমাস পূর্বে আলিপুর জেলেই রামকৃষ্ণের ফাঁসি হয়।

কালীচক্রবর্তী যে আলিপুর জেলে আছে তা জানতাম—কিন্তু তাকে যে বম্‌ইয়ার্ডে রাখবে ও তার সাথে আমাদের দেখা হবে—এতটা ভাবতে পারিনি। অভাবনীয় এই মিলন! এই সুদীর্ঘকালে প্রত্যেকের জীবনের উপর দিয়ে কত ঝড়ঝাপটা বয়ে গেল। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে যাদের শয্যা পাতা সামান্য সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে তাদের চঞ্চল বিচলিত হলে চলবে কেন? অতি দুঃখের দিনেও জীবনদেবতার আশীর্বাদে আমরা বঞ্চিত হইনি—জীবনে বহু আনন্দ উপভোগ করেছি! ভাড়াটে সৈন্যদল ও বিপ্লবীদের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য! এই পার্থক্য আছে বলেই স্বদেশপ্রেমিক ভিয়েৎকংরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দুর্জন শক্তির বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অসম সাহস ও অমিতবিক্রমের সঙ্গে নিত্য নূতন অভিনব উপায়ে যুদ্ধ করে চলেছে।

কালী চক্রবর্তীও এই একই জাতের বিপ্লবী। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার দুর্বার প্রেরণা পিতামাতার স্নেহচ্ছায়াচ্ছন্ন শান্ত গৃহাঙ্গন ত্যাগ করে আমরণ সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—রক্তাক্ত বন্ধুর পথে বেরিয়ে এসেছে, দুঃসাহসের পাখায় ভর করে দ্বিধাহীন নিঃশঙ্ক চিত্তে বারে বারে মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বিপ্লবী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—বিপ্লবীদের একটু সংস্পর্শে এসে বা একটি পিস্তলের একটুখানি সক্রিয় অনুভূতি উপভোগ করে, অথবা কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করে—। উন্মাদনা বশে কোন একটি সাহসিকতাপূর্ণ অ্যাকশনে "একটু নাম" অর্জন করে বহু সহস্র তথাকথিত বিপ্লবী চিরতরে বিপদসঙ্কুল পথ পরিহার করেছেন।

কালী চক্রবর্তীর বৈপ্লবিক চরিত্রের গঠন হৃদয়ঙ্গম করতে হলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ১৮ই এপ্রিল রাত্রে বৃটিশের পোর্ট টাউন চট্টগ্রামের বুকের উপর দিয়ে প্রচণ্ড প্রলয়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেল!—পুলিশ ও মিলিটারী ঘাঁটি বিপ্লবীরা দখল করলো। টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও রেল-লাইন ধ্বংস ও স্থানচ্যুত হলো—রাতে খণ্ডযুদ্ধের কোলাহলে ও গুলির শব্দে সুপ্তিমগ্ন নিশীথের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো। চারিপাশে মৃত্যুর বিভীষিকা—মরণ যেন স্বাগত জানাতে দুবাহু মেলে দুয়ারে দাঁড়িয়ে। কিন্তু মৃত্যুর এই করাল ছায়া কালীর হৃদয় স্পর্শ করতে পারলো না—এর চারদিন পরেই যেখানে শত্রুর সঙ্গে হাজার হাজার গুলী বিনিময়কালে আমাদের বারোজন সাথী শহীদের গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণে ধন্য হয়েছে—সেই অবিস্মরণীয় জালালাবাদ পর্বত-যুদ্ধের ঘনঘটার ঘোর পরিস্থিতিতেও কালীর হৃদয়-তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত

হয়েছে—"ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" আবার কয়েক মাসের মধ্যেই এই বিপ্লবীর চলার বন্ধুর পথে এলো কর্তব্যের ডাক। কালীর মনে সাড়া জাগলো—The unfinished work which they who fought here, have thus for so nobly advanced··· ·that from these honoured dead we take increased devotion so that cause for which they gave the last full measure of devotion"—Abraham Lincoln—"বিপ্লবীরা যে-মহৎ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছেন তার অগ্রগতি অবশ্য স্বীকার্য। সেই মহান আদর্শে মহিমামণ্ডিত বীর শহীদদের কাছ থেকে আমরা আরো অনেক প্রেরণা গ্রহণ করবো, যাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য চরম নিষ্ঠার নিদর্শন রেখে গেছেন।"

কালী চক্রবর্তী স্বয়ং মাস্টারদার হাতে গড়া বিপ্লবী সৈনিক। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের বৈপ্লবিক মন্ত্রে কালী চক্রবর্তী দীক্ষা দিয়েছিল রণধীর দাশগুপ্তকে।

রণধীর চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত কবিরাজ [illegible] দাশগুপ্তের পুত্র—অল্প বয়স—স্কুলে পড়ে। আমাদের মধ্যে রণধীরই সবার চাইতে বিত্তশালী পরিবারের ছেলে। এই অল্প বয়সেই সে সচ্ছল পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মীয়-স্বজনের অনাবিল স্নেহমমতার সহস্র বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখায় যোগ দেয়। [illegible] কিছুদিন আগে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। কিশোর বয়সের সৈনিক সমাবেশই সূর্য সেনের নেতৃত্বের Secret of Success

যে বয়সে ক্ষুদিরামের মত ছেলে হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে—যে-বয়সে সংসারের নানা প্রলোভন মনকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম স্পর্শ করে—যে বয়সের বৈপ্লবিক প্রেরণাকে রোধ করার জন্য ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ও পরিবেশের প্রাচীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল, রণধীর ছিল সেই বয়সের নির্ভীক সৈনিক। তবে কেবলমাত্র অল্প বয়সই যে বিপ্লবী সৈনিক বাছাই করার উপযোগী Criteria তা' মনে করার কোন কারণ নাই। নয়তো অল্পবয়সের ছেলেরাও স্বীকারোক্তি করে বা রাজসাক্ষী হয় কেন? মানব-চরিত্রের মূল গুণ—স্বার্থত্যাগ, সাহসিকতা, নিরহঙ্কারিতা—প্রভৃতি জীবনের প্রথম থেকেই কারও থাকে আবার কারও থাকে না। বৈপ্লবিক চরিত্রের মূল গুণগুলি প্রথম থেকেই রণধীরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তারপর কালীচক্রবর্তী ও স্বয়ং মাস্টারদা সেই লৌহখণ্ড আগুনে পুড়িয়ে ইস্পাতে পরিণত করেছিলেন।

রণধীরও ১৮ই এপ্রিলের রাতে তার দাদার দোনলা বন্দুকটি হস্তগত করে যুব-বিদ্রোহে যোগ দেয়।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের ইতিহাসে আমাদের অজ্ঞাতসারে যে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটবার উপক্রম হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি হতো—ফাঁসিমঞ্চে অন্ততঃ আমাদের পাঁচ জনের জীবনাবসানের পর। এই তথ্য পরিবেশনায় রণধীরকে আমরা বিশেষ ভূমিকায় দেখতে পাবো। এই ঘটনার নায়ক রণধীর। ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারে আমাদের প্রাণদণ্ড না হওয়াতে অন্য কি উপায়ে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা যায়—বৃটিশ-সরকারের এই কূট চক্রান্ত রণধীর দাশগুপ্তের দ্বারাই ব্যর্থ হয়েছিল। প্রামাণ্য দলিলপত্রের সাহায্যে এই সরকারী চক্রান্ত উদঘাটিত হবে। পটভূমিকার প্রয়োজনে তার আগে আরও একটু কিছু বলতে হচ্ছে।

একজন রায় বাহাদুর, একজন খাঁ বাহাদুর ও প্রেসিডেন্ট একজন ইংরেজকে নিয়ে B C L. A Act-এর ধারা অনুযায়ী ট্রাইবুনাল আদালত গঠিত। এই বিশেষ আদালতে বন্দীদের বিচারের কোন সুযোগ সুবিধা থাকেই না উপরন্তু ন্যায়বিচারের আশাও জলাঞ্জলি যায়। আমাদের বিচার ট্রাইবুনাল আদালতেই চলেছে। কাজেই আমাদের ফাঁসি নিশ্চিত—এ [illegible] সকলেরই ধারণা। কিন্তু দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো—আমাদের কারুরই ফাঁসির হুকুম হলো না। আত্মীয় স্বজনেরা ট্রাইবুনাল [illegible] দপ্তরের আশীর্বাদ জানালেন। বৃটিশ সরকারের মহানুভবতায় মুগ্ধ হলো—তাদের জন্য কত না মঙ্গলকামনা করলেন। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের হাসিতে আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী আইনজ্ঞদের মুখ উদ্ভাসিত—তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

প্রবঞ্চনা, ছলনা, খলতা ও নিষ্পেষণনীতির ওপর গ্রথিত ভিত্তি ইংরেজ শাসনব্যবস্থা ও সহৃদয়, ন্যায়বান প্রভৃতি সংজ্ঞায় পরিভূষিত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসকদের প্রতি সেদিনও অনেকের শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু যখন দেখি কারো কাছে আজও এই মোহমুক্তি ঘটেনি—তখন মনে হয় রবার্ট ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখের ছলনা, খলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

যাঁদের অতি বিচক্ষণ বলে ধারণা ছিল এই সেদিনও তাঁরা কেউ কেউ বলেছেন—"আরে রাখুন মশায়, ট্রাইব্যুনাল আদালত ও ইংরেজ-সরকারের সমালোচনা আর করবেন না। ইংরেজ আমল ছিল বলেই আপনারা অতখানি

সুবিধা পেয়েছিলেন। মামলা ডিফেণ্ড (আত্মপক্ষ সমর্থন) করবার নামে সরকারকে প্রাণভরে গালিগালাজ করবার সুযোগ নিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে আপনারা আজও যে বেঁচে আছেন—মনে রাখবেন ইংরেজ-সরকারের মহানুভবতায়ই তা সম্ভব হয়েছে!"

সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে—সরকারকে কি কারণে ও কেমন করে আমাদের শর্ত মেনে নিয়ে আমাদের কাউকেই প্রাণদণ্ড দেবে না বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়েছিল এটা তখন কারও জানবার সুযোগ ছিল না—বা কাউকে জানানো আমাদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এই ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারেই ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেও, প্রদ্যোৎ, দীনেশ, রামকৃষ্ণ প্রমুখকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে সরকারকে তো এতটুকু কুণ্ঠিত বা বিচলিত দেখা যায়নি। মাস্টারদা বা তারকেশ্বরের গলায় ফাঁসির রজ্জু পরিয়ে দিতেও তাঁরা এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। তবে ইংরেজ-সরকারই আমাদের ফাঁসির হুকুম দিলেন না কেন? কাজেই দেশবাসীর মনে ধারণা হতেই পারে—আমাদের চরমদণ্ড না দেওয়ার কারণ—সরকারের মহানুভবতা!

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম,-যুব-বিদ্রোহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যখন প্রকাশিত হয় তখন পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেই সরকার আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেননি। এই ক্রূর হীনচক্রান্ত আমাদের বিপ্লবী সাথী রণধীর দাশগুপ্তের সাহায্যেই ব্যর্থ হয়েছিল—প্রামাণ্য দলিল সাহায্যে এ তথ্য যথাস্থানে উদ্‌ঘাটিত করবে। কেবলমাত্র এইটুকু ইতিহাসই সেদিনও আমরা জানতাম।

বহুবছর গত হয়েছে। দিল্লীর National archive থেকে হঠাৎ সেদিন এই সম্বন্ধে বিস্ময়কর গোপন তথ্যপূর্ণ নথীপত্র হস্তগত যদি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর না হ'তো—তবে কি উপায়ে আপোস-মীমাংসার গোপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো যায়—বৃটিশ-সরকারের এই হীনতম চক্রান্তের কথা দেশবাসীকে জানাবার সুযোগ পেতাম না।

ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হলো—মনে আমাদের অখণ্ড বিশ্বাস—তীব্র গতিবেগ নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম এগিয়ে যাবে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই আমরা মুক্ত হয়ে দেশবাসীর সঙ্গে মিলিত হবো! কে জানতো—বৃটিশ-সরকার আমাদের সেই স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করবার জন্য এক ঘোর চক্রান্তে লিপ্ত? যদিও অবিশ্বাস্য তবু যা লিখছি তা অকাট্য সত্য!

এটা কি চিন্তা করা যায়—Secretary for State—India Government,—কেন আমাদের ফাঁসি হলো না ও কি উপায়ে হাইকোর্টে আবার মামলা তুলে আমাদের ফাঁসির ব্যবস্থা করা সম্ভব, জানতে চেয়ে বিলাত থেকে ভারত-সরকারকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন? আমাদের ফাঁসির ব্যবস্থা করবার জন্য—বিলাতের শাসকবর্গের সঙ্গে ভাইসরয় ও বাংলা সরকারের যে সমস্ত বার্তা বিনিময় হয়েছে সেই সকল দলিলই আজ আমি এখানে প্রকাশ করবো। আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে যে-সকল সরকারী নথীপত্র সংগৃহীত হয়েছে—সবগুলি নীচে উদ্ধৃত করলাম। দলিলগুলি ইংরেজীতে লেখা। এগুলির পুরোপুরি অনুবাদ দিয়ে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না। তবে সকলের বোঝবার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি টেলিগ্রামের মূল বিষয়বস্তুটি সংক্ষেপে বাংলায় লিখে যাচ্ছি। এই তথ্য-সংক্রান্ত সরকারী দলিলের হুবহু নকল নীচে উদ্ধৃত করলাম :—

[হোম ডিপার্টমেণ্ট পলিটিক্যাল টেলিগ্রাম মারফৎ জানতে চাইছেন আমাদের ফাঁসি দেবার অভিপ্রায়ে হাইকোর্টে আবার মামলা রুজু করা সরকারের পক্ষে সম্ভব কিনা :]

"Govt of India, Home-Dept Poll. 1932. File No. 7.4.1932 Political.

Subject (of the file): Judgement of the special Tribunal in C—A--Raid Case No: 1. of 1930. Questions whether Government can move the High-Court to enhance the sentences passed by the tribunal and whether the High-Court can exercise these revisional powers in respect of sentences under the B—C—L—A—Act."

["চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায়" কার কার কি কি সাজা হয়েছে এবং দণ্ডাদেশের পরে কোন গোলযোগ হয়নি ও মধ্যাহ্নের পূর্বেই নির্ঝঞ্ঝাটে সকলকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হচ্ছে] :

"SL. No. 1. of File.

Telegram R from the G—O—B. No. 8378P dt : 1.3.32.

Commissioner of Chittagong March First regarding special Tribunals Judgement in Armoury Raid Case Begins. Judgement delivered this morning fourteen convicted

twelve sentenced transportation for life one to two years rigorous imprisonment one to three years brostal. Sixteen acquitted rearrested under Amendment Act. All left mid-day Calcutta no disturbance so far latter follows Ends. copies Judgement will follow."

[উপরের টেলিগ্রামেরই পুনরাবৃত্তি করে Home Department political বিভাগ থেকে secretary for state India-কে পাঠাচ্ছে]

"SL. No : 2.

(1) Above repeated by H.D. to S/S for India vide. telegram No : D. 2279/32. Poll. dt. 1.3.32."

[Secretary of state লিখছেন প্রথম টেলিগ্রামের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠেছে—যে বারোজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে তারা প্রত্যেকেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা]

"SL. No. 3.

From S/S. No. 708 dt. 4.3.32 to 901 H.D. your telegram of 1st instant D. 2279 Political Chittagong. Question in the Parliament for Monday asks whether twelve accused sentenced to transportation for life actually took part in the armoury raid. What are the facts? SL. 4. [GOB. furnished with copy of SL. No. 3."]

[পার্লামেন্টে যে প্রশ্ন হয়েছে তার উত্তরে বাংলা সরকার জানাচ্ছেন—দশজন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে ও একজন রেল-লাইন ধ্বংসে অংশ গ্রহণ করেছে এবং অপর একজন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করলেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, দণ্ডাদেশে এইরূপ শৈথিল্য ব্যাখ্যা করা শক্ত।]

SL. 5 Telegram R from G—O—B—No : 31 dated the 6. 3. 32.

Reference Home Dept. Telegram dt. March. 5th 713. out of 12 Sentenced to transportation for life C—A—R—Case evidence shows that ten participated in armoury raid, one

in wrecking railway line, one took no part in raid but was a conspirator. [Note on the file under SL. No : 5.]

For information S.D.I.B. may see. E. R. 7.3.32. Secretary Should see. If this is the case, the sentences passed are all the more difficult so explain. D.I.B. should see.

S. N. Roy.
7.3.32.
H. W. Emerson.
8.3.32.
J. C. [rerar] 8. 3. 32.

Director Intelligence Bureau.

[উচ্চপদস্থ দু'জন সরকারী কর্মচারী তাঁদের অন্তরের বিক্ষোভ প্রকাশ করে লিখছেন—বিচার-বিভাগ বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি যেভাবে নম্রতা প্রদর্শন করে চলেছেন, তাতে শাসন-বিভাগ ক্রমেই তাঁদের মনোবল হারাচ্ছেন এবং জানা যাচ্ছে অনেকে আগে থেকেই পেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত করছেন]

"It is unfair to make deductions from press abstracts of Judgements, but what I have seen indicates that the Judges hunted for and had great difficulty in finding reasons for their deplorable liniency. Their decision not to hang any one in this case in which 7 murders were committed, coupled with sentences passed recently in other terrorist cases, has made people vehement in declaring that in Bengal of to-day there is no justice, only a mass of bad law. The mass in the street blames the Government and refuses to recognise the differenc between the judiciary and executive. The executive has been badly hampered by the judiciary in its dealing with terrorism for a number of years ; if the deterioration in the judiciary continues the executive shall be emasculated. I understand that there is

a steady trickle of applications for proportionate pensions from executive officers in the province.

Sd. Williamson.
11.3.32.

Seen.

S. N. Roy.
11.3.32."

[পরিত্যক্ত।]

"S L. 6. (omitted. D. P. D. M.)"

[বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে S. N. Roy অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার জাজমেণ্টের চারটি নকল পাঠাচ্ছেন।]

"SL No. 7 Letter from G—O—B No. 1060 S. P. dated the 7th April, 1932.

Subject : C—A—R—Case Judgement.

I am directed to forward here with for information of India four copies of the Judgement in the C—A—R—Case."

[S. N. Roy ৭ নম্বরের নীচে টিকা নিচ্ছেন। তিনি বলছেন হাইকোর্টে আবার এই মামলা রুজু করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে তিনি বিচার করে দেখবার সুযোগ পান নি। তাঁর মতে এই বিষয়ে Legislative Department-এর উপদেশ নেওয়াই সঙ্গত।]

"[Noting below 7]

... I have not examined the question whether a reference to the H C. for enhancement of sentence would lie in this case. It may be worth while asking Legislative Department to look into this aspect of the case and to advise.

S. N. Roy
14.4.32."

[H. W. Emerson. সাহেব Honouroble member কে লিখছেন জাজমেণ্টের ২০৩ ও ২০৪ পৃষ্ঠা দু'টি যেন পড়ে দেখেন। এখানে ট্রাইব্যুনাল

ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। হাইকোর্টের Revisional Power আছে কিনা তা' যাচাই করে দেখার নজীর এখনও পর্যন্ত নেই। তবে র‍্যান্‌কিন, ক্রেরর ও আমার মধ্যে এ বিষয়ে যা' আলোচনা হয়েছে তা'তে র‍্যান্‌কিনের অভিমত হচ্ছে হাইকোর্টে মামলা রুজু করার প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে না; বরঞ্চ Legislative Department-কে এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হোক্]

"H. M. should read the arguments at p. P. 203. and 201 of the Judgement, by which. Tribunal justified the non-imposition of death sentences. We may obtain the views of Legislative Dept. on the line taken by the tribunal…… …so far as I know the qu.—as to whether the H—C—of—Cal.—has revisional powers has not actually been put to the test, but from a conversation between Sir George Rankin, Sir James Crerar and myself. I gained the definite impression that Sir G—R—took the view that a revisional application was likely to fail on the ground of jurisdiction. The Legislative Dept. might be asked to advise on this point.

H. W. Emerson.
16.4.32."

[H. W. H. সাহেব লিখছেন তাঁর খুব অবাক লাগছে কি করে ষড়যন্ত্রকারীদের নেতারা তাদের সমস্ত অপরাধ থেকে অব্যাহতি পেলেন? তিনি আরও বলছেন যে, এর বিহিতের আর কোন উপায় নেই এবং তিনিও মনে করেন এই ব্যাপারে Legistative Department-এর অভিমত নেওয়াই উচিত।]

"The arguments by which the commissioners have persuaded themselves that in the case at any rate of the leaders of the conspiracy it was not necessary to carry out the natural consequences of their findings seem to me astounding. It looks however, as if there is no remedy.

I agree that we should ask the views of L—D—on the two points raised in Secretary's note.

H. W. H. [aig].
17.4.32

[Legistative Department থেকে Honourable Member-কে লেখা হচ্ছে যে, তাঁরাও অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন কি করে ট্রাইবুনালের কমিশনারেরা এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। আইনের কোন ধারার অজুহাতে আমাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়নি তা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করছেন।]

"Legislative Department On the merits of the decision by the commissioners that no death sentences should be imposed, I respectfully agree with the Honourable Home Member. The grounds assigned for this decision appears to me with respect to be nothing less than fantastic. The common convicted the accused of an offence punishable under sub-section 1 of section 120 B, read with sections 302 and 109. It is doubtless then as observed by the comm—that the activities of the accused constituted also an offence punishable under section 121A. But there can plainly be no concievable justification for the argument of the commissioners that because acts done by the accused constituted two different offences of which judged by the provision of its punishment was graver than the other, the sentences to be passed for the graver offence should be influenced by the fact that maximum and mimimum punishments which would have been awardable on conviction of less grave offence were less severe than the maximum and minimum punishments provided for the graver offence. In other words, sentences to be awarded for the graver offence should have been

determined in the light only of the activities of the accused as constituting a graver offence."

[গ্রেহাম সাহেব লিখছেন, ট্রাইব্যুনালের মামলায় রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ড বৃদ্ধির প্রার্থনা করার ক্ষমতা সরকারের আছে কিনা তা তিনি সঠিক জানেন না। তিনি লিখছেন, সমস্ত আইন পর্যালোচনা করার পর একটি সুন্দর point তাঁর মনে এসেছে—১৯২৫ সালের B—C—L—A—Act—অনুযায়ী যে কোর্ট বসানো হতো তার ক্ষমতা কি বর্তমান ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা হতে নিকৃষ্ট ছিল ? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য গ্রেহাম বাংলার এ্যাড্‌ভোকেট্‌-জেনারালের মত গ্রহণের সুপারিশ করেন এবং এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে হাইকোর্টে সাজা বৃদ্ধির দরখাস্ত সরকার করতে পারেন কিনা, এটাও তাঁর নিকট থেকে জেনে নেবার অনুরোধ জানান। কমিশনারদের রায় পড়ে স্বতঃই মনে হয় প্রাণদণ্ড না দেওয়ার জন্য তারা বাজে অজুহাত খুঁজে বেড়িয়েছেন। এই Department এখনও বিবেচনা করে দেখিনি যদি দণ্ড বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করতে হয় তবে কোন্ কোন্ আসামীর বিরুদ্ধে করা হবে। যদি সেরকম দরখাস্ত করতে হয় তবে এ্যাড্‌ভোকেট্‌-জেনারেলকে কেবল জাজ্‌মেণ্টটা পড়ে দেখলেই চলবে না, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ—যা' কিছু ট্রাইব্যুনালে লিপিবদ্ধ করেছে, সবগুলি পড়ে দেখতে হবে।]

"[In para 2 of the note L. Graham discussed various provisions of the code, and then concluded that he was not quite sure whether Cal. H—C—had the power to enhanec the sentences. The concluding portions of this note said]······

All then that I am prepared to say now is that it is a nice point as to whether the court set up under the B—C—L A—Act. 1925, is an inferior criminal court within the meaning of 435 of the code. The matter is one of considerable importance and I would suggest that the opinion of the Advocate General, Bengal may be taken on this point. At the same time, the A—G—B might be asked to advise whether on merits this is a case for applying for enhancement of the sentence. All that has been said in

the first part of this note is that the commissioners appear to have gone out of their way to find reasons which on the face of them appears to be entirely inadquate, for avoiding giving capital sentences. The questions inrespect of which prisoner, if any, application for enhancement of punishment should be made, has not been examined by by this Department. It would involve a complete and detailed examination not only of the Judgement also of the evidence recorded by the commissioners and it is submitted that this falls properly within the scope of A—G.

L. Graham.
22. 4. 32."

[BLM'S Minute থেকে জানতে পারছি—এড্‌ভোকেট-জেনারেল অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ট্রাইবুনাল রায়ের বিরুদ্ধে সাজা বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করবার অধিকার সরকারের নেই। হাইকোর্টে পুনর্বিচারের জন্য দরখাস্ত করবার অধিকার আছে কেবলমাত্র দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরই।

হাইকোর্টের Revisional Power অনুযায়ী ট্রাইবুনাল রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট নিজস্ব অধিকারে মামলা পুনর্বিচারের জন্য দাবী করতে পারে না—এটাও এ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেলের অভিমত।]

"[BLM'S minute]

Can the Government go to the H—C—C to alter the nature or enhance the sentences in the chittagong case? The answer, in my opinion, is in the negative. No right of appeal or application for revision has been given to the Government, by any law, in the case of trial under B—C—L—A—A, Section 3 of the B—C—I. (supplimentary) Act 1925, gives the right of appeal to a convicted person only.

2, Can the H—C—of its own motion exercise revisional powers under chapter XXXII of the Cr—P—c—in

such a case? In my opinion, the answer is also in the negative. The H—C—derives its powers over a Tribunal set-up by the Bengal Act, under the supplimentary act 1925, and not under the Cr—p—c. That Act confers power• contained in chapter XXXI and chapter XXVII of the Cr—P—C upon the maxim expressio unius exclusio alterius, powers under chapter XXXII are excluded".

তিন নম্বর প্যারাগ্রাফে আইনের মূল ধারার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টের Revisional Power (পুনর্বিচারের ক্ষমতা) বা দণ্ড বৃদ্ধি করার জন্য সরকারপক্ষের আপীল—কোনটাই ফলপ্রসূ হবে না। পরিসমাপ্তিতে বলা হচ্ছে—হাইকোর্ট Revisional Power প্রয়োগ করুক, আইনসভা সে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি।]

"BLM'S Minute contd.

3. Apart from the other consideration, the inclusion of revisional power would lead so a lifelong result. It is obvious that Government cannot appeal from an order of acquittal by the Tribunal. If revisional powers be coeeeded to the H—C—it can deal with cases of acquittal as if the Government had applied. This would be contrary to the intension of the legislature as disclosed in section 3 of the supplimentary Act. Again, the Legislature by limiting the powers, conferred on the H—C—, to chapter XXXI clearly intended that the sentences should not be enhanced. This intension would be defeated if the H—C—exercises revisional powers under chapter XXXII. Similarly, limiting the right of appeal to convicted persons, the Legislature denied the Government the right of appeal even in a case of conviction so as to permit an alteration of the nature of the sentence. This intention would also be defeated by the High Court exercising revisional powers. The conclusion, therefore

is that, the Legislature did not intend that the H—C— should exercise revisional pewers."

[৪ নম্বর প্যারাগ্রাফেও বিভিন্ন আইনের ধারা উদ্ধৃত করে ও সেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে, হাইকোর্টের Revisional Power প্রয়োগের ক্ষমতা নাই।]

"4. In the face of expressed provisions of section 3 of the Supplementary Act, there is no warrant for the inference that the H—C—can exercise revisional powers merely because of the General wording of section 435 Cr—p—c. In my opinion, the expression inferior criminal court in section 435 means inferior in the graduation laid down in section 6 Cr—p—c. In the case of other courts contemplated in section 6, the regulating law will be the law under which such other courts are constituted and not the Cr—p—c. In respect of such Courts, the H—C. would only have such powers as such other law confers."

[৫ নম্বর প্যারাগ্রাফে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের Revisional Power অথবা দণ্ড বৃদ্ধির জন্য হাকোর্টে দরখাস্ত করার আইনগত কোন অধিকার সরকার পক্ষের আছে কিনা—এই সব প্রশ্নের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালের বিশেষ ক্ষমতার পরিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার বা হাইকোর্টের আর কিছু করবার আইনগত কোন সুযোগই নেই।]

"5. It may be noticed that in section 476B, the expressions 'superior court' and 'court subordinate to it' are used in the sense of the former being a court 'to which appeals ordinarily lie from the sentences of the latter court.' That sense however, is limited to the purpose of section 195, as sub-section (3) of the section 195 shows. If by analogy, 'inferior court' be taken to mean a court from whose sentence appeals

ordinarily lie to a superior court, even then it is open to contention whether the limited appeal given by section 3 of the Supplementary Act comes under the category of *ordinary*. In any case the meaning attached to the words 'superior' and 'subordinate'. On the test of appeal is not of general application, but is confined to the purposes of section 195 subordination for a single specific purpose does not involve subordination for all purposes. Allthough in a popular sense, 'The special Tribunal' is court inferior in status to the H—C, I am not prepared to attach the popular sense to the word 'inferior' in section 435."

[৬ নম্বর প্যারাগ্রাফের Revisional Power ও আপীলের ক্ষমতা নিয়ে আইনগত আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে Revisional Power-এরই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত অধিকার আছে।]

"6. Powers of revision are more extensive then power in appeal. The express grant in restricted powers is appeal in a specified class of cases only cannot, in my opinion, carry with it wider powers of revision in all cases."

[৭ নম্বর প্যারাগ্রাফে জানা যাচ্ছে Government of India Act-এর ১০৭ ধারার ভিত্তিতে হাইকোর্ট Revisional Power-এর অধিকারী নয়।]

"7. The power of Superintendence under section 107, Government of India Act. is confined to the purposes mentioned in the section and cannot include revisional Powers."

[৮ নম্বর প্যারাগ্রাফে বলা হচ্ছে, জনৈক বিশেষ সদস্যও মনে করেন আইন-সংক্রান্ত যে-সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচনা সাপেক্ষ।]

"8. Having expressed my views, I agree question under

consideration is important and arguable, and I endorse the suggestion that the A—G. be consulted.

B. L. M. [ittar] 23.4.38"

[হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে লিখছে: Mr. S. N. Roy ও Mr. Emerson—এর টিকা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। Mr. H. G. H.-এর টিকা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

Mr. H. G. H.-এর টিকায় তাঁর মনের গভীর আক্রোশ প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি Secretary ও Law Member-এর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হাইকোর্টের Revisional Power নেই। এই ক্ষেত্রে তাঁর মতে বাংলা সরকারের অভিমত চাওয়া প্রয়োজন। যদি বাংলা-সরকারও তাঁদের মত এইরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে সরকারের হস্ত দৃঢ় করার জন্য আইনগত ভাবে B—C—L—A—Act এর বিশেষ পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এই Act-এর ছোট ছোট সংশোধনের পক্ষপাতি তিনি নন, তিনি চান—ব্যাপক সংশোধন। Law Member-এর কাছ থেকে তিনি যা' জেনেছেন তাতে তাঁর ধারণা হয়েছে, হাইকোর্টকে সেইরূপ Revisional Power দিলে সরকারই বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হবেন। সেই হেতু পুনর্বিচারের জন্য 'ফাইলটি' তিনি Law Member-এর কাছে পাঠাবার অনুরোধ জানাচ্ছেন।]

"Home Dept.

[Note of S. N. Roy (26.4.32), Emerson (26.4.32) omitted]

I have discussed with secretary and have also some talk with the Hon'ble Law Member. It seems pretty clear that it would not be held that the H—C—has revisional Powers. If we ask the Bengal Government to obtain a opinion on this point and the opinion is adverse, then I think we must expect a renewal that we should amend the B—C—L—A—A so as to provide these powers. On general grounds I am very definitely opposed to smell amendments to these highly controversial Acts. I think we are likely to have our hands quite full enough with major measures. I also

gather from the Hon'ble Law Member that there might be from our point of view, dangers in extending the authority of the H—C—in these casses. The file should be sent again to the Hon'ble Law Member in connection with this point.

H. G. H. [aig]
1.5.32."

[এই Hon'ble Law Member—ও ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের Revisional Power-এর বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ সমর্থন করেন। যুক্তি হিসেবে তিনি জানাচ্ছেন যে-ট্রাইব্যুনাল বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মামলা দ্রুত শেষ করা, যদি Revisional Power হাইকোর্টের হস্তে ন্যস্ত থাকে তবে তার সুযোগ নিয়ে মামলায় বিলম্ব ঘটানোর পথ সর্বদাই উন্মুক্ত থাকে। যদিও B—C—L—A—Act-এর ধারায় আসামী পক্ষকেই আপীলের সুযোগ দেওয়া আছে, তবু সাক্ষ্য গৃহীত হওয়া ও রায় দান পর্যন্ত মামলার দ্রুত সমাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে মামলা বিলম্বিত করার কোন আশঙ্কা থাকে না। সন্ত্রাসবাদীদের মামলায় এরকম বিলম্ব ঘটবার সুযোগ নেওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, তারা সেই সুযোগ পেলে তাদের দ্বারা সাক্ষীদের গায়েব করে ফেলার ও প্রাণনাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। হাইকোর্টের Revisional Power থাকলে তা' প্রয়োগের জন্য যে কোন সময়েই প্রার্থনা করা যায়। সেই হেতু হাইকোর্টের Revisional Power থাকা সরকারের পক্ষে যে বিশেষ অসুবিধাজনক তা'তে সন্দেহ নেই। পরিসমাপ্তিতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদীদের মামলা দ্রুত সমাপ্তির পথে বিলম্ব ঘটাবার কোন কৌশলই যেন তারা অবলম্বন করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে হাইকোর্টের Revisional Power না থাকা উচিত। এই প্যারাগ্রাফের শেষ লাইনটিতে তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে, যেখানে তাঁরা বলছেন যে, এইরূপ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে-পথ অনুসরণ করতে হবে তা' বাংলা-সরকারই করবে।]

The Hon'ble Law Member

I am definitely opposed to the grant of revisional powers to the High Court over Tribunals set up under

B—C—L—A—A. One of the main purposes of these Special Tribunals is speediness of trial. The right of appeal given by the supplementary Act does not interfere with the trial during its progress. It can be exercised only after the witnesses have been examined and judgement has been pronounced. No mischief is done then. But if revisional powers be given, the possible advantage of the Goverment exercising the right in rare cases will be overwhelmingly counter-balanced by the risk of the accused going up to the H--C—at frequent intervals; if only for the purpose of delay. The revisional power of the H—C—can be invoked *at any stage*. Delay is frequently part of the defence tacties, generally to gain time for getting at, if not doing away with, prosecution witnesses. There would be no means of preventing the accused from going up to the H—C—on plansible, even though frivolous, grounds. The invitable result would in most cases be holding up of the trial. This is a real danger. Unbroken speed is the essence of a trial in the terrorist cases and we cannot afford to admit of delay or periodical copp-ages.

B. L. M [itter]
2. 5. 32.

[Mr. Williamson, Dirctor of Intelligence Bereau অন্তরের দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করে বসেছেন, এই সকল বিষয়-সংক্রান্ত সব কাগজ-পত্রই তিনি দেখেছেন এবং বুঝতে পারছেন যে, এই অবস্থায় এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করার যেন আর কিছুই নেই। Mr. H. Williamson-এর মতে বাস্তব প্রতিকার হিসাবে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট ও কমিশনার নিযুক্ত করার ব্যাপারে ভবিষ্যতে তাঁদের খুব সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে—এঁরা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ভীক চিত্তে উপযুক্ত দণ্ড দিতে দ্বিধাগ্রস্ত না হন; প্রয়োজন

হলে ট্রাইব্যুনালের জন্য অন্য প্রদেশ হতে ও যোগ্য বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা উচিত।]

"Seen and returned with thanks. The remedy in future (there is no remedy applicable to the 12 murdered and unavenged policemen and soldiers) is to appoint judges, men who will not flinch from their duty. I have suggested elsewhere that the field of recruitment for such tribunals should be extended to other provinces.

H. Williamson.

4. 5. 32.

Director, Intelligence Bureau

এ পর্যন্ত যে সমস্ত সরকারী দলিল উদ্ধৃত করলাম তা'তে পাঠকদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই সব বিষয়বস্তু আমার পূর্ব বক্তব্যের বিপক্ষে আত্মঘাতী মহাস্ত্রের মত প্রযোজ্য হচ্ছে। পূর্বে আমি বলেছি, ট্রাইব্যুনালের বিচারে আমাদের কাউকেই প্রাণদণ্ড দেবেন না বলে সরকার আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। এই যে গোপন চুক্তির কথা উল্লেখ করেছি তার আনুষঙ্গিক ও বাহ্যিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করেছিলাম সরকার আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ছিলেন এবং ট্রাইব্যুনাল বিচারের রায়ে ফাঁসির হুকুম জারী না করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত দলিলের মর্ম—আমার গোপন চুক্তির বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করার জন্যই সরকার পক্ষের লিখিত প্রমাণ।

দলিলের মূল বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলি এই ধরনের :

(১) সরকার আমাদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের রায় দেখে খুব বিচলিত হয়েছেন—কারো প্রাণদণ্ড না হওয়াতে আশ্চর্য হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের ভীরুতা ও দ্বিধাগ্রস্ততার সমালোচনা করেছেন।

(২) সরকার নানাস্তরের আইনগত প্রশ্ন নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং হাইকোর্টে সরকারের পক্ষ থেকে আপীল করে দণ্ড বৃদ্ধির উপায় আছে কিনা এ্যাড্ভোকেট জেনারেলের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন।

(৩) হাইকোর্ট স্বীয় ক্ষমতা বলে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে Revisional Powers (পুনর্বিচারের অধিকার) প্রয়োগ করতে পারে কিনা এ্যাড্ভোকেট্ জেনারেলের কাছে তাও সরকার জানতে চেয়েছেন।

(৪) এই দু'টি আইনের প্রশ্ন আলোচনার পর সরকারের পক্ষ থেকে দণ্ড বৃদ্ধির আপীল করা বা হাইকোর্টের নিজস্ব ক্ষমতায় Revisional Power প্রয়োগের আইনগত কোন পথ যে নেই সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

(৫) এইরূপ সিদ্ধান্তের পরে হতাশ হয়ে সরকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে B—C—L—A—Act-এর সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে হাইকোর্টের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন।

(৬) সরকারী বিভিন্ন স্তরের আইন-সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে এও সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে যে, আপীলের অধিকার কেবলমাত্র দণ্ডিত আসামীরই আছে—ট্রাইব্যুনাল রায়ের দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করতে হাইকোর্ট পারে না। কারণ, ট্রাইব্যুনাল-বিচারে আসামীপক্ষ জুরীদের বিচারের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়।

(৮) ভারত-সরকারের Chief of Intelligence Bereau সব দিক থেকে যখন বুঝলেন যে প্রতিকারের আর কোন পথই নেই তখন অন্য কোন পথে কিছু করার উপায় উদ্ভাবনের দায়িত্ব বাংলা সরকারের উপর ন্যস্ত করলেন।

সরকারী দলিল মারফৎ এখন পর্যন্ত যা যা পেলাম তাতে আপাতদৃষ্টিতে প্রমাণ হচ্ছে আমাদের ফাঁসির হুকুম না দেওয়ার জন্য সরকারপক্ষ কখনই চুক্তিবদ্ধ হয়নি এবং তাঁদের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে আমাদের ফাঁসি না দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবার কোনো কারণই তাঁদের ছিল না।

পাঠকবর্গ এই ভেবে হয়ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন যে, আমাদের ফাঁসি দেওয়ার সরকারী চক্রান্তকে ব্যর্থ করায় রণধীরের যে অপরিহার্য ভূমিকার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার যৌক্তিকতা কোথায়? সরকারী দলিল মারফৎ বাহ্যত প্রমাণ হচ্ছে—সরকার আপীল করতে পারেন না, Revisional Power হাইকোর্টের নেই এবং আসামী পক্ষের আপীলের সুযোগ থাকলেও হাইকোর্ট সেই আপীলের ক্ষেত্রেও দণ্ড বৃদ্ধি করতে পারে না। তবু এই ক্ষেত্রে রণধীর বা অন্য কোন "দণ্ডিত আসামী" সরকারী ষড়যন্ত্র বানচাল—এইরূপ কাহিনীর অবতারণা করা আমার পক্ষে হাস্যস্কর ও অপরাধ-নয় কি? যে-দু'টি প্রশ্ন আমি নিজেই নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তুলে ধরলাম তার সদুত্তরও আমাকেই দিতে হবে। সুদীর্ঘ উত্তর না দিলেও প্রয়োজনীয় অংশটুকু প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বলার সুযোগ আমাকে দিতে হবে।

পাঠকবর্গের ধৈর্যহানি না করে আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তা বলার চেষ্টা করবো।

এ যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা! যেন এক অত্যাশ্চর্য রহস্য। গোপন প্রতিশ্রুতি বশতঃ ট্রাইব্যুনাল বিচারে সরকার আমাদের প্রাণদণ্ড না দেওয়াতে কর্তৃপক্ষ ও উচ্চপদস্থ আমলাতন্ত্র আশ্চর্য ও হতবাক হয়েছেন এবং সমস্ত করে Legislative member দের ও 'জনসাধারণ'কে বোঝাবার প্রয়াস পাচ্ছেন যে, তাঁরা দুর্বল নন—শত্রুকে মৃত্যুদণ্ড দিতে না পারলে তাঁদের শান্তি নেই।

সাম্রাজ্যবাদী সংসারের এই জঘন্য কূটনীতি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা থাকা সম্ভব নয়। দেশবরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বৃটিশ-সরকারের রাজনীতি ও কূটনীতির মুখোশ উন্মোচন করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কঠোর সমালোচনায় বাংলার আকাশ বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"India can show unbroken promises with broken records" (ভারতবাসী দেখাতে পারে ইংরেজ শাসকেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না বলে বহুবার প্রতিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই অঙ্গীকার ভঙ্গের বহু জঘন্য নজির তারা রেখে গেছেন)। বৃটিশ-সরকারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরও বিশেষভাবে বুঝতে হলে অতীতের সেই সাম্রাজ্যবাদী কূট-চক্রান্ত ভুললে চলবে না। কূটনীতিজ্ঞ সুচতুর রবার্ট ক্লাইভের রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের কথা আজ স্মরণ করুন। ধূর্ত ক্লাইভের ইঙ্গিতে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতক রণ-ভেরী বেজে উঠলো—'নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।' বীর মোহনলালের মুহুর্মুহু কামান গর্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হোল—অশ্বারোহী সৈন্য অশ্বের গতি হ্রাস করলো—পদাতিক সৈন্য সঙ্গীন হাতে নিশ্চল রইলো। পলাশী-প্রাঙ্গণের শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস এই ভাবেই রচিত হোল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার এই দুঃসহনীয় পতনের জ্বালা বুকে নিয়ে সেইদিন থেকেই বাঙালী, সুদূর ভবিষ্যতে হলেও, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের স্বপ্ন দেখেছে। সেই দিনই বাঙ্গালী ইংরেজের রাজনীতি, কূটনীতি ও সমর নীতির ভয়াবহ রূপ উপলব্ধি করেছে। ইংরেজ-শাসনের ইতিহাস এই মূল নীতি-রীতি ও গতি ধরেই দু'শ বছর চলেছে। আমাদের মন থেকে ইংরেজ শাসনের এই মূল back-ground ইংরেজ প্রীতির প্রভাবে কোনো সময়ে যদি হারিয়ে ফেলি তবে তাদের "সুমহান্" চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা কোনো মতেই বুঝতে পারবো না এইটিই হলো আমার প্রথম কথা।

দু'শ বছরের বৃটিশ শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে—নীলকর বিদ্রোহ দমনের কঠোরতা, তিতুমীরের কৃষক-অভ্যুত্থানের সেই প্রখ্যাত বাঁশের কেল্লার নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ, সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে রক্তস্নাতা ভারতভূমি, জালিয়ানওয়ালাবাদের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ভারতীয় নৌবাহিনীর নাবিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও অকথ্য অনৈসর্গিক নির্মমতায় ধমনীর রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে—বন্ধনজর্জর চিত্ত মুখর হয়ে বিদ্রোহ জানায়! ভারতবাসীর সাহায্যেই তারা এই ভারতবর্ষকে এই দীর্ঘকাল ধরে পদানত রেখেছে সাম্প্রদায়িকতার দৌর্বল্যের সুযোগে একের বিরুদ্ধে অপরকে লেলিয়ে দিয়ে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে!

চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও আমাদের অভিজ্ঞতা অতি তিক্ত। ট্রাইব্যুনালে আমাদের বিচার চলাকালীন সশস্ত্র যুব-বাহিনী সূর্য সেনের প্রত্যক্ষ সুদৃঢ় সাংগঠনিক নেতৃত্বে পরিচালিত। জেলে ও বিচারকক্ষে পুলিশ ও মিলিটারীর ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাদের সদাজাগ্রত সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে ল্যাণ্ডমাইনের সাহায্যে আদালতগৃহ ধ্বংস করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ—জেলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যের আমদানীর সংবাদ জানা সত্ত্বেও প্রায় তিন চার মাস ধরে জেলের আনাচে-কানাচে তন্ন তন্ন করে ব্যাপক তল্লাসী চালিয়েও তাঁদের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ—আদালতগৃহ সংলগ্ন মাটির নীচ দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ায় ল্যাণ্ডমাইনের বিস্ফোরণ ব্যবস্থা আবিষ্কারে মৃত্যু-বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, আমাদের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বার বেগে বেড়েই চলেছে তখন তাঁরা অতি গোবেচারা, সজ্জন ও নিতান্ত ভালোমানুষীর অভিনয় সুরু করলেন। জনসাধারণের এবং বিপ্লবী বলে সন্দেহযুক্তদের ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি কর্তৃপক্ষের ব্যবহার অতিমাত্রায় সৎ ও সৌজন্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকাদা বন্দী হলেন, চাঁদপুরে তারিণী মুখার্জীর হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণ ও কালী চক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়লো, D.S.P. আসানুল্লাকে গুলি করার অপরাধে হরিপদ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হলো, ধলঘাটের যুদ্ধে অপূর্ব সেন ও নির্মলদা প্রাণ হারালেন। এই সব ঘটনায় বিপ্লবী-বাহিনীর শক্তি ক্রমে যে পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল ঠিক সেই পরিমাণেই জনসাধারণের প্রতি পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীর অসৌজন্য প্রকাশ, দুর্ব্যবহার, অত্যাচার, নিপীড়নও ক্রমেই বেড়ে চললো।

ট্রাইব্যুনালের বিচার-পদ্ধতি প্রসঙ্গে যে-প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তার কঠোর সত্যতা ও নগ্নরূপ সর্বাপেক্ষা তুলে ধরবার জন্য যে-টুকু বলা একান্ত প্রয়োজন সেটুকুই আগে বলি।

শহর ও শহরের উপকণ্ঠে চারিদিকে পুলিশ ও মিলিটারীর সতর্ক কড়া পাহারার মধ্যে ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুত ও সেইগুলি আক্রমণাত্মক কার্যে ব্যবহার করা আমাদের সহকর্মীদের পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন ও বিস্ময়কর ছিল। তবু বিপ্লবী গেরিলা যোদ্ধারা বহুদিন ধরে এই কর্মতৎপরতা চালিয়ে নিয়েছিলেন। এই সব ল্যাণ্ডমাইল প্রস্তুত কালে একদিন দিনের বেলা "আকস্মিক ভাবে" পুলিশ আমাদের এই সাথীদের গ্রেপ্তার করে। তাদের বিচারের জন্য সরকার যথারীতি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের নাম গেজেটে ঘোষণা করলেন। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ এন সেন ডিষ্ট্রীক্ট জজ এবং পক্ষপাতিত্ব দোষশূন্য ইংরেজ সরকারের নির্বাচিত দু'জন কমিশনার—একজন খাঁন্ বাহাদুর ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ও অপরজন রায়বাহাদুর—রিটায়ার্ড জজ। সব ট্রাইব্যুনালগুলিই BCLA ACT অনুযায়ী একই আইন সূত্রে গাঁথা—বিচার-পদ্ধতি ও ক্ষমতায় সকলেই এক—কোনই তফাৎ নেই।

আমাদের ছয়জন সাথী অভিযুক্ত হয়েছে—তাদের মধ্যে অর্ধেন্দু গুহই প্রধান দোষী বলে সাব্যস্ত। অর্ধেন্দু গুহ ও অন্যান্যেরা আজও জীবিত। জেলখানা-সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি টিলার উপর রেজিস্ট্রেশান অফিস। এই অফিসেরই একটি কক্ষে ট্রাইব্যুনাল বিচারের ব্যবস্থা।

আজই প্রথম বিচার সুরু। সরকারপক্ষীয় ও অভিযুক্ত বিপ্লবী বন্ধুদের পক্ষের উকিল ব্যারিস্টারেরা আদালতে সমবেত। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অগণিত দর্শক সমাগমে আদালত কক্ষ পরিপূর্ণ—কাঠগড়ায় ছয়জন উন্নতশির অভিযুক্ত বিপ্লবী। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট ও বিচারকেরা এজলাসে এসে স্ব স্ব চেয়ারে উপবিষ্ট। প্রেসিডেণ্ট প্রত্যেক অভিযুক্ত "আসামীকে" তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগুলি পাঠ করে শোনালেন এবং জানতে চাইলেন—তারা দোষী কি নির্দোষী। প্রত্যেকেই উত্তর দিল—"দোষী"।

মুহূর্তে বিচার সমাপ্ত হলো—ইতিহাসে ট্রাইব্যুনালের বিচারের এক অপূর্ব নজির রয়ে গেল! সরকার পক্ষীয় উকিল Case open করলেন না—একটি সাক্ষীকেও ডাকলেন না—অভিযুক্ত পক্ষের কোন সরকারী সাক্ষীকেও জেরা করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও কারো দেখা গেল না—হাজার হাজার শব্দ জুড়ে দণ্ডাদেশ লেখার কোন পরিশ্রমও প্রেসিডেণ্টকে করতে হলো না!

তক্ষুণি এক শীর্ণ কাগজে অভিযুক্তদের সকলের দণ্ডাদেশ লেখা হয়ে গেল। Explosive act-এ, বিশেষ করে এই ল্যাণ্ডমাইনে যে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল আইনত তার ন্যূনতম শাস্তি—যাবজ্জীবন কারাবাস! কিন্তু "অতিমাত্রায়" সুবিচারক ও সহৃদয়" ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্ট—প্রধান দোষী অর্দ্ধেন্দু গুহকেই সর্বোচ্চ দণ্ড দিলেন—পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাস। অন্যান্য অভিযুক্তদের কাউকে দুবছর বা একবছর অথবা ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড! জাজ্‌মেণ্টের নীচে প্রেসিডেণ্ট নিজে সই করলেন এবং অপর দু'জন "অতি সজ্জন" কমিশনারও চক্ষু বুজে সেই জাজমেণ্টে নিজেদের সই দিয়ে কৃতার্থ হলেন।

অপূর্ব! অদ্ভুত! এই বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন চট্টলবাসীকে হতবাক ও হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হলো বিভিন্ন আইনজ্ঞেরা বুঝতেই পারলেন না! অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মা-বাবা আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব সকলেই অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন কমপক্ষে অন্তত পাঁচ-ছয়মাস ধরে কি করে তাঁরা ট্রাইব্যুনালের এই মামলা চালাবেন—তাঁদের সেই আর্থিক সঙ্গতি কোথায়? সবার সব ভাবনা চিন্তা চুকিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টায় এমন একটি মামলা, সরকার যার নাম দিয়েছিলেন "Dynamite Conspiracy Case", এক নিমেষেই ফুৎকারে শেষ হয়ে গেল।

এই নাটকের গূঢ় রহস্য কোথায়? আগে যে এত সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃত করলাম তার মধ্যে এই মামলার কোনো উল্লেখ নেই কেন? তা'ছাড়া দিল্লীর মহাফেজখানায়ও রহস্যময় এই 'ডিনামাইট্ মামলা' সংক্রান্ত কোনো দলিলপত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আমাদের শর্ত মেনে নিয়ে সরকার বলেছিলেন সাক্ষীদের জেরা করে করে আমরা যেন মামলার কার্যকাল বিলম্বিত না করি আমরাও তার উত্তরে বলেছিলাম—"আমরা প্রমাণ চাই যে, ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরাও নিজেদের প্রতিশ্রুতি শিরোধার্য করে সেই অনুযায়ী দণ্ডাদেশ দেবেন।" এই পরিপেক্ষিতেই সরকার Dynamite Conspiracy Case আপোষ মীমাংসার মাধ্যমেই শেষ করেছিলেন। সরকারী অফিসারেরা এবং আমি, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল মিলে একত্রে পরামর্শ করেই সাব্যস্ত করি 'ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্ত বন্ধুদের কা'র কত সাজা হবে! তারপর গণেশ, লোকনাথ ও আমি জেলখানার এক প্রকোষ্ঠে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আমাদের ছয় জন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এই মীমাংসার কথা আদ্যোপান্ত

তাদের জানাই। বিনা দ্বিধায় তাঁরা আমাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলো। এর পরেই চট্টলবাসী এবং বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণ জানলো Chittagong Dynamite Conspiracy Case-এ ট্রাইব্যুনালের অক্ষয় কীর্তির কথা!

Judiciary (বিচার-বিভাগ) ও Executive (শাসন-বিভাগ) সম্বন্ধে সরকারী দলিলপত্রে অনেক কচ্‌কচানি আছে। পৃথিবীর সমস্ত সরকারই বড গলায় প্রচার করতে চেষ্টা করেন Judiciary Executive-এর আওতায় নেই—তারা স্বাধীন। মাঝে মাঝে Judiciary Executive-এর বিরুদ্ধে হয়ত চোখ ধাঁধানো কঠোর সমালোচনা করেন বা কোনো রায় দেন সেই টুকুর সুযোগ নিয়ে Executive যদিও প্রচার করেন Judiciary স্বাধীন, তবু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি অন্তত এই ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন ছিল না। এইটিই আমার দ্বিতীয় প্রমাণ যে, "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার" ট্রাইব্যুনালও সরকারী ইচ্ছে ও উদ্দেশ্যের বাইরে কিছু করতে পারেনি। যদিও যে-সব দলিলপত্র উদ্ধৃত করেছি তা'তে দেখা যাচ্ছে executive—অর্থাৎ, যাঁরা পেছনে বসে আগাগোড়া কলকাঠি নেড়েছেন. তাঁরা, নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে Judiciary-কে অর্থাৎ আমাদের মামলায় ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের "শিখণ্ডী" খাড়া করে নিজেরা নিষ্কৃতি পেতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই দুর্বলতা ও শঠতা কাদের কাছে ধরা পড়েছে? কাদের কাছে প্রমাণ করা দরকার হয়ে পড়েছে বৃটিশ সরকার দুর্বল নয়—তাঁরা শত্রুর সঙ্গে কখনও সমঝোতা করেননি —শত্রুকে ফাঁসি দেবেন না বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হননি? এখানে আমি তাঁদেরই দলিলের ক'টি লাইন আবার উদ্ধৃত করছি যা থেকে বোঝা যাবে কোথায় তাঁদের দুর্বলতা এবং কী তাঁরা ঢাকতে চাইছেন :—

"……Their decision not to hang any one in this case in which 7 murders were committed, coupled with sentences passed recently in other terrorist cases, has made people vehement in declaring that in Bengal of to-day there is no justice, only a mass of bad law. The mass in the street blames the Govenrment and *refuses to recognise the difference between the Judiciary and Executive.* The executive has been badly hampered by the Judiciary in its dealing with terrorism for a number of years, if the deterioration in the

judiciary continues the Executive shall be emasculated. I understand that there is a steady trickle of application for proportionate pensions from the Executive officers in the province." (Emphasis mine)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের জনসাধারণ এমন কি রাস্তার লোকেরাও বিক্ষোভ প্রকাশ করে বলাবলি করছে যে, Judiciary এবং Executive এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই ("The mass in the street blames the Government and refuses to recognise any differnces between the Judiciary and Executive")—জ্বলন্ত সত্যকে জনসাধারণ কি করে অস্বীকার করবে? শ্রী পি, সি, সরকারের ম্যাজিকের মত "চট্টগ্রাম ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলা" এক নিমেষেই শেষ হয়ে গেল এবং কোন ভৌতিক জাদুমন্ত্রেই যেন "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাতে" একজনেরও মত্যুদণ্ড হোল না!

সরকারী দলিলের "ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলাটিতে উহ্য রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আমাদের মামলার ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্টকে ভীরু আখ্যা দিয়ে শাসন-বিভাগ নিষ্কৃতি লাভ করতে চেয়েছেন। তাই আইনসঙ্গত উপায়ে কিভাবে আমাদের ফাঁসি দেওয়া যায় সেইজন্যই দপ্তরে দপ্তরে এত বিভিন্ন পত্রালাপ। তখনকার ঝুঁধে পাব্লিক প্রসিকিউটার মিঃ এন. এন. ব্যানার্জি গভর্নমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। তাঁর অকাট্য সওয়াল-জবাব ট্রাইব্যুনাল উপেক্ষা করায় তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছিল। তিনি 'ডিনা-মাইট্ ষড়যন্ত্র মামলার' Magic trial-এর পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। বহু প্রখ্যাত উকিল ব্যারিস্টারের মনেও যথেষ্ট প্রশ্ন জেগেছিল। উচ্চমহলে মুখে মুখে রূপকথার মত এইরূপ 'ভৌতিক কাণ্ড' সম্বন্ধে অনেক গবেষণাই হয়েছিল। Legislative Assembly ও Legislative Council Member-দের মনেও যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল। বিলেতে পার্লামেণ্টেও Secretary of State-কে এই সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসার মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

এই দলিলে সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে উচ্চপদস্থ প্রভুদের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া ঢেকে রেখে সাফাই গাওয়া হয়েছে "man in the street"-এর নামে—জন-সাধারণের দোহাই দিয়ে। বাস্তবেও কী তাই? সারা ভারতবর্ষে তখন বৃটিশের বিরুদ্ধে "আইন-অমান্য আন্দোলন" চলেছে—সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম

মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যাঁরা সক্রিয়ভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্মুখে আসেননি তাঁরাও অন্তরে অন্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসই কামনা করেছেন। আমাদের ফাঁসি না হওয়াতে জনসাধারণ উৎফুল্ল—আনন্দিত!

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে এই গোপন দলিলে সরকারের সীমিত উদ্দেশ্য কী? সরকার-ভজা খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর ও সরকারী পদ-লেহনকারী গুটি কতক উচ্চস্তরের কর্মচারী এবং Legislative Assembly র সদস্যদের কৈফিয়ত দিয়ে কোনো প্রকারে বোঝাতে চাওয়া—আমরা (executive) ট্রাইব্যুনাল জজের প্রভাবান্বিত করতে মোটেই চেষ্টা করিনি—তাঁরা নিজেরাই তাদের দুর্বলচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। এতক্ষণ Judiciary ও executive-এর ব্যাপার নিয়ে যা' লিখলাম এবং যেভাবে "ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলা" ও "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা"র ভৌতিক পরিসমাপ্তি বর্ণিত হলো, সেই বাস্তব ঘটনাই আমার বক্তব্যের তৃতীয় প্রমাণ যে, সরকার আমাদের কাউকে ফাঁসি না দেবার গোপনচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন।

আমি তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের আহ্বান জানাচ্ছি—যেসব বাস্তব ঘটনাবলীর উল্লেখ আমি করেছি যদি ক্ষমতা থাকে তবে তাঁরা তার প্রতিবাদ করুন। আমি জানি সেই প্রবঞ্চকদের প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই। সেই সময়, কর্তৃপক্ষের এই সব নথিপত্র অবতারণার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তদানীন্তন ইংরেজ-ভক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের শান্ত রাখা ও বুঝতে দেওয়া যে, exceutive Judiciary-র সঙ্গে আতাত করেন নি—Judiciary-র জজেরাই দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন।

আমার চতুর্থ প্রমাণ—ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী খাটি ইংরেজ-সন্তান। প্রেসিডেন্ট মিঃ এ. এন. সেন ভীরু কাপুরুষ হলেও হতে পারেন! কিন্তু আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার" ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইংরেজ সরকার খুঁজে খুঁজে একজন দুর্বলচেতা ইংরেজকেই মনোনীত করেছিলেন? দু'টি বছর দিনের,পর দিন আমাদের আত্মীয়-স্বজন, উকিল-ব্যারিস্টার ও আদালতভর্তি দর্শকবৃন্দ দেখেছেন-ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ জে. ইউনী কি প্রকৃতির লোক·ছিলেন। আমরা বহু বড বড় পুলিশ অফিসার, মিলিটারী অফিসার ক্যাপ্টেন মেজরদেরও দেখেছি আবার ইউনীসাহেবকেও দেখেছি। তাঁকে দেখে মনে হোত তিনি যেন একধারে পুলিশের বড় কর্তা ও মিলিটারীর সেনাধ্যক্ষ। ইউনী

সাহেবের চারিত্রিক গঠন এমনই ছিল যে, তাঁকে দেখে আমাদের মনে হোত তাঁকে যদি বলা হয় কাউকে ধরে আনতে তবে তিনি নির্ঘাত তাকে বেঁধে আনবেন। দোর্দণ্ড প্রতাপ ইউনী সাহেব—তিনি হাতে গলা কাটবেন ও যত লোককে পারেন ফাঁসি দেবেন, কখনই পিছু হঠবেন না—এই ছিল তাঁর সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের বদ্ধমূল ধারণা।

এ হেন বৃটিশ-সিংহ মিঃ জেড ইউনী সাহেবের এ কী হোল? কোন অদৃশ্য জাদুমন্ত্রে তাঁর এই অবিশ্বাস্য রূপান্তর।

বৃটিশ-সিংহের সেই প্রতাপ কোথায় বিলীন হোল? হঠাৎ যীশুখৃষ্টের বেশে তিনি আবির্ভূত হলেন—আমাদের কারও ফাঁসি হলো না।

সরকারী দলিলপত্রে অভিযোগ পাওয়া যায়—দুর্বলচিত্ত ভীরু ইংরেজ সন্তান মিঃ জে. ইউনী আমাদের ফাঁসি না দিয়ে শাসন-বিভাগকে (executive) একেবারে ক্লীবে পরিণত করে দিলেন। তা'হলে কেন সেই ভীরু দুর্বল চেতা মিঃ জে. ইউনীকে বাংলা-সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ Judiciai secrctary-র পদে বহাল করেছিলেন? একটু বিশ্লেষণী মন হলেই এ কথার সহজ উত্তর পাওয়া যায়—মিঃ জে. ইউনী কখনই দুর্বল চেতা ছিলেন না। তিনি শাসন-বিভাগের একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধু। এই বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে Judicial secretary হওয়া যায় না। এই হোল আমার চতুর্থ প্রমাণ।

সরকারী দলিলপত্র সমালোচনায় এ পর্যন্ত যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বা ইংরেজভক্ত কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—"সত্যিই তো, সরকার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন কোথায়? বৃটিশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ঐ সব দলিলপত্র আমদানী করে উচ্চমহলের ভারতীয় কর্মচারীদের ও Legislative Assembly প্রভৃতির সদস্যদের কাছে শত্রুর সঙ্গে আপোষ মীমাংসার ব্যাপারটা ঢাকবার জন্যই তো নানাভাবে তাঁদের এই প্রচেষ্টা। নিজের সম্মান বজায় রাখবার জন্য ঐরূপ দলিল-পত্রের সমাবেশে পর্দার অন্তরালে সরকার যদি একটা অভিনয় করেও থাকেন তবে তা তাঁদের নিজেদের ব্যাপার—তা' থেকে তো প্রমাণ হয় না যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের ফাঁসি কাঠে ঝোলাবার জন্যই এই গোপনে ষড়যন্ত্র!

রাজনীতি ও কূটনীতি বড় জটিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কুটিল চক্রকে আমরা অন্ততঃ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের গোষ্ঠী বলে মেনে নিতে পারি না। যদি মনে করি কেবলমাত্র নিজেদের ঘর সামলাবার উদ্দেশ্যেই ঐসব দলিলপত্রের

আদান-প্রদান অঙ্গীকার ভঙ্গের কোনো ইচ্ছে বা জিঘাংসা তাঁদের মনে ছিল না, তবে অন্তর্নিহিত মূল বাস্তব সত্য উদ্ঘাটিত হবে না। ডিরেক্টর অব ইনটেলিজেন্স ব্যুরো—এইচ উইলিয়ামসনের গভীর অন্তঃব্যথা কোথায়? ব্যথিত মনের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ঐ দলিল তিনি লিখছেন—

"The remedey in future (there is no remedy appli cable to the 12 murdered and unavenged police men and soldiers) is to appoint judges—men who will not flinch from their duty……"প্রতিশোধপরায়ণ মনোবৃত্তির জঘন্যতম রূপটি এই দলিলের মধ্যে এক ফাঁকে প্রকাশ পেয়েছে। সরকারপক্ষীয় বারোজন নিহত ব্যক্তির জন্য সাহেবের মনে বড় ব্যথা! এই একটি লাইন লেখার আগে সাহেবের তো কই মনে পড়েনি বৃটিশ অত্যাচারে হত ভারতবাসীর সংখ্যা? তাঁর তো মনে পড়লো না পলাশী-প্রাঙ্গণে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা! মনে পড়লো না সিপাহী-বিদ্রোহী দমনে বীভৎস হত্যাকাণ্ডে ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস নরমেধ যজ্ঞে নীরিহ জনসাধারণের রক্তরঞ্জিত ভারতভূমির কথা!

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্রতিভূদের কাছে আমরা আশা করি না যে, তারা নিজেদের "কুকীর্তির অমর গাঁথা" নিজমুখে স্বীকার করবেন! বক্তব্য বৃটিশ কূটনীতিজ্ঞদের এইসব দলিলে আমরা সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছে যে, তাঁরা প্রথমে—ট্রাইব্যুনাল বিচারে আমাদের চরমদণ্ড দেবেন না বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন; দ্বিতীয়ত মৃত্যুদণ্ড না দেওয়াতে উচ্চবিভাগীয় সরকারী কর্মচারী মহলের সন্দেহভঞ্জন করা তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং সেই জন্য পর্দার আড়ালে ঘর সামলাতে ঐসব দলিলপত্র ব্যবহার করা হয়েছে; তৃতীয়, বারোজন সরকারী পুলিশ ও মিলিটারী কর্মচারী হত্যাপরাধের হাত হতে আসামীদের মুক্তি তাঁদের অসহনীয় মনে হয়েছে। এই কারণেই এ সমস্ত দলিলপত্র দেখে তাঁরা যে কেবলমাত্র ঘর সামলাবার উদ্দেশেই দলিল-গুলো ব্যবহার করছেন একথা ভাবলে ভুল হবে।

এই সমস্ত দলিলপত্রের মধ্যে "সাপও মরুক লাঠিও না ভাঙুক"—এই কূটনীতি প্রয়োগের পূর্ণ প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ট্রাইব্যুনাল আমাদের ফাঁসির হুকুম দিল না। সরকারের অঙ্গীকার রক্ষা হল! এখন যদি হাইকোর্ট নিজস্ব এক্তিয়ারে Revisional power ব্যবহার করে সাজা বাড়িয়ে দেয় তবে তাঁরা কী করতে পারেন?

আর যদি ভারত-সরকার 'বাংলা-সরকারের "চুক্তি' অস্বীকার করেন বা Secretary of state for India যদি আমাদের কাছে বাংলা সরকারের "গোপন অঙ্গীকার" মানতে রাজী না হয়ে বাংলা সরকারকে দণ্ড বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে জোর করেন, তবে এমতবস্থায় তাঁরা (বাংলা সরকার) কী করবেন? তাঁরা তো আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছেন না। এই জন্যই দলিলে হাইকোর্টে "Ownmotion-এ Revisinal power" ও সরকার পক্ষ থেকে দণ্ড বৃদ্ধির জন্য আপীলের আইন-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে এত গবেষণা। এই সম্বন্ধীয় আইন সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বের কোন অভাব দেখা যায় না। এ্যাডভোকেট জেনারেলের শেষ সিদ্ধান্তে তাঁরা যদি না জানতে পারতেন যে, B—C—L—A—Act অনুযায়ী হাইকোর্ট দণ্ড বৃদ্ধির জন্য সরকারী আপীল গ্রাহ্য করতে পারে না এবং হাইকোর্টের Revisional powerও নেই, তাহলে তাঁরা আমাদের ফাঁসির হুকুম দেওয়াবার জন্য হাইকোর্টের সাহায্য নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না।

তারা যখন সুস্পষ্টভাবে বুঝলেন যে, আমাদের ফাঁসির হুকুম দিয়ে এই পরিস্থিতির প্রতিকারের আর কোনো উপায় সরকারপক্ষের নেই, তখনও তাঁরা তাদের জিঘাংসাবৃত্তি মেটাবার পথ পরিহার করেছিলেন? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সোজা রাস্তায় যদি পারা না যায় তবে কোনো বাঁকা পথেও কি এই সমস্যার সমাধান নেই? তাদের সমস্যা—বারোজন সরকারী পুলিশ ও মিলিটারী কর্মচারীর প্রাণনাশ সত্ত্বেও এই সব হত্যাকারীদের কি বেঁচে থাকা উচিত? বৃটিশ মর্যাদা কী তাহলে চিরকালের মত ধুলায় লুটাবে না। না, তা কোনমতেই ঘটতে দেওয়া যায় না—সরকারী কর্মচারীদের মনোবল অটুট রাখতেই হবে—অপরাধিকে শাস্তি দিতে হবে—অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীদের প্রাণদণ্ড চাইই।

আইনের পথ এ ব্যাপারে কি একেবারেই রুদ্ধ? পিছনের দরজা দিয়েও কি কোনমতে হাইকোর্টের মামলা ওঠানো যায় না? দলিলের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট দুটি উক্তি এখানে দিচ্ছি। এই দু'টি উদ্ধৃতি থেকে আমাদের মামলা অন্য কোনো উপায়ে হাইকোর্টে যাতে ওঠানো যায়, সেই সরকারী চক্রান্তের স্বরূপ স্পষ্টই বোঝা যাবে। প্রথম উদ্ধৃতিতে পাচ্ছি—"…

……We may let the Bengal Government make the mext move." এই লাইনটি অত্যন্ত ছোট্ট। আগেই তাঁরা বলেছেন বারোটি হত্যার কোনো প্রতিকারই তাঁরা আর দেখতে পাচ্ছেন না। তবু প্রতিকার

খুঁজে বার করবার ভার অর্পণ করা হচ্ছে বাংলা-সরকারের উপর। যদি মনে হয় কেবল আইনের মাধ্যমে বা B—C—L—A—Act এর সংশোধনী আইনদ্বারাই বাংলা-সরকারের হাতে প্রতিকারের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, তবে এর মাত্র আংশিক অর্থই বোঝা যাবে। এই তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট একটা লাইনের ইঙ্গিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—যে-কোন প্রকারের ব্যবস্থার জন্য বাংলা সরকারকে অবাধ অধিকার দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেখছি—"… …No right of appeal or applicrtion for revision has been given to the Government, bay any law, in thc case of trial under B—C—L—A—Act, Section 3 of the B—C—L (Supplimentary) Act 1925, gives the right of appeal of a convicted person only."

এই উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বাংলা-সরকার একটা ছোট্ট ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, যে ছিদ্র-পথে প্রবেশ করতে পারলে ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এই নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার একমাত্র "দণ্ডিত আসামী" পক্ষেরই আছে। বাংলা-সরকারের হাতে এখন বৈতরণী পার করাবার ভার ন্যস্ত। সরকারের পক্ষে সোজা পথ রুদ্ধ, কাজেই বাঁকা পথে যদি কোনমতে বাংলা সরকার ফাঁদ পাততে পারেন, অর্থাৎ—আমাদের মামলার কোন একজন দণ্ডিত আসামীকে দিয়ে হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করতে পারেন, তবে সরকারের পক্ষে অতি সহজেই বাজীমাৎ করা সম্ভব।

এই দুরভিসন্ধি চরিতার্থে আমাদের কাউকে দিয়ে হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করাবার জন্য সরকার সুনিপুণ ভাবে জাল বিস্তার করেছিলেন তখন আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ অজান্তে কোনো এক অদৃশ্য হস্তের অশুভ ইঙ্গিতে আমরা যেন শত্রুর কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিলাম।

আগেই লিখেছি, আমাদের দণ্ডাদেশ হবার পরে রণধীর, সুবোধ চৌধুরী, আমার দাদা ও আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। সেই সময় রণধীরের বাবা-মা, দাদা-বৌদি প্রভৃতি সকলেই রণধীরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কলিকাতায় আসেন।

তাঁদের প্রবল ইচ্ছা ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা রণধীরের জন্য হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করেন। প্রায় একই সময়ে, আমার বাবাও মামলার রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডহ্রাস ও মুক্তির জন্য হাইকোর্টে আপীল করা

যায় কিনা তা নিয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য কলকাতায় আসেন। সেই সময়কার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রদ্ধেয় বি. সি. চ্যাটার্জি, শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু ও অন্যান্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞেরা গভীর ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছিলেন—ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে আমরা কোনমতেই যেন হাইকোর্টে আপীল না করি। তাঁদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, যদি আমরা হাইকোর্টে আপীল করি তবে সরকার সেই আপীলের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আমাদের দণ্ডাদেশ বাড়াবার চেষ্টা করবেন। এই আইনজ্ঞেরা বাংলাদেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁদের শঙ্কিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, দূরদৃষ্টি রেখে আমরা কোন মতেই যেন হাইকোর্টে আপীল না করি। তাদের মতে গুলীবিদ্ধ হিংস্র-ব্যাঘ্রের মত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে Bengal Amendment Act-এর নূতন ধারা বা একেবারে নূতন Ordinance-এর সাহায্যে সরকার যে কোনো আইন রচনা করে চরম দণ্ড দেওয়ার অধিকার হাইকোর্টের হাতে তুলে দিতে পারে। কাজেই যে পথে এত সংশয় সেই পথ তাঁদের মতে সর্বতোভাবেই পরিহার্য।

অপর দিকে রণধীরের বাবা ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জীর প্রায় সম—পর্যায়ের আর একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টারকে (এঁর নাম আমার এখন মনে নেই) নিয়ে রণধীরের জন্য আপীলের দরখাস্ত করার ব্যবস্থা করছিলেন। এই প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে মত প্রকাশ করলেন যে, হাইকোর্টে আপীল করা অনুচিত হবার কোন কারণ নেই। রণধীরের অভিভাবকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ড বৃদ্ধির অধিকার হাইকোর্টেরও নেই। কাজেই প্রখ্যাত ব্যারিস্টারদের কাছে রণধীরের মুক্তির আশ্বাস পেয়ে এবং এতে আর কারও ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কা নেই জেনে রণধীরের বাবা রণধীরের মুক্তির আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দরখাস্ত দায়ের সাব্যস্ত করলেন।

কে তখন জানতো সরকারের এই গভীর দুরভিসন্ধির কথা? কারও জানার সুযোগ ছিল না যে, সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যে কোনো উপায়ে বারোজন পুলিশ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। বারোজন পুলিশ হত্যার কোনো প্রতিকার ভারত-সরকারের হাতে নেই বলেই যে তাঁরা বাংলা-সরকারকে প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করবার অবাধ অধিকার দিচ্ছেন এ তথ্য তখন আমাদেরও অজ্ঞাত। এই অবস্থায় কোন এক

রবিবারের সকালে Legal interview দিতে জেল-অফিসে আমার ডাক পড়লো। এই Legal interview সম্বন্ধে আমি আগে কিছুই জানতাম না। তাই ভাবলাম আমার বাবা নিজে উকিল বলেই Legal interview-র জন্য দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু জেল-অফিসে গিয়ে দেখলাম শ্রদ্ধেয় এ্যাড্ভোকেট শৈলেশ বিশী আমার সঙ্গে আইন-সংক্রান্ত আলোচনা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদের মামলার argument-এর সময় দেশবরেণ্য ব্যারিস্টার বি. এন. শাসমলের জুনিয়ার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জেলে তাঁর স্বয়ংপ্রবৃত্ত উপস্থিতিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। কুশল বিনিময়ের পর তিনিই মূল বিষয়-বস্তুর অবতারণা করে জানালেন ব্যারিস্টারদের মধ্যে দুই মত হয়েছে। এক পক্ষ হাইকোর্টে আপীলের স্বপক্ষে এবং অপর পক্ষ আপীলের বিপক্ষে মত পোষণ করছেন, তাঁদের মতে, অর্থাৎ বি. এন. শাসমল ও তাঁর মতে, আমার ব্যক্তিগত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের যৌক্তিকতা আছে বলেই তাঁরা মনে করেন। তিনি জানালেন—"Test Case" হিসাবে আপনার Case-টা আমরা হাইকোর্টে তুলতে চাই। মিঃ লোম্যানকে লেখা আপনার চিঠিটিই মাত্র আপনার বিরুদ্ধে এভিডেন্স। আমাদের বিশ্বাস আপীলে আমরা আপনাকে খালাস করে আনতে পারবো···।" তাঁর কথা শুনে আমি হেসে বললাম—" যদিও আপনাদের সদিচ্ছাকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তবু, ব্যক্তিগত ভাবে আপীলের কোনো ইচ্ছা বা মোহ আমার নেই। তাছাড়া অনিশ্চয়তার মধ্যে এই নিয়ে একটা test case করে হাইকোর্টে নজীর রাখবার বিন্দুমাত্র বাসনাও আমার নেই···।"

শ্রদ্ধেয় এ্যাড্ভোকেট শৈলেশ বিশীর সঙ্গে আমার আইন-সংক্রান্ত আলোচনা এইভাবেই শেষ হোল। আমাকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ আমি তাঁকে দিইনি এবং আমার বিশ্বাস তিনি ও আমাকে ভুল বোঝেননি। আজ এই সমস্ত উদ্ঘাটিত দলিলপত্র দেখে তিনি হয়ত ভয় শঙ্কিত হয়ে উঠবেন এই ভেবে যে, তাঁর অজান্তে তিনি কী এক মারাত্মক দায়িত্বের বোঝা নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন? তাঁর সেই নিদারুণ ভুলের অপূরণীয় ক্ষতিপূরণের কোনো পথই আর থাকতো না!

আমাদের ব্যাপারে আইনজ্ঞদের দু'টি দলের বিরুদ্ধ মতের সুযোগ নিয়ে বাংলা-সরকার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁদের বিশ্বস্ত অনুচর মারফত আমাদের কাউকে দিয়ে হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করাবার জন্য

প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কী? বাংলা-সরকার এই ব্যাপারে কথই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

বিত্তশালী ধনী পরিবারের ছেলে রণধীর—বয়স মাত্র ষোল। পঁচিশ বছরের জন্য সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ডিত। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে জেলের কঠোর নিষ্পেষণে রণধীরের স্বাস্থ্য কী টিকে থাকবে? পঁচিশ বছর আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন, মা-বাবা সকলকে ছেড়ে রণধীর বাঁচবে কী করে? জেলের খাওয়া-দাওয়া ও কঠোর পরিশ্রম তার সহ্য হবে কেন? জেলের ভয়াবহ কঠোরতার চিত্র প্রতি মুহূর্তেই রণধীরের মা-বাবাকে চিন্তিত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করেছে। কেবল তাঁরাই জানেন কতখানি দুঃসহ অন্তর বেদনায় তাদের দিন-রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে। ট্রাইব্যুনালের জজসাহেব যদিও রণধীর এবং তারই বয়সের আরও দু'জনের—সুবোধ রায় ও ফকির সেনের দণ্ডাদেশের পাঁচবছর উত্তীর্ণ হবার পর সরকারের কাছে তাদের মুক্তির দরবারে Clemency দিয়ে recommend করেছেন তবু, মা-বাবার অশান্ত আকুল হৃদয় অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে কি? কে জানে সেই Clemency সরকার অনুমোদন করবেন কি না—পাঁচ বছর পরে তাদের আদৌ মুক্তি দেবেন কি না! কাজেই এই Clemency-র কথা মা-বাবার কাছে ভরসা পাবার মত কিছু নয়। তাদের কাছে সবচেয়ে বড়—রণধীর—তাঁদের ছোট্ট রণধীর তাঁদের কাছে নেই! বহু বছর—সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর—সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর তাকে তাঁদের চোখের আড়ালেই কাটাতে হবে। এই সুদীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কত ঘটনাই ঘটে যেতে পারে। সকলে সুস্থ শরীরে বেঁচে না থাকতেও পারেন—ছেলের সঙ্গে হয়ত আর দেখাই হবে না। এই সমস্ত ভাবনা চিন্তায় অধীর হয়ে উকিল ব্যারিস্টারের পরামর্শে তারা মনস্থির করলেন কাল বিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রণধীরের জন্য হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করবেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা শরৎবাবু, বি. সি. চাটার্জি প্রমুখ ব্যারিস্টারেরা অবগত হলেন এবং তাঁরা প্রমাদ গুণলেন এই অবস্থায় কী করা যায়,'—এই আপীলের ব্যবস্থা কিভাবে রোধ করা সম্ভব! একজনের জন্যও হাইকোর্টে আপীল করা হয় তবে দণ্ড বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে সরকারও পরাঙ্মুখ হবেন না। আমাদের পক্ষের উকিল—ব্যারিস্টারের পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, আমার বাবা আমার সঙ্গে Legal interview নিয়ে এই জটিল পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাকে ওয়াকিবহাল করবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেল-অফিসে বাবা আমার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা

আদ্যোপান্ত আমাকে জানালেন। আমাদের আপীল-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনজ্ঞদের দুই দলের মতদ্বৈধ আর কথা, যা আমি আগে বর্ণনা করেছি, সেই সম্বন্ধে বাবা আমার কাছে সবিশেষ ব্যক্ত করলেন। তারপর তিনি জানালেন, হাইকোর্টে আপীলের প্রার্থনা রণধীরের পক্ষে বা যে কোনো দণ্ডিত আসামীর পক্ষে তখনই করা সম্ভব যদি সেই দণ্ডিত ব্যক্তি ওকালতনামা সই করে কোনো একজন উকিলকে হাইকোর্টে আপীলের প্রার্থনা করবার, ক্ষমতা দেয়। বাবা আরও বুঝিয়ে বললেন—" দেখ, নন্দলালের (আমার দাদা) মাত্র দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। দেখতে দেখতে এই সময় কেটে যাবে। তারপর রণধীর, সুবোধ রায় ও ফকির সেনের জন্য পাঁচ বছর দণ্ডকাল অতিবাহিত হওয়ার পর জজসাহেব তাকে Clemency দিতে সুপারিশ করেছেন। এই অবস্থায় হাই কোর্টে যদি রণধীরের পক্ষে আপীল করাও হয় তবু সেই শুনানী সুরু হতেই প্রায় দু'বছর কেটে যাবে। কারণ, হাইকোর্টে আপীলের শুনানী হওয়ার আগে তোদের দু'টি বছরের মামলায় যত সাক্ষ্য প্রমাণ ট্রাইব্যুনাল—জজ্ লিপিবদ্ধ করেছেন সরকারকে সরকারী প্রেসে সে সমস্তই ছাপাতে হবে। এইগুলি বড় সময়সাপেক্ষ এবং এতে সরকারী খরচের মাত্রাও কিছু কম নয়। তারপর শুনানী—এবং শুনানীর রায়দানে আরও প্রায় পাঁচ-ছ'মাস লাগবে। ইতি মধ্যে রণধীরদের দণ্ডকালও জেলের আইন-অনুযায়ী কয়েক মাস হ্রাস পাবে। এইভাবে হিসাব করলে Clemency-র দণ্ডকাল শেষ হ'তে বছর দুয়েকের বেশী বাকিই থাকে না। এই সব দিক চিন্তা করে রণধীর আপীল করবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত তোরাই নিবি। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে দেশজুড়ে সংগ্রাম চলেছে—'গান্ধী—আরউইন প্যাক্ট' কাযকরী হয়নি, তা'তে সরকার আর কি জরুরী আইন পাশ করবে? সমস্ত প্রখ্যাত আইনজ্ঞেরা যখন এইরূপ একটা অনিশ্চয়তার কথা ভেবে কোনমতেই ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে সরকারপক্ষকে কোনোরূপ সুযোগ দিতে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছেন, তখন আমারও মনে হয় ঐরূপ বিপদের ঝুঁকি তোদের না নেওয়াই উচিত!" বাবা এইটুকু বলে সব বিবেচনার ভার আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

যতদূর মনে পড়ে বিকেলের দিকেই বাবার সঙ্গে Legal interview ছিল। জেল-অফিসেই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হতো। যাঁরা যে ইয়ার্ডে বন্দী থাকতেন সেই ইয়ার্ড থেকে সার্জেণ্ট বা হাবিলদার সাক্ষাৎপ্রার্থী রাজনৈতিক বন্দী বা বন্দীদের সঙ্গে করে নির্ধারিত সময়ে জেল অফিসে

নিয়ে যেতো এবং সাক্ষাৎকার শেষ হলেই আবার ইয়ার্ডে ফিরিয়ে আনতো।

বাবার সঙ্গে যথারীতি দেখা করে সার্জেণ্টের সঙ্গে আমার "বাসস্থান" অর্থাৎ বম্‌ইয়ার্ডে ফিরে এলাম। তখন বিকেল—বিদায়ী সূর্যের রাঙা আলোয় আকাশের বুকে হোলি চলেছে! প্রতিদিন এই সময়ে আমরা শরীর-চর্চার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। এই বম্‌ইয়ার্ডের অভ্যন্তরে প্রাচীরে ঘেরা ছোট্ট মাঠের মত একটুখানি জায়গা আছে। আমরা আসবার অনেক আগে থেকেই "স্বদেশীবাবুদের" ব্যায়াম করবার জন্য একজোড়া "প্যারালাল—বার" স্থায়ীভাবে এখানে বসানো ছিল। ব্যায়ামের উপযুক্ত জাঙ্গিয়া ও হাতকাটা গেঞ্জি পরে সাথীরা সকলে এই মাঠে শরীরচর্চায় ব্যস্ত। বাবার সঙ্গে যা গুরুত্বপূর্ণ আলাপ হয়েছে তা সাথীদের সঙ্গে আলোচনা করার চাইতেও এই সময়ের ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তাই বেশী মনে হলো। কাল বিলম্ব না করে ছুটে দোতলায় আমার নিজের সেলে গিয়ে ব্যায়ামের পোষাকে সজ্জিত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

রণধীর প্যারালালবারে balancing প্যাক্‌টিস্ করছে—তার অদ্ভুত balancing ক্ষমতা ছিল। তাঁর বিভিন্ন ধরণের balancing সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতো। আমরাই কেবল নয়, পাশের দু'তিনটি ওয়ার্ড থেকে সত্যাগ্রহ দণ্ডিত প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরাও ব্যায়ামের সময় উৎসাহ-ভরে আমাদের শরীর-চর্চা, মুষ্টিযুদ্ধ ও জাপানী কুস্তি (যুযুৎসু) প্রভৃতি উৎসাহভরে দেখতেন।

সুবোধ চৌধুরী, রণধীর ও আমি তখনও সশস্ত্র যুব বিদ্রোহের সদ্য প্রভাব কাটিয়ে মানসিক ও দৈহিক নিষ্ক্রিয়তায় এসে পৌঁছাইনি। করে—কখন আমাদের ফাঁসি হবে—কি আদৌ হবে না—সেদিকে আমাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না—পরম উৎসাহভরে আমরা নিয়মিত ব্যায়াম ও নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলের চর্চা করে যেতাম। ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ নিয়ে চট্টগ্রাম জেল হতে যখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে এসে "বাসা" বাঁধলাম তখনও প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়েছে শরীর সবল ও সুস্থ রাখতেই হবে, এই সুদীর্ঘকাল দণ্ডভোগের নিষ্পেষণ থেকে বাঁচতে হলে চাই ডন-কুস্তির তাণ্ডব উদ্দীপনা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তো স্বামীজীর সেই অগ্নিক্ষরা বাণী—দেশ আজ ঘোর তমসাচ্ছন্ন—চাই রজগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা, তাই তোদের বলি, মাছ মাংস তোরা খুব খাবি। "Marxism

Leninism"-এর বৈজ্ঞানিক বৈপ্লবিক সূত্র সম্বন্ধে তখনও আমাদের কোনো বিশেষ ধারণা বা জ্ঞান ছিল না। এই জেলে এসে প্রথমেই দেখলাম অন্যান্য দণ্ডিত রাজনৈতিক সাথীরা—তাদের রিভলভারের গুলির প্রতিধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই নিজেদের বৈপ্লবিক জীবনের সশস্ত্র কর্মধারার কথা ভুলে গিয়ে কমিউনিজম শাস্ত্রের দু'একটি বই পড়েই নিজেদের 'কমিউনিস্ট' বলে অভিহিত করছেন।

তাদের নিদর্শন দেখেই বোধহয় 'বৈজ্ঞানিক—সমাজতন্ত্রবাদ' সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই কারণেই চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হোল। অন্যান্য সাথীদের অবস্থা দেখে তাদের বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কা'র কতখানি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা' সঠিক নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার নিজের কথাটুকুই আমি বলতে পারি। তাঁরা নিজেদের 'কমিউনিস্ট' বলে যতটা জাহির করেছিলেন আমার মনে হয়েছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিজমের আড়ালে নিজেদের বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে গঙ্গাস্নান করে মুক্তি পাওয়া। আজ তাঁরা কোথায়? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ দুর্বলের জন্য নয়—সবল, বলিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ মানুষের জন্য।

জেলের এই পরিবেশে বৈপ্লবিক শক্তির বিরুদ্ধে একটি দারুণ আঘাত প্রতিঘাত হানবার জন্য মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। জেলে দেখলাম লেখাপড়ার ধুম এবং মুখে অপরিপক্ক Marxism-এর বুলি। দুর্বল ও "সত্যজ্ঞানীর" বুলিতে বাস্তবে বোধগম্য কিছু থাকে না বলেই সেই সব বুলির অর্থ তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলাম না। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ার স্রোতের গতি ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভাবলাম যে, ব্যায়াম ও শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলের চর্চা ক্রমেই বাড়িয়ে যেতে হবে।—

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রণধীরের মধ্যে যেসব বৈপ্লবিক বিশেষ-গুণ আমার চোখে ধরা পড়েছিল ও আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রণধীরের যে অপরিহার্য ভূমিকা ছিল এবারে সেই বর্ণনায় আসছি। রণধীরের সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে আগেই বলেছি। বাড়ির বন্দুকটি গোপনে হস্তগত করে ১৮ই এপ্রিল সে বৃটিশ অস্ত্রাগার দখলে অংশ গ্রহণ করেছে, ২২শে এপ্রিল জালালবাদ পাহাড়ে শহীদদের পাশে দাঁড়িয়ে অকুতোভয়ে সমানে রাইফেল চালিয়েছে। ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত বন্দী

হিসেবে সে দুটি বছর জেল হাজতে কাটিয়েছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে জেল ও পুলিশ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার কোনোরূপ আপোষ-মীমাংসার ভাব কখনও দেখা যায়নি। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু ও কড়া শাসন এক মুহূর্তের জন্যও তার বিপ্লবী মনোভাবের বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। রণধীরকে চঞ্চল বলা যায় না। বালকসুলভ চপলতার মধ্যেও তার ধৈর্য, বিবেচনা ও চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার অকৃত্রিম অধ্যবসায় লক্ষ্যণীয়। Morning shows the day!—(দিনের পূর্বাভাস প্রত্যুষেই সূচিত হয়)। রণধীর সবার মত যে কেবল ব্যায়ামচর্চায় ছিল তা' নয়—ছোট ছোট ক্রীড়া-কৌশল ও প্যারালালবারে ভারসাম্যতার কতকগুলো শারীরিক ক্ষমতা আয়ত্তে আনবার জন্য সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করে গেছে। এক নাগাড়ে বারো থেকে বিশ রাউণ্ড পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধেও সে ক্লান্ত বোধ করেনি। পুলিশ ও জেলসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডাবলিউ. ভি, হিক্স এবং আরও দু'জন অতিরিক্ত পুলিশ—সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি. জে. স্টার ও মিঃ লুইল্ প্রমুখ রাজপুরুষেরা রণধীরের ক্রিয়াকৌশলের পারদর্শিতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। এঁরা জেলে আমাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন এবং যখন-তখন জেলে Surprise visit দিতেন। আমাদের ব্যায়ামের সময়েও এই "সাহেব-প্রভুরা" মাঝে মাঝে এসে পড়তেন। রণধীর দেখতে ছোটখাটো, একমাথা কোঁকড়া চুল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তার তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি দু'টিতে বালক-সুলভ চপলতার মধ্যেও বিচক্ষণতার প্রকাশ। শান্ত সুবোধ বালক রণধীরের সুস্থ বলিষ্ঠ মাংস-পেশীগুলি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। রণধীরকে যতই সবল ও বলিষ্ঠ দেখাক না কেন তবু দীর্ঘকায় ইংরেজ রাজপুরুষ বি, জে, স্টার ও কমাণ্ডেণ্ট লুইস্ সাহেবের তুলনায় সে অতি ক্ষুদ্রকায় একটি বালকমাত্র। এই দু'জন গর্বিত ইংরেজ এই ক্ষুদ্রকায় বালকটির শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। রণধীরের শক্তি পরখ করতে এঁরা দু'জনেই তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পরাজিত হয়েছিলেন! ছোট্ট একটি বালকের হাতে পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁদের লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠলো তবু তাঁরা Sportman; হাসিমুখেই বিদায় নিলেন। রণধীরও আমার সঙ্গে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আছে। বম-ইয়ার্ডের মাঠে বিকেলে ব্যায়ামচর্চার সময়েই আমি বাবার কাছ থেকে হাইকোর্টে আপীল সম্বন্ধে সেই গুরুতর মতভেদের কথা শুনে এসেছি। সব শুনে বম্-ইয়ার্ডে ফিরে এসেও আমার মনে আইনজ্ঞদের এই মতভেদ সংক্রান্ত

সমস্যাটা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। হাইকোর্টে আপীল করলে আমাদের কারও ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে যদি রণধীর জানতে পারে তবে সে কখনই ওকালতনামা স্বাক্ষর করবে না—রণধীর সম্বন্ধে এই অভিমতই আমি পোষণ করতাম। তাই এইটি আমার কাছে তখন খুব সামান্য ব্যাপার বলেই মনে হয়েছিল। তাই ব্যায়ামচর্চা বন্ধ রেখে আপীল সম্বন্ধে অলস আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে ব্যায়ামের মাঠে যোগ দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলাম।

সূর্য অস্ত গেল। জেলের আইন অনুযায়ী আমাদের নিজ নিজ সেলে গিয়ে আটক বন্দী হতে হবে। প্রহরী ও সার্জেন্টের ইঙ্গিতে আমাদের ব্যায়াম-চর্চা বন্ধ হোল। হাত-মুখ ধুয়ে নিজের নিজের খাবারের থালা-বাটি নিয়ে সেলে আবদ্ধ হলাম। রণধীরকে জানালাম বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে বাবার কাছে যা জেনেছি আগামীকাল সকালে তাকে সব বলবো।

সকালে জেলের ঘণ্টা বাজলো। বিশেষ সময়ে ঘণ্টার নির্দেশ অনুযায়ী সেলের দরজা যথারীতি মুক্ত হলো। আমরাও হাত-মুখ ধুয়ে প্রাতকৃত্য শেষ করে চা পানে প্রস্তুত হ'লাম। রণধীরের সঙ্গে নানা কথার মধ্যে আপীল-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাটাও তাকে জানালাম। হেসে বললাম—"আমাদের ফাঁসি না দেওয়ার মহামূল্যবান চাবি কাঠিটি কিন্তু বর্তমানে তোমার হাতে। ট্রাইবুনাল-জজ্ যা পারেননি তুমি ইচ্ছে করলেই এখন তা পার—ওকালতনামায় একটা সই দিলেই গুলী-বিদ্ধ ব্যাঘ্রের মত ক্ষিপ্ত ইংরেজ-সরকারকে আর পায় কে? তক্ষুণি তারা হাইকোর্টের সাহায্যে আমাদের চরম দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।" রণধীর আমার কথা-শুনে হেসে ফেললো। তারপর দুষ্টুমি করে বললো—"তবে ফাঁসির রায়টি আমিই দেবো"—এই কথা ক'টি বলে সে এমন ভাব দেখালো যেন এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাববার বা মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই।

মা বাবা যে সেই দিনই দেখা করতে আসবেন জেল-কর্তৃপক্ষ এই খবরটি রণধীরকে আগেই জানিয়েছেন। বিকেল প্রায় চারটেয় সাক্ষাৎকারের জন্য জেল-অফিসে রণধীরের ডাক পড়লো। রণধীর যাবার আগে আমাকে জানিয়ে গেল সে ঠিক আছে, ভাববার কোনো কারণ নেই।

জেল-অফিসের একটা বড় ঘরে চার-পাঁচটি পরিবারের ছোট ছোট দল একত্রে তাদের নিজেদের দণ্ডিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতেন। সাক্ষাৎ

করবার এই বড় ঘরের এক কোণে রণধীর বসে তার বাবা, মা, দাদা ও বৌদির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। মা-বাবা ছেলের জেল-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা জানতে চাইলেন। দাদা-বৌদি তার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। রণধীর এত দূরে আছে বলে প্রতি সপ্তাহে তাঁরা দেখা করবার সুযোগ পাবেন না এবং দণ্ডাদেশ হয়ে যাবার পর তিন মাসের আগে হয়ত আর দেখাই হবে না—বলে তাঁরা নানা আক্ষেপ করছিলেন। রণধীর হাসিমুখে প্রাণপণে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জেলে সে খুব ভালো আছে—খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড, ইত্যাদি কোনো কিছুর কোনো কষ্টই নেই এবং লেখাপড়া ও ব্যায়ামচর্চারও প্রচুর সুবিধা আছে। সে আরও জানালো—ট্রাইব্যুনালের জজ্ Clemency-র জন্য recommend করেছেন; পাঁচ বছর দণ্ড ভোগের পরেই তাদের তিনজনের মুক্তি অনুমোদন করেছেন। Jail remision পেয়ে চার বছরের মধ্যেই হয়ত সে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। এই বলে মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে রণধীর বললো—"তোমরা যদি এত ব্যস্ত হও, এত অস্থির হয়ে এমন ভেঙ্গে পড তবে আমি জেলে বসে তোমাদের কথা ভেবে শান্তি পাবো না। আর যদি একবারও আমি জানতে পারি জেলের সমস্ত কঠোরতা বাধা-বিপত্তি হাসিমুখে সহ্য করার জন্য তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করছ তবে এ ক'টা দিন আমি অতি সহজেই আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারবো……!" রণধীরের কথা শুনে বাবার দীর্ঘশ্বাস পড়লো, মায়ের চোখ ছলছল করতে লাগলো। দাদা ও বৌদি মা-বাবার ব্যথা ও ভাইয়ের মনোভাব জেনে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবেন, কি বোঝাবেন—কিছুই তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না। রণধীর এই অস্বস্তিকর অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না বলে খুব বিব্রত বোধ করছিল। এ সমস্তই আমার রণধীরের মুখে শোনা। রণধীর সেই গুরুগম্ভীর পরিস্থিতিকে সহজ ও হাল্কা করতে বিভিন্ন পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলাপের গতি ফেরাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার বাবা-মা অন্য কোন প্রসঙ্গেই মন দিতে পারছিলেন না। রণধীরের বাবা একটু সামলে নিয়ে ধীরকণ্ঠে রণধীরের কাছে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন—"………আমরা ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জির সমসাময়িক প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও অন্যান্য আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছি হাইকোর্টে তোমার জন্য আপীলের দরখাস্ত করবো। তাঁদের সুনিশ্চিত অভিমত হাইকোর্টে যদি ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে তোমার আপীলের

শুনানী হয় তবে সেই সুযোগে সরকার-ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে কারও দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করার আইনগত কোনো সুযোগ পাবে না……।"

রণধীরকে তার বাবা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, রণধীরের পক্ষে যদি হাইকোর্টে আপীল করা হয় তা'তে কারও কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। তিনি পরে রণধীরকে জানালেন আগামী কাল তার সঙ্গে আবার দেখা করবার "বিশেষ অনুমতি" তাঁরা পেয়েছেন এবং আগামীকাল আসবার সময় তিনি সঙ্গে করে ওকালতনামাটি নিয়ে আসবেন, রণধীর যেন তাতে সই করে। ওকালতনামায় রণধীরের স্বাক্ষর ছাড়া কোন উকীল তার পক্ষে হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত পেশ করতে পারবে না—তাই রণধীরের স্বাক্ষরের প্রয়োজন! রণধীর বাবার সব কথা শুনে বিনীতভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বললো এ ক'টা দিনের জন্য শুধু শুধু তাঁরা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন, অযথা হাজাব হাজার টাকা খরচেরই বা কী প্রয়োজন!—আপীলের ঝামেলায় তাঁরা যেন একেবারেই না যান। নিজের মুক্তিব জন্য আপীলের চিন্তাই সে করতে পারছিল না। রণধীর যতই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন পুত্র স্নেহান্ধ পিতামাতার মন কোনো যুক্তিই মানছিল না। সাক্ষাৎকারের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। রণধীরের বাবা পরের দিন আবার দেখা করতে আসবেন জানিয়ে গেলেন।

পুলিশের অনুমতি ছাড়া জেলে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। পুলিশের "বিশেষ অনুমতি" নিয়ে রণধীরের বাবা পরের দিন আবার সপরিবারে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে উপস্থিত হলেন। পুর্বোল্লিখিত সরকাবী দলিলের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই লাইনটির কথা পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই মনে আছে—"…We may let the Bengal Government make the nesct move."—কাজেই পরের দিনই আবার দেখা করবাব 'বিশেস অনুমতি' পেতে তাঁদের কোনো কষ্টই হয়নি। রণধীরের স্বাক্ষরটি কোনমতে আদায় করবার উদ্দেশ্যে তারা অনুমতি না চাইলেও হয়ত স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেইরূপ অনুমতি দিয়ে, পারলে ওকালতনামাটাও নিজ অর্থে ক্রয় করে দিতেন।

সাক্ষাৎকারের জন্য জেল-অফিসে পরের দিন বিকেলে রণধীরের আবার ডাক পড়লো। কোনো ভাবনা চিন্তা বা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও রণধীরের মধ্যে দেখা গেল না। সে হাসতে হাসতে বলে গেল—"আবার এক জীবন্ত নাটকের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি……।" জেল-আফিসের দেখা করবার ঘরে রণধীরের

বাবা-মা, দাদা-বৌদি বসে আছেন; মা সস্নেহে রণধীরকে ডেকে কাছে বসালেন। সব কথার মাঝে তাঁদের সর্ব-প্রধান কথা ও কাজ রণধীরের জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে হবে এবং সেইজন্য তাঁরা ওকালতনামা সঙ্গে করেই এনেছেন। রণধীরের বাবা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন—"রণধীর, ওকালতনামাটা সই করে দাও!" রণধীর তার বাবার এই নির্দেশের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ না জানালেও তার হাবভাবে সে যে ঐ প্রস্তাবে কোনমতেই সম্মত নয়, এটা তার বাবা সহজেই বুঝতে পারলেন। পুত্রের ভাব-ভঙ্গী তাঁকে একেবারে নিরাশ করে তুললো। তাঁর অন্তরের ব্যথা, হৃদয়ের আবেগ তিনি আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। আকুল স্বরে কাতরভাবে অনেক কথাই বলতে চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সবটাই আধা-আধা—একটা হতে অন্যটা বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জহীন। মোট কথা যা' বোঝা যাচ্ছিল, রণধীর যেন অবাধ্য না হয়ে তাঁর কথা মেনে নেন। মা খুব ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"একটা সই করে দে বাবা! আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তোর একটুও কি দয়ামায়া হয় না? এত করে বলছি কারও কোনো অনিষ্ট হবে না, তবু কেন তুই সব করবি না?"

স্নেহাতুরা মাকে রণধীর আর কি বলবে? তবু শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনীত ভাবে বললো—"অবুঝ হোয়ো না! এত অবুঝ হলে কি চলে? আমি আমাদের সবার মঙ্গলের জন্যই ওকালতনামায় করতে চাই না। এর মূল্য আজ হয়ত বোঝা যাবে না, কিন্তু আজকের এই সই দিতে অস্বীকার করার মূল্য ভবিষ্যতে কোন দিন হয়ত যাচাই হবে!

মা বাবার সঙ্গে রণধীরের কথোপকথন যে-ভাবে বলে গেলাম এবং এই বিষয়ে আরও যে যে বর্ণনা দিয়ে যাবো তা'তে স্বভাবই মনে হবে সামান্য ঘটনাকে রং চং লাগিয়ে উপন্যাসাকারে পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি। সত্যি বলতে কি অত বছর আগেকার এই ঘটনা এবং তা' নিয়ে যে ভূমিকায় রণধীরকে অংশ নিতে হয়েছিল তার হুবহু চিত্রের প্রতিটি রেখা অবিকল রাখা কী সম্ভব? নিশ্চয়ই তা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জলন্ত মৌখিক বর্ণনা আমি রণধীরের মুখে সেদিন শুনেছিলাম তা আমার অন্তরের মণিকোঠায় আজও সযত্নে সঞ্চিত আছে। শত বছর আগে সেদিন যা ঘটেছিল এবং রণধীরের মুখে শুনে যে চিত্রটি আমার মনে দাগ কেটেছিল সেটা শত চেষ্টা সত্বেও আজ আর আমি হুবহু প্রকাশ করতে পারবো না। তাই উপন্যাস লিখছি বলে পাঠকবর্গ আমাকে ভুল বুঝবেন না—উপন্যাস

লেখার বিন্দুমাত্র বাসনাও আমার নেই। কোনো সাহিত্যিকের বলিষ্ঠ লেখনী স্পর্শে সেই যুগের সেইসব বৈচিত্র্যময় সত্য বর্ণনা উপন্যাসকে হার মানিয়ে আরও হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠ্‌তো!

ওকালতনামা স্বাক্ষর ব্যাপারে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাৎকারও ফলপ্রসূ হোল না। বিফল-মনোরম মা-বাবা ফিরে গেলেন। বিদায়কালে হৃদয়াবেগে তাঁরা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন—সবার চোখেই জলের ধারা। অশ্রুপ্লাবিত নয়নে রণধীরকে আশীর্বাদ করে মা বিদায় নিলেন।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রণধীর বম্‌-ইয়ার্ডে ফিরে এলো; ছুটে গিয়ে ব্যায়ামের পোষাকে সজ্জিত হয়ে ব্যায়ামচর্চায় যোগ দিল। করুণ নাটকের সাময়িক প্রভাবে সাময়িক ভাবে বিচলিত হলেও, ব্যায়াম-শিবিরের পরিবেশ তাকে মুহূর্তেই সহজ ও স্বাভাবিক করে তুললো।

আশ্চর্য! তৃতীয় দিন বিকেলেও আবার জেল-অফিসে রণধীরের ডাক পড়লো! কেন? সার্জেন্টের কাছে জানা গেল রণধীরের বাবা আবার "বিশেষ অনুমতি" নিয়ে সপরিবারে রণধীরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আমাদের মামলা পুনর্বিচারের জন্য যাতে হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা করা যায়—বাংলা-সরকারের ওপর তার ভার ন্যস্ত আছে। ছত্রিশ বছর আগে যে চক্রান্ত জনান্তিকে চলেছিল, এই দলিলপত্রগুলো সংগৃহীত হওয়ার পূর্বে তা কারও জানবার কোন উপায় ছিল না। রণধীরের বাবাকে বারে বারে "বিশেষ অনুমতি" দিয়ে পুলিশের অত অনুগ্রহের কারণ তখন জানতে পারিনি। ধন্য বৃটিশ সরকারের কূটনীতি! ধন্য বৃটিশ-সরকারের অনুচর পুলিশ-কর্তৃপক্ষ!

তৃতীয় দিন। জেল-অফিসে এই করুণ পারিবারিক নাটকের শেষ অঙ্ক। আজকের এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে রণধীরকে যে কঠোর দ্বন্দ্বের সমাধান করতে হয়েছিল তাতেই তার বিপ্লবী মনের গভীরতার সঠিক পরিচয় মেলে।

রণধীরের বাবা-মা বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছেন—ওকালতনামায় রণধীরের স্বাক্ষর নিয়েই ফিরবেন। রণধীরের বাবা, মা, দাদা ও বৌদি চোখের জলে বহু অনুনয় করলেন—বহু যুক্তি দেখালেন, কিন্তু তাঁদের অনুনয়-বিনয়-কাতরতা সবই ব্যর্থ হোল। রণধীর তার সংকল্পে অটল, তাঁদের অনুরোধ উপরোধ কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারলো না। তাঁদের মনে অপরিসীম ব্যথা ও কষ্ট দিতে সে বাধ্য হোল। মা আর পারলেন না—রণধীরকে আরও

কাছে টেনে নিয়ে ওকালতনামাটা সামনে রেখে তার হাতে কলম গুঁজে দিলেন এবং একটা স্বাক্ষরের জন্য চোখের জলে মিনতি জানালেন। অক্ষম অপারগ রণধীর কী করে সে স্বাক্ষর করবে? মায়ের অবুঝ মন জানতে চায় না—তিন-তিনবার রণধীরের হাতে তিনি কলম তুলে দিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে রণধীর কলম রেখে দিল। মাকে সে বললো —"মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমি পারবো না।"

মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগ্নকণ্ঠে বললেন—"বাবা, আশীর্বাদ করছি তোর মঙ্গল হোক্।" তাঁরা বিদায় নিলেন। বড়ই করুণ মর্মান্তিক সেই বিদায়ের ক্ষণ! কারোই পা যেন আর চলে না! বৌদি নিম্নস্বরে রণধীরকে বললেন—"তোদের কি দয়ামায়া কিছুই নেই……।"

বম্-ইয়ার্ডে ফেরবার পথে "তোদের কি দয়ামায়া কিছুই নেই?" বৌদির কয়টি কথা বার বার রণধীরের কাণে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ঋষি বঙ্কিমের—আনন্দমঠের লাইন ক'টি—"মহেন্দ্র ভবানন্দকে প্রশ্ন করিলেন, 'তবে কি আপনাদের কোনো মায়া নেই?' ভবানন্দ মহেন্দ্রকে উত্তর দিলেন—'যে বলে তার মায়া নেই হয় সে মিথ্যা বলে নয়তো তার মায়া কোনদিনই ছিল না। আমাদের মায়া আছে—আমরা মায়া কাটাই।"

মনে হবে অতি সামান্য কথা—একে এত বড় করে দেখার কী আছে? বিপ্লবীযুগের বালক রণধীরকে কোনো স্বার্থ ও ভীরুতা স্পর্শ করতে না পারার মধ্যেই-বা আশ্চর্য হবার কী আছে? নানা বৈচিত্র্যময় বৈপ্লবিক চরিত্র দেখেছি বলেই বালক রণধীরের এই বৈশিষ্ট্যময় দৃঢ় বিপ্লবীচরিত্র অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিবেশন করলাম।

আমরা সকলে ডাণ্ডা-বেড়ী পরে "মহারাজ" ষ্টীমারে আন্দামান যাত্রা করলাম। সুজলা, সুফলা বাংলা-মায়ের কোল ছেড়ে বহু বছরের জন্য বহু দূরে কালাপানি অভিমুখে চলেছি। ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে থেকে বাংলার উপকূল বঙ্গোপসাগরের নীল দিগন্তে মিলিয়ে গেল—সবার অন্তর ভারাক্রান্ত—বাংলামায়ের স্নেহাঞ্চল ছায়ার জন্য আকুল ক্রন্দনে হৃদয় উচ্ছ্বসিত!

দুঃখের দিনেও মনে সান্ত্বনা যে, আন্দামানে থাকলেও সকলে একসঙ্গেই থাকবো। হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে সবাই চলেছি। গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা, অভিনয় গান, গানের সঙ্গে ডাণ্ডা-বেড়ী ঠুকে তাল দেওয়া—মনে যেন কোনো খেদ

নেই, দুঃখ নেই, ভাবনা নেই, আমরা যেন কোন অভিযানে চলেছি! সব ভাবনা-চিন্তা যেন তুড়ি মেরে উঠিয়ে দিয়েছি। এই অবস্থাতেও—"কে ও? কেন একা এককোণায় বিমর্ষ হয়ে বসে আছে? তাকেও তো রণধীরের মত Clemency দেওয়া হয়েছে! তবে সে কেন এত বিষন্ন?......"সস্নেহে তাকে কাছে ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি এত বিষন্ন কেন ভাই? তোমার কি ভালো লাগছে না? আমরা সবাই যে একসঙ্গে আছি—এক-সঙ্গে থাকবো—সবাই মিলে আন্দামান জেলকে গুলজার করে তুলবো, ভাবনা কি?

উত্তর—"না। বাংলার জেল্ ছেড়ে যেতে আমার একটুও ভালো লাগছে না।" আমি—"সাথীদের সঙ্গে একত্রে যদি নরকে গিয়ে থাকারও সুযোগ পাই তাহলেও কিন্তু আমার খুব ভালো লাগবে......। মনে হচ্ছে তুমি কিছু চিন্তা করছ এবং তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছ না। আগামী কাল সকালে এই নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবো।" পরের দিন কথা হোল। নিজের দোষ-ত্রুটি ঢেকে না রেখে অকপটে সরলভাবে সে আমাকে সব খুলে বললো। দণ্ডাদেশের পরে বাংলার অন্য জেলে থাকাকালীন অম্বিকাদার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হবার প্রস্তাব জানিয়ে পত্রযোগে সে পুলিশ-অফিসারকে ডেকে পাঠায়। পুলিশ অফিসার তার কাছ থেকে এইরূপ সহযোগিতার প্রস্তাব পেয়েও তা' প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনালের বিচারের পরিসমাপ্তি যে-ভাবে ঘটেছে—তাতে অম্বিকাদার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর কোন মূল্য আর আদালতে বিবেচিত হবে না। এই স্বীকারোক্তির পরে সে তার মনের কথাও জানালো—তার ইচ্ছা ছিল অম্বিকাদার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হবে এই অজুহাতে সরকারকে বিভ্রান্ত করে সরকারের সাহায্যেই সে বিলেতে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে ও সেখানে গিয়ে Secretary of state for India-মিঃ স্যামুয়েল হোড়কে হত্যা করবে।

তার মুখে এই সব কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু সাহসের সঙ্গে অকপটে নিজের দুর্বলতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার নগ্নরূপ বিশ্লেষণ করে বিনা দ্বিধায় সে আমার কাছে সমস্ত স্বীকার করেছে দেখে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক খানি বেড়ে গেল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলেই বালক রণধীরের প্রকৃত মূল্যায়ন করা যাবে। রণধীরের প্রাচুর্যের অভাব ছিল না—

সাংসারিক বহুবিধ আকর্ষণের উপকরণও বিদ্যমান ছিল। বৈপ্লবিক দৃঢ়তাও চরম স্বার্থত্যাগের প্রবল ইচ্ছাই প্রকৃত বিপ্লবীকে দুর্বলতা জয়ে সাহায্য করে ও চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত এই সমস্ত দরকারী গোপন দলিলপত্র ঘটনাচক্রে হস্তগত হওয়াতে মনে হলো—ঐতিহাসিক দায়িত্ব পূর্ণ করতে হলে এই সকল দলিল অপ্রকাশিত রাখার কোন অধিকার আমার নেই।

এই সমস্ত দলিল প্রকাশে আমার পূর্ব বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে কারো মনে যেন কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ না থাকে ও বিশেষ বিশেষ সমালোচকেরা যাতে নানাভাবে নানা অর্থ করবার সুযোগ না নেন তার জন্য যথাসম্ভব পর্যালোচনামূলক উত্তর দিলাম। এই সমালোচনামূলক অবস্থায় কোন সময়ে পড়তে হয়েছে বলেই পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এই সরকারী চক্রান্তের মূলোৎঘাটনে প্রয়াসী হলাম।

আলিপুরের নতুন সেন্ট্রাল জেলে দিন কাটছে। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট অনুযায়ী আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত। ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গান্ধীজী ইংলণ্ডে গেলেন। অহেতুক কালহরণ করেও কেবলমাত্র ব্যর্থতা নিয়ে তিনমাস পরে ভগ্নহৃদয়ে ভারতে ফিরে এলেন—গান্ধী-আরউইন অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটলো। এ সময়ে দমননীতির তাণ্ডব অবাধে অবিচ্ছিন্নভাবে চালাবার জন্য বৃটিশ-সরকার বদ্ধপরিকর—তাই ভারতের মসনদে লর্ড আরউইনের পরিবর্তে উইলিংডন ও বাংলার ছোট লাটের মসনদে, আপোস-মীমাংসাকারী স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসনের পরিবর্তে কুখ্যাত জন এণ্ডারসনের আবির্ভাব ঘটলো। লর্ড উইলিংডনের কূটনীতির প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় অকংগ্রেসী ও সরকারভজা অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হলো। সরকারের এই কূটনীতি ও কৌশলের বিরুদ্ধে ১৯৩২-এর জানুয়ারিতে গান্ধীজী, আইন অমান্য আন্দোলনে আবার ভারতবাসীকে ডাক দিলেন—সরকার ও এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন! ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হলো—নেতৃস্থানীয়েরা প্রায় সকলেই বন্দী—১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজীও কারারুদ্ধ হলেন। দিকে দিকে আইন অমান্য-আন্দোলনের অভিযান ও বৃটিশ-সরকারের নিদারুণ দমননীতির বীভৎস তাণ্ডব ভারতের আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করে তুললো।

শান্তিপ্রিয় জনগণের আইন-অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশ-সরকারের এই অবাধ পৈশাচিক হিংস্র আক্রমণ বাংলা ও তথা ভারতের বিপ্লবীরা মুখ বুজে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাংলাদেশে 'সন্ত্রাসবাদ' দমন করার জন্য বাংলা-সরকার ORDINANCE (জরুরী বিধি) এবং একটার পর একটা নিরাপত্তা আইন জারী করে চললেন। এইরূপ Ordinance ও নিরাপত্তা আইনের ইতিহাস বহু লেখার মধ্যেই পাওয়া যাবে। এখানে সামান্য একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

"B. C. L. A. act of 1925 which was put into force only for five years expired on 21-3-30. Only a minor portion of it retainad. This deprived the police of their powers of arrest and detention and Government had to restore these powers to them by spceial ordinance immediately after 'the armoury raid in July 1930, the life of the Bengal Criminal Law Amendment Act of 1925 was extended by another five years but on 16-10-30 members of Bengal Legislative Council agreed to make the raw a permanent one and B. C. L. A. act of 1930 became a law.

('A brief history of terrorism' a true extract from the police document. preserved in Bengal police abstract of intelligence 1926 VOL. XXXIX

(এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বাংলা সরকার ও পুলিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিলেন না বলে—বিপ্লবীদের যখন তখন বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক রাখার জন্য ১৯২৫ সালের B. C. L. A. Act কে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে পুলিশকে আরও অনেক ক্ষমতা দেওয়া হল। সেই একই ডকুমেণ্ট পাওয়া যাচ্ছে :—"The Chittagong Armoury Raid was followed by the under mentioned series of outrages which reveal how far the terrorist conspiracy had extended."

পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর যেরূপ ধারাবাহিক ভাবে "সন্ত্রাসবাদীদের" আক্রমণ চলেছিল তাতে বোঝা যায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ কত ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছিল।

তারপর সেই একই ডকুমেন্টে ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনা—২৫-৮-৩০শে ডালহৌসী স্কোয়ারে Sir Charls Tegartকে হত্যার চেষ্টায় দীনেশ মজুমদার ধৃত, হাতবোমার স্বয়ংক্রিয়াতে অনুজা সেনের মৃত্যু, ২৮-৮-৩০শে জোড়াবাগান পুলিশ থানাতে বোমা নিক্ষিপ্ত, তার একদিন পরেই ইডেনগার্ডেন পুলিশ আউট পোস্টে পুলিশেরা বোমার আঘাতে আহত, এই ঘটনার দু'দিন পরেই ঢাকাতে বিপ্লবী বিনয় বোসের গুলীতে পুলিশ সাহেব মিঃ হাড্‌সন গুরুতর আহত, ও পুলিশ ইনস্‌পেক্‌টার জেনারেল মিঃ লোম্যাস নিহত। দীনেশ, বিনয় ও বাদলের অবিস্মরণীয় রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। বাংলার মেয়ে শান্তি সুনীতির গুলীতে কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ ষ্টিভেন্সের মৃত্যু মেদিনীপুরের জেলাশাসক মিঃ পেডী, মিঃ ডগলাস ও মিঃ বার্জ প্রমুখ সাহেবদের ও নিজের রক্ত দিয়ে ভারতবাসীর "রক্তঋণ" পরিশোধের ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে।

এইরূপ আরো অসংখ্য শৌর্যবীর্য দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ঘটনাবলীর স্বাধীনতার বীর সৈনিক বিপ্লবীদের মহান চরিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়। কারণ প্রতিমুহূর্তেই আমার আশঙ্কা—সেইরূপ অনধিকার চর্চায়—প্রত্যক্ষ ও অতি নিকট পরোক্ষ জ্ঞানের অভাব বশতঃ আমার লেখার বাস্তবতার গণ্ডী অতিক্রম করে তাঁদের ছোট করে দেখাবার সম্ভবনা থাকতে পারে।

আমাদের ট্রাইব্যুনালের বিচার সমাপ্ত। চট্টল-সূর্য মহানায়ক সূর্য সেন পুলিশ ও মিলিটারীর নিশ্ছিদ্র বেড়াজাল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ইতিহাসের পর ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর লেফটেনেন্টস্‌—লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, নির্মল সেন প্রমুখ কেউই উপস্থিত নেই—ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার তাঁরই বলিষ্ঠস্কন্ধে ন্যস্ত। এই সময়ে তারকেশ্বর দস্তিদারই তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

সেই যুগে সেই অবস্থায় বিভিন্নস্তরের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মাস্টারদাকে "রণনীতি" ও সশস্ত্র আক্রমণ কৌশল পরিবর্তন ও প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

(১) ১৯৩০ শেষ ১৮ই এপ্রিলের আগে যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব চলাকালে মাস্টারদা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজে প্রতিভূদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও দৃষ্টিই তাঁর এই মনোভাবের একমাত্র কারণ। এই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে

প্রচণ্ড দলাদলি এবং অনুশীলন ও যুগান্তরের মধ্যে তীব্র মনকষাকষি, ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ছোটখাটো মারামারি লেগেই ছিল। এইরূপ রাজনৈতিক বিবাদের প্রভাবে আমাদের তরুণ সাথী সুখেন্দু দত্ত গোপন ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারায়। তীব্রপ্রতিদ্বন্দ্বীতা ও এই নিষ্ঠুর হত্যায় দলের বিপ্লবী সাথীদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে গেল—কিন্তু মাস্টারদা শেষ পর্যন্ত নিজেকে স্থির ও অবিচল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে ঝটিকা বেগে চট্টগ্রাম শহর দখল করে নিয়ে সাময়িক বৈপ্লবিক সরকার ঘোষণা করার পরিকল্পনা দ্রুত সমাপ্তির পথে চলেছে—কোনরূপ হঠকারিতার জন্য তার উপর কোন বাধা বা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হোক মাস্টারদা তা কোনমতেই ঘটতে দিতে রাজি ছিলেন না। তাই তাঁর কঠোর নির্দেশ 'যখন আমরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মূল বস্তুকে লক্ষ্য করে প্রস্তুতির দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছি তখন কোনমতে—কোন কারণেই আমাদের যুবক সৈনিকেরা সাময়িক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত হয়ে সংগঠনের মূলে যেন আঘাত না হানে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।'

এই যুক্তিপূর্ণ অভ্রান্ত নির্দেশে তোমাদের সবাইকে ও সাময়িক উত্তেজনা দমন করতে হয়েছিল। কৃতকার্যতার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখার—বিপ্লবী নেতৃত্বের এই নির্ভুল শিক্ষাকে অস্বীকার করা কোন যুগের বা কোন স্তরের বিপ্লবীদের পক্ষেই সম্ভব নয়।

(২) দ্বিতীয় স্তরে যুগপৎ আক্রমণে চট্টগ্রামশহর অধিকৃত হলো। এর চারদিন পরে মাস্টারদার নেতৃত্বে জালালাবাদের ঐতিহাসিক সংঘর্ষে বিপ্লবী বাংলার মরণজয়ী সৈনিকেরা বিশিষ্ট বৃটিশ সামরিক অফিসার কর্নেল ডালাস স্মিথ পরিচালিত বিরাট মিলিটারী সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসরণে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগে বাধ্য করে।

(৩) বিপ্লবীদের এই বিজয়ের পর ইংরেজ-শাসকশ্রেণী অনাগত বিপ্লবের পূর্বাভাষে মরিয়া হয়ে প্রবল সামরিক শক্তি নিয়ে চট্টগ্রাম শহর ও গ্রামাঞ্চল ছেয়ে ফেললেন। মাস্টারদাও তখন নতুন বৈপ্লবিক রণ-কৌশল অনুসরণ করলেন। এই পর্যায়ে শত্রু অনেক বেশি শক্তিশালী। যুব-বিদ্রোহের প্রথম আক্রমণ সাময়িক ভাবে স্তিমিত—ছোট ছোটদলে বিভক্ত হয়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। শত্রুর আক্রমণ চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য যেখানে সম্ভব আত্ম-রক্ষার্থে খণ্ডযুদ্ধ করে যাবো এই নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই রণ-কৌশলের বাস্তব ইতিহাস রচিত হয়েছে—ফেণী স্টেশনের খণ্ডযুদ্ধে, ফিরিঙ্গী

বাজারে শহীদ অমরেন্দ্র নন্দীর আত্মদানে, কালারপোলস মরণপাগল চারজন শহীদের অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত সংগ্রামে, চন্দননগরে নিশীথরাতে স্যার চার্লস টেগার্টের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের রিভলভার যুদ্ধে আর ধলঘাট রণপ্রাঙ্গণে শহীদ নির্মলদা ও অপূর্ব সেনের অব্যর্থ নিশানায় ক্যাপটেন কোমারণের শোণিত প্রবাহে।

(৪) আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ক্ষমতা ক্রমে আরও কমে এলো। কাজেই উপরে বর্ণিত খণ্ডযুদ্ধের বাস্তব অবস্থারও পরিবর্তন ঘটলো। মহানায়ক সূর্য সেন রক্তঝরা সংগ্রামের গতি অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যে ধীর শান্তভাবে সুচিন্তিত রণকৌশল গ্রহণ করলেন। চট্টগ্রাম যুব-বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলেন—'শত্রু প্রবল—যুব-বিদ্রোহের পর ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াতে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হতে আমরা বাধ্য হয়েছি—প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সেই শক্তিও আজ আমাদের বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে—তাই আবার বড় পরিকল্পনা নিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে শত্রুকে আঘাত হানবার দায়িত্ব আমাদের সংগঠনের উপর এসে পড়েছে। তার জন্য প্রস্তুতির সময় চাই—এই সময় আমাদের নিতেই হবে। একবার যখন আক্রমণ সুরু করা হয়েছে এই সীমিত অবস্থায় ও তার গতি অব্যাহত রাখার জন্য মাঝে মাঝে সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজ রাজপুরুষদের উপরে সময়োপযোগী ছোটখাটো ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাইতেই হবে। বড় বড় সামরিক অভিযানের মাঝখানে যেমন স্কাউটিং অভিযান করতে হয়, ঠিক তেমনই বৈপ্লবিক মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আমাদেরও স্কাউটিং অপারেশন চালাতে হবে।'

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মহাবিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে এই রণকৌশলের পরিণাম—চাঁদপুরে রামকৃষ্ণ ও কালী চক্রবর্তীর পিস্তলের গুলিতে শত্রুর শোণিত প্রবাহ, বালক হরিপদ ভট্টাচার্যের অব্যর্থ নিশানায় খান বাহাদুর আসানুল্লার জীবনাবসান, তারকেশ্বরের রিভলবারের মুখে শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের চিরজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ।

(৫) মাস্টারদার পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিতভাবে জেল ভাঙ্গার ও বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রচণ্ড তাণ্ডবে চট্টগ্রামে ইংরেজ-শাসনকে দারুণ আঘাতে আবার নিশ্চল করে ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ হলো।

(৬) বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রয়োগে মাস্টারদা নতুন ধরনের যে "রণনীতি" ও কৌশল গ্রহণ করেছিলেন তা ফলপ্রসূ হলো না। আমাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল, অম্বিকাদা পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে বিচারের অপেক্ষায়

জেল হাজতে দিন কাটাচ্ছেন, ধলঘাট রণপ্রাঙ্গণে নির্মলদা শহীদেরগৌরবময় মৃত্যুবরণ করেছেন—একের পর এক অন্যান্য নেতারা প্রায় সকলেই বন্দী—সংগ্রামী জীবনের শ্রেষ্ঠবন্ধু নির্মলদাই তখন মাস্টারদার পাশে একমাত্র পুরাতন সাথী—তিনিও চলে গেলেন—মাস্টারদা সম্পূর্ণ একা—তবু তরুণ ভাইদের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে ভবিষ্যতের বিপ্লবী সৌধনির্মাণে দৃঢ়পদে কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ বিসর্পিত বন্ধুর পথে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর চোখের সামনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বীভৎস চেহারা—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ও' ডায়ার—বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠীর আরও অসংখ্য অকথ্য নির্যাতনের নির্মম রক্তরাঙা ছবি।

Indian Republic Army Chittagong, Branch সেইজন্যই তাঁদের ইস্তাহারে ছাপিয়েছিলেন—"It remembers today with sorrowful indignation the inhuman massacre of the Indian people perpetrated by the British Government on the Indian soil, the blowing up of woman-folk in the mouth of the guns, the indiscriminate hangings and cold-blooded murders of her manhood, the crushing of her infants under the cruel British boots·········"

এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার মধ্যে কোনপ্রকার আপোষ-মীমাংসার স্থান ছিল না। তাই যুব-বিদ্রোহের কর্মসূচীতে সেইরাত্রেই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অনুচরদের বুকের রক্তে প্রতিশোধ নেওয়ারও প্রোগ্রাম ছিলো। গুড-ফ্রাইডে উপলক্ষে ছুটির জন্য সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয়নি। যুব-বিদ্রোহের বৈপ্লবিক কর্মসূচীর এই একটি প্রধান অংশ কার্যে পরিণত হবে না—মাস্টারদা কখনও তা ঘটতে দেবেন না। তাই পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ইংরেজ অত্যাচারের রূপ তখন অবর্ণনীয়। উত্তরোত্তর পুলিশ ও মিলিটারীর তাণ্ডব বেড়েই চলেছে। শহরের প্রতিটি অলিগলি, স্কুল-কলেজ প্রাঙ্গণ সর্বত্রই সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত। মিলিটারী ও পুলিশ রচিত—এই পর্বতপ্রমাণ বাধা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির অগোচরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই মহান নেতার নেতৃত্বে ক্লাব-হাউস আক্রমণের পরিকল্পনা সফলতার মুখে এগিয়ে চললো।

এই পরিকল্পনা যতক্ষণ কার্যে পরিণত না হচ্ছে বিপ্লবী শক্তির নিষ্ক্রিয়তায় বিপ্লবীদের মনোবল নষ্ট হবার আশঙ্কায় মাস্টারদা ইংরেজ-পুরুষদের প্রাণ হরণের ভার দিয়ে তরুণ বিপ্লবীদের কাউকে কাউকে ঢাকায় ও কুমিল্লায় প্রেরণ করলেন। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নোকে আক্রমণের কাহিনী আগেই বর্ণিত হয়েছে। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সাহেবকে হত্যা করার ভার নিলেন এক তরুণ বিপ্লবী। মাস্টারদার কাছে মরণপণ শপথ নিয়ে এই নির্ভীক তরুণ কুমিল্লা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কে এই তরুণ ?

মৃত্যুভয়হীন, উন্নতশির, দুর্জয় তরুণ দৃপ্ত উদ্ভাসিত চক্ষুতে অচঞ্চল স্বচ্ছ দৃষ্টি, পদক্ষেপে পথে চলেছেন। মনে অটুট সংকল্প, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আকাশচুম্বী দম্ভ মিনার, আঘাতে আঘাতে ধুলায় মিশিয়ে দিতে হবে—সমস্ত বাধা পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যেতে হবে।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর নামকরা মেধাবী ছাত্র। স্বাধীনতা-সংগ্রামের আহ্বানে চরম আত্মত্যাগের সংকল্পে ঘর ছেড়ে কুমিল্লা সহরে আজ তার পদার্পণ।

কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ ষ্টিভেন্স কুমারী শান্তি সুনীতির গুলীতে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। একটার পর একটা আঘাতে আঘাতে বৃটিশ সরকার ক্রমশই হিংস্র হতে হিংস্রতর হয়ে উঠেছেন—শুরু হয়েছে নিরপরাধ দেশবাসীর উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন।

প্রতিকারকল্পে সীমিত শক্তি নিয়েই বিপ্লবী তরুণ দল দুর্বার বেগে বৈশাখী ঝড়ের মতো এগিয়ে এলেন—রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন—বৃটিশ শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের উপর প্রচণ্ড অঘাত হানতে হবে—কার্যোদ্ধার না করে কোন ক্ষেত্রেই আমরা ফিরবো না।

কুমিল্লার পুলিশ সাহেবকে এই অত্যাচারের জবাব দিতে হবে—বিপ্লবীদের আদালতে তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ-প্রীতিসুলভ মন নিয়ে কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন—সরকারের সঙ্গে শর্ত বিনিময় হয়েছিল—সরকার আপনাদের চরমদণ্ড দেবেন না—আপনারাও প্রতিশ্রুত ছিলেন রাজনৈতিক হত্যা ও বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ পরিহার করবেন। তবে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মিঃ এলিসনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করতে মাস্টারদা কি একটুও কুণ্ঠাবোধ করলেন না ?

মাস্টারদার সুস্থির ও বিশেষ বিবেচিত মত নিয়েই আমরা সব সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আক্রমণাত্মক কার্যসূচী স্থগিত রাখবো।

আমাদের প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীরা সকলেই অস্ত্র সংবরণ করবে এইরূপ অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিতে মাস্টারদা আমাদের কখনই বলতে পারেন না—আমরাও ঐরূপ অবাস্তব ও মিথ্যা অঙ্গীকারে কোনমতেই আবদ্ধ হতে পারি না!

ভারতের বিপ্লবীরা সকলে একই কেন্দ্রীয় পার্টির অন্তর্গত ছিল না। কাজেই সবার পক্ষে ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথা উঠতেই পারে না—বিপ্লবীরা তা কেনই বা মানবেন আর আমরাও বা তা চাইব কেন? তাই মিঃ এলিসনকে মৃত্যুদণ্ড দেবার মধ্যে মাস্টারদার কুণ্ঠাবোধের কোন কারণ ছিল না। জেলের ভিতরে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করবার জন্য প্রতিশ্রুত থাকলেও, জেলের বাইরে বিপ্লবীদের আক্রমণাত্মক কর্মসূচীর অগ্রগতিকে আমরা বারবার আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছি।

সাময়িক ব্যর্থতা বিপ্লবের কঠিন কঠোর রক্তাক্ত পথ হতে মাস্টারদাকে বিচ্যুত করতে পারে নি। বৈপ্লবিক কর্মধারা শুধু একটিমাত্র জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এখানে ওখানে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশে নতুন নতুন দায়িত্বভার দিয়ে দুঃসাহসী তরুণদের তিনি জেলার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। বিপ্লবী সাথীরা কেউ কেউ ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালিতে নিরাপদ আশ্রয় ও কর্মস্থল বেছে নিলেন।

আমাদের—গণেশ, লোকনাথ, মাখন, আনন্দ ও আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হ'ল। সমস্ত দুর্যোগ বিপদ ও প্রতি মুহূর্তেই ধরা পড়বার আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে মাস্টারদা ও নির্মলদা চট্টগ্রামেই নিজেদের কর্মক্ষেত্রে স্থির রইলেন।

কালের পরিবর্তনে ও যুগের গতিতে মাস্টারদার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী সমৃদ্ধি-শালী হয়েছে। যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের পথপ্রদর্শক, যাঁদের আদর্শ নিয়ে মাস্টারদা ও আমরা আগামী দিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিলাম তাঁদের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ না করে বা কোনরূপ অশ্রদ্ধার মনোভাব না রেখে অতীতযুগের কথা আমাদের ভাবতে হবে। গৌরবোজ্জ্বল চিত্র-শোভিত অতীত জীবন-কাহিনীর মূল্যায়ন করতে যেমন আমরা কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করবো না, ঠিক তেমনিই জীবনের বৈপ্লবিক দুর্বলতা বা বিচ্যুতির পাতাগুলি সযত্নে অন্ধকারে ঢেকে রেখে ভবিষ্যতের সার্বিক মূল

শিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়ার বা বঞ্চিত করবার চেষ্টাও না করাই ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে এসে আমরা কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়েছি স্কুল-কলেজের পড়াশুনা নিয়ে, কেউ-বা সংসার নিয়ে, কেউ-বা নিরাপত্তার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়েছি—পুলিশের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে—বর্মাদেশের সুদূর প্রান্তরে—লোকালয়-বিহীন গ্রামাঞ্চলে।

তরুণ সাথীদের বৈপ্লবিক চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তনে মাস্টারদার মন আলোড়িত হয়ে উঠলো। অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তাঁর মনে প্রশ্ন জাগালো—বছরের পর বছর দেশ-দেশান্তরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা বিপ্লবী নায়কদের কি একান্তই প্রয়োজন ছিল? সেই যুগে 'বিপ্লব' পরিচালনার জন্য মাতৃভূমি ছেড়ে কারো রুশদেশে, কারো জাপানে, কারো-বা মার্কিন দেশে চলে যাওয়া কি নেতৃবৃন্দের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল?

মহানায়ক সূর্য সেন নতুন ও পুরাতনের বৈপ্লবিক চরিত্রের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আ:পা.ীন রক্তাক্ত সংগ্রামের নিভীক সেনাপতি। তিনি জানতেন তাঁর 'আদেশ', 'সমর্থন' ও পরিচালনায়' রাজনৈতিক হত্যা আক্রমণাত্মক প্রতিটি কার্যকলাপের জন্য সরকারের নিকট তাঁর অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে—এবং ই.রেজ-কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান হারে তাঁর মস্তকের মূল্য ধার্য করেছেন। তবু সূর্য সেন সৈন্য বেষ্টিত চট্টলভূমিতে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। মৃত্যুভয় তাঁকে ভীত করতে পারলো না। নিজেব বৈপ্লবিক হেড্-কোয়ারটার পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার যৌক্তিকতাও তিনি খুঁজে পেলেন না। তিনি বুঝেছিলেন বিদেশে গিয়ে বা ভারতের দূরে প্রদেশে আত্মগোপন করে ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার নেতৃত্বের দায়িত্বভার বহন করা সম্ভব নয়। সত্যিকারের বৈপ্লবিক দায়িত্ব বহনকারী সুযোগ্য অধিনায়কের স্থান সৈনিকদেব পাশেই। দূর দেশে থাকা বা হেড্‌কোয়ার্টার ত্যাগ করে সৈন্যদল পরিচালনা করার অবাস্তব পরিকল্পনায় সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করার দায়িত্ব বহুলাংশে নেতার উপরেই অর্শায়। এই অভিজ্ঞানের মধ্যেই সূর্য সেনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

জালালাবাদ যুদ্ধের রক্ত বিভীষিকায় সূর্য সেন বোমা রিভলবার ত্যাগ করলেন না। হেড্‌কোয়ার্টার ছাড়লেন না—৺াড়লেন না অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁরই তৈয়ারী বিপ্লবী সৈনিকদলের সঙ্গ—পরিবর্তে দিয়ে গেলেন একটার পর একটা আক্রমণের নির্দেশ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে নিজের মনে ভাবতে হবে আমরা কে কোথায়! "সেই জেলার সংগঠনের দায়িত্ব নিগেছিলাম"— কেবল এইটুকু বলেই নিস্তার পাওয়া চলবে না। আরো বলতে হবে— 'আমি সেই দায়িত্ব বহন করে—সেই সেই স্থানে সেই জেলায় বা নগরে কতখানি কী করেছি।' কোথায় নিজের দুর্বলতা তা জনসমাজে বা তরুণদের কাছে ধরে দিলে আমরা কেউ ছোট হবো না, তরুণেরা যদি কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দের সাহস বিক্রম ও স্বার্থত্যাগের জয়গানই শুনে থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে আদর্শ বিপ্লবীদের প্রণাম জানাবে সত্য—কিন্তু বৈপ্লবিক দুর্বলতার দিকটা উপেক্ষিত হলে বাস্তব শিক্ষার মূলে নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করা হবে।

মাস্টারদা সম্বন্ধে আজ যা লিখলাম তা না লিখলে তাঁর মহানায়কের ভূমিকার মূল বৈশিষ্ট্য আমাদের অজানা থাকবে। সীমিত গণ্ডীতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে রক্তঝরা স্বাধীনতা সংগ্রামের যে দায়িত্ব মাস্টারদা নিয়ে দিলেন তা তিনি নির্ভীক অন্তরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

যুবক-সংগঠকেরা যদি মনে করেন অ্যাকৃশনে নিজে অংশ গ্রহণ না করে তাঁরাও মাস্টারদার মত ছোটদের নির্দেশ দিয়েছেন—তবে তাঁদের পক্ষে সেটা অনধিকার চর্চা হবে। কারণ নাগারখানা যুদ্ধে, পুলিশ লাইন দখলে, জালালাবাদ রণাঙ্গনে, ধলঘাট, গৈরলা প্রভৃতি একটার পর একটা সংঘর্ষে মাস্টারদা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র পাড়ি না দিয়ে সৈন্যবেষ্টনীতে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে অ্যাকৃশনের নির্দেশ দেওয়া আর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করে অল্পবয়স্ক যুবক নেতার পক্ষে অন্যদের নির্দেশ দিয়ে অ্যাকশনে পাঠানোর মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। তাছাড়া সুদীর্ঘকাল ধরে অন্য জেলায় বসে থেকে আমরা কে ক'টি অ্যাকৃশান করেছি তাও চিন্তা করে দেখবার বিষয়।

তাই যাঁরা প্রত্যক্ষ অ্যাকৃশনে অংশগ্রহণ করেছেন আমার চোখে বিপ্লবী-প্রাধান্য তাঁদেরই। মাস্টারদার নির্দেশ পালনে কুমিল্লার পথে সেই তরুণ বিপ্লবী তাই আজ আমার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছেন!—মিঃ এলিসন তোমার নিস্তার নেই!

আদালত-বাড়ির কম্পাউণ্ডে জেলা-পুলিশ দপ্তরের অফিস। মিঃ এলিসন নিয়মিত সাইকেলে চেপে অফিসে আসা-যাওয়া করতেন।

এডিশন্যাল জেলা-পুলিশ সাহেবের সত্যই কি মোটরগাড়ি ছিল না, নাকি 'উৎকোচ বা ঘুষ ইত্যাদি আমি বরদাস্ত করি না'—এই প্রচারের প্রয়োজনে তিনি সাইকেল ব্যবহার করতেন তা আমি বলতে পারি না। বাস্তবে তিনি সাইকেলে চেপেই অফিসে আসতেন ও বাড়ি ফিরতেন। তাঁর পিছনে আর একটি সাইকেলে তাঁর আর্দালী থাকতো। সাহেবের পরনে খাকী ইউনিফরম—কটিবদ্ধ চামড়ার খাপে রিভলবার। বাছাই-করা সেপাই—আর্দালী হিসাবে সাহেবের দেহরক্ষী নিযুক্ত। হঠাৎ আক্রান্ত হলে—সাহেবের সাহায্যার্থে আর্দালীর সঙ্গেও গুলীভরা রিভলবার। বাংলার দিকে দিকে ইংরেজ প্রতিভূরা বিপ্লবীদের রিভলবার পিস্তলের গুলীতে অতর্কিতে প্রাণ হারাচ্ছেন—তাই প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের জীবনের আশঙ্কা। সাইকেলে চেপে যতই সাহস ও বিক্রমের বাহ্যিক চাল বজায় রাখবার চেষ্টা থাকুক না কেন—কাছারী ও পুলিশ জেলাদপ্তরের চার পাশ ঘিরে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন থাকতো।

অ্যাক্শনের সাফল্যের জন্য—কোন পথে সাহেব অফিসে আসেন ও বাড়ি ফেরেন, পথ-ঘাটের নির্জনতা দিনের কোন সময়ে কিরূপ থাকে সাদা-পোষাকে আরো কোন দেহরক্ষী সাহেবের সঙ্গে থাকে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি নির্ভুল সংবাদ সংগ্রহে যুবক নিজেই মনোনিবেশ করলেন। কুমিল্লা ছোট্ট শহর। কোর্ট কম্পাউণ্ডে বা পথে-বাটে সচরাচর তেমন জনসমাগম থাকতো না। কাজেই যুবককে কখনও কোর্টের সামান্য কর্মচারীর, কখনও নিরীহ পথিকের কখনও বা দীনদুখী ভিখারীর ছদ্মবেশে পুলিশ সাহেবের গমনাগমনের পথটির বা তাঁর দপ্তরের বিভিন্ন অবস্থানের সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে হলো। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সাহেব—সঙ্গে কার্তুজ ভর্তি রিভলবার! সঙ্গী বলিষ্ঠ দেহরক্ষী আর্দালীটিও আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত। যুবক সম্পূর্ণ একলা—তাঁর কাছে একটি মাত্র আর্মি রিভলভার। তাঁকে অস্ত্রচালনায় পারদর্শী দু'জন পুলিশকে একাই—একযোগে আক্রমণ করতে হবে। কে বলতে পারে আক্রমণ করবার সুযোগই তিনি পাবেন কি না! পুলিশ ধুরন্ধরেরা সন্দেহবশে আগেই যদি তাঁকে আক্রমণ করে বসে। তা ছাড়া কোন কারণে যুবক যদি প্রথমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন—তবে তাঁর বক্ষ লক্ষ্যে দুটি পিস্তলই একসঙ্গে গর্জে উঠবে—মাস্টারদার নির্দেশ পালিত হবে না। যদি রিভলবারের গুলীতে পুলিশ সাহেবের হৃদয় বিদীর্ণ করা সম্ভব হয়-ও বা—আর্দালীটির অব্যর্থ নিশানায় তাঁর দেহ সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। নানা বেশে নানা ছলে মৃত্যু

তাঁকে বারে বারে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। কিন্তু যুবকের চক্ষে ভাসছে কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রমোদ, গোপীনাথ বিনয় বাদল প্রমুখের আত্মবলির উজ্জ্বল ছবি—কর্ণে বাজছে রক্তঝরা স্বাধীনতা সংগ্রামের রণভেরীর আহ্বান—হৃদয়-স্পন্দন জানাচ্ছে মাস্টারদার নির্দেশ—'হার মানলে চলবে না।—শত্রুর সঙ্গে নিষ্ঠুর ও নির্মম হ'তে হবে!

১৯৩২ শের ২৯শে জুন মিঃ এলিসনের চিরবিদায়ের দিন ধার্য হলো। যুবকের আজ নিরীহ পথচারীর বেশ। পরনে মলিন ধুতি অঙ্গে মানানসই মলিন সার্ট। আজ আর সেই-গর্বিত দৃঢ় পদক্ষেপ নেই—সরল শান্ত দৃষ্টির আড়ালে নির্ভীক জ্বলন্ত চক্ষু ঢাকা। পায়ে খাকী রংএর কেড্‌স—ডান হাতে একটি পুরোনো ছাতা। যেখানে গোলাগুলির খেলা চলবে—সেখানে ছাতার কি প্রয়োজন? আগেকার দিনের রাজরাজাদের যুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে ঢালের ব্যবহার ছিল। গুলীর বিরুদ্ধে ছাতার ব্যবহার ভাবাও অবান্তর। তবে ছাতার আড়ালে গাঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কি যুবক ছাতাটি সঙ্গে নিয়েছিলেন?

অনিবার্য মৃত্যুমুখে যার পদক্ষেপ গা ঢাকা দেওয়ার কথা তার মনেও আসেনি। সে আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিল—"পুলিশদের রিভলবারের জন্য চামড়ার হোলস্টার, আমার রিভলবারটির আশ্রয় ওই পুরোনো ছাতাটি—আমাকে বেশ মানিয়েছিল কিন্তু! ছাতার কাপড়ের আড়ালে ছাতার বাঁটের সঙ্গে ডান হাতের মুঠিতে রিলভবারটি ধরে রেখেছিলাম—বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

"সাহেব তাঁর বাড়ি ও অফিসের প্রায় মাঝামাঝি রাস্তায় এসে পড়েছেন। আমি পথের ধারে—সাহেবকে দেখে যেন ভয় পেয়ে পথের পাশে একটু সরে দাঁড়ালাম। গর্বিত ইংরেজ ভারতীয় নেটিভকে স্বাভাবিক ভাবেই তাচ্ছিল্য করে এগিয়ে গেলেন। ভারতীয় নেটিভটির হাত হতে ছাতাটি মাটিতে খসে পড়ে গেল—সাহেব কিছু বুঝতে পারার আগেই দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা ৪৫০ ব্যারের আর্মি রিভলবারটিতে পর পর গুড়ুম গুড়ুম দৃষ্টি শব্দে লক্ষ্যভেদ হয়ে গেল—গুলী লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সাদা ফ্যাকাশে মুখে সাইকেল নিয়ে সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

জালালাবাদে কর্নেল ডালাস স্মিথের সৈন্যের গুলীতে শহীদ ত্রিপুরা সেনও মুহূর্তে সাদা ও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন। মাস্টারদার মুখে শুনেছি—হৃৎপিণ্ডে গুলী লাগলে মুখে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মনে হলো আমার

গুলীও সাহেবের হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে। আশ্চর্য। সাহেবের বিশ্বস্ত বলিষ্ঠ দেহরক্ষী কই? সাহেব ও তাঁর দেহরক্ষীর খুব নিকটে দশ গজের মধ্যে থেকেই—বিকেল পাঁচটায়—দিনের পরিষ্কার আলোতে আমার রিভলবার অগ্নুদগার করেছে। অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজ প্রভু ধরাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—তাঁর বেতনভোগী দেহরক্ষী উর্দ্ধশ্বাসে তার প্রথম কর্তব্য—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" অতি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছে। তারপর আস্তে আস্তে যখন সে বুঝতে পারল রিভলবারের গুলী তাকে আর অনুসরণ করছে না—তখন 'নির্ভীক সেপাই'—এর রিভলবার বাগিয়ে ধরে দু' দুবার গুলী ছুড়লো। ততক্ষণে আমি বহুদূরে। চাকরী বজায় রাখার তাগিদে দেহরক্ষীর এই কর্তব্যপালন প্রয়াসকে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষমার চোখে দেখতে পারি।" এই বর্ণনা দিয়ে এক বন্ধু হেসে ফেললেন। যাঁর অব্যর্থ নিশানায় কুমিল্লার জেলা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসন পৃথিবীর মায়া ত্যাগে বাধ্য হলেন—কে সেই দুঃসাহসী নিঃশঙ্ক তরুণ?

প্রবল প্রতাপ বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটেছে—আজও কি সেই যুবকের পরিচয় অন্ধকারে ঢেকে রাখা প্রয়োজন? প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সিংহ এতবড় আঘাতটি যে সেদিন নিঃশব্দে মেনে নেননি সে কথা দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট। গেজেটে পুরস্কার ঘোষণা করে, শত শত নির্দোষ তরুণকে গ্রেপ্তার করে—নিরীহ দেশবাসী উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে এই "আততায়ীর" পরিচয় জানবার জন্য সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। জেলের মধ্যেও পুলিশের রাজনৈতিক বন্দীদের সূত্রে মিঃ এলিসনের হত্যাকারীর ও হত্যার রহস্য ভেদে পুলিশীবুদ্ধি চূড়ান্তভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সকল চাতুর্য ব্যর্থ হলো—হত্যাকারীর কোন হদিশই পুলিশ পেলো না।

মাস্টারদার নেতৃত্বে গোপন বিপ্লবী সংগঠনের লৌহদৃঢ় নিয়ম শৃঙ্খলা ও বৈপ্লবিক শিক্ষা পুলিশী চক্রান্ত বিপর্যস্ত করার জন্য যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল তার কাছে শাসককুলের প্রচণ্ড শক্তির সাময়িক পরাভব সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বিচলিত ও চিন্তিত করে তুললো। ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার এক তরুণ সৈনিকই যে এলিসন হত্যার নায়ক এ তথ্য পুলিশের অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

আততায়ীর গুলীতে মিঃ এলিসনের জীবনাবসান ও মিঃ ডুর্ণোর আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ বাংলার জেলেই খবরের কাগজ মারফৎ পেয়েছিলাম।

এ দুটি ঘটনা মাস্টারদার নির্দেশেই যে সংঘটিত—এ তথ্য অবশ্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

আন্দামান জেলে প্রায় আড়াই বছর কেটে যাওয়ার পর ভারতীয় গণতন্ত্র-বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিক শান্তি চক্রবর্তী, শৈলেশ রায়, মণি দত্ত, দীনেশ দাসগুপ্ত, কালীকিঙ্কর দে প্রমুখ বিপ্লবীরা বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বাংলার জেল হতে আন্দামানে স্থানান্তরিত হোল। তাদের আসার পূর্বেই আমরা জেলের "টেলিগ্রাম" মারফত পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও মাস্টারদার বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়েছিলাম। আন্দামান সরকারের একটা বুলেটিনকেই 'টেলিগ্রাম' বলা হতো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এইটি ইংরেজীতে ছাপা হয়ে বেরুতো। বুলেটিনের আকারটি একটি একসারসাইজ খাতার পাতার চেয়েও ছোট। কোন সময় দু' পৃষ্ঠাতেই সংবাদ ছাপা থাকতো আবার বেশীর ভাগ দিনই খবরের অভাবে এক দিকটাও পুরো ছাপা হোত না। কাজেই ঐ সংবাদগুলির কয়েকটি লাইন মাত্রই আমরা জানতে পেরেছিলাম।

বন্ধুদের পেয়ে আমরা খুবই খুসী। তাদের নিকট হতে দলের অন্যান্য সাথীদের বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও মাস্টারদার ফাঁসি পর্যন্ত যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল তার নির্ভুল ও বিশদ বিবরণ পেলাম।

বন্ধুদের কাছেই জানতে পারলাম ট্রাইব্যুনাল বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত মহানায়ক সূর্য সেনের চট্টগ্রাম জেলে বন্দীজীবন যাপন কালে জেল হতে তাঁকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী সৈনিকেরা জেল ভাঙার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই বিষয়ে পরে বিশদভাবে লিখবো। বর্তমানে এই জেল ভাঙ্গার পরিকল্পনা ব্যাপারে দণ্ডিত শৈলেশ রায় সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। জেল ভাঙ্গার পরিকল্পনাটি ছিল মানদার (শচীন সেন)। প্ল্যানটি কার্যকরী করতে হলে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। কারা প্ল্যানটিকে কার্যকারী করতে অংশ গ্রহণ করবে, কে কোন্ অস্ত্র নেবে, কোন্ রাস্তা ক'টি মোটরগাড়ি ও নৌকা ব্যবহার করা হবে ঐ প্ল্যানে তার খসড়া ছিল। সাফল্যের প্রাথমিক কাজ হিসাবে জেলের চতুর্দিকের পুলিশ ও মিলিটারীর অবস্থান এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঐসব তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। জেলের চতুর্দিকের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে একজন বাছাই করা বিচক্ষণ বিপ্লবী সৈনিক নিযুক্ত হলেন। এই বিচক্ষণ বিপ্লবী সৈনিকটি চতুর্থ বার্ষিক

শ্রেণীর বিশেষ মেধাবী ছাত্র—শৈলেশ রায়! সবল সুস্থ দেহ উজ্জল দীপ্ত চক্ষু—দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখাকৃতি!

চট্টগ্রাম জেল সীমানার প্রায় পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরে লালদীঘির পাড়ে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত পাবলিক লাইব্রেরী। সাধারণের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরী-সংলগ্ন লালদীঘির শান বাঁধানো একটি বড় ঘাট। প্রাক্ সন্ধ্যার আকাশ—অস্তসূর্যের রাঙা আলোয় পশ্চিমাকাশ লালে লাল—দীঘির শান-বাঁধানো নির্জন ঘাটে শৈলেশ রায় একা বসে। জেলের ও জেলসংলগ্ন বিভিন্ন পথঘাটের নকসাটি পকেটে নিয়ে চতুর্দিক ঘুরে দেখবার উদ্দেশ্যে শৈলেশ রায় নিভৃতির অপেক্ষায় অপেক্ষমান। আশ্চর্য! এই জনশূন্য ঘাটে হঠাৎ একজন জেলের সেপাইর আবির্ভাব। হঠাৎ সে শৈলেশ রায়কে বিপ্লবী বলে সন্দেহ করলো! জেলের সাধারণ সেপাইরা জেলের বাইরে পুলিশ—ওয়াচারের ডিউটি করে না। তবু এই বিশেষ সেপাইটি কালবিলম্ব না করে দীঘির ঘাটে উপবিষ্ট শৈলেশ রায়কে বিপ্লবী বলে চ্যালেঞ্জ করলো—'কেন সে সেখানে বসে আছে?' জেলের সাধারণ সেপাই বিপ্লবী যুবককে চ্যালেঞ্জ করছে—তার মনে একটুও ভয় নেই পাছে বিপ্লবী যুবকের গুপ্তস্থান হ'তে রিভলভার বেরিয়ে আসে।

জেল সেপাইয়ের চ্যালেঞ্জে সঙ্গে সঙ্গে সাদা পোষাকে আরও দুয়েকজন জুটে গেল—শৈলেশ রায় গ্রেপ্তার হলেন। আই. বি. ইন্সপেক্টার শচীন ভৌমিকও হঠাৎ এসে পড়লেন। অবস্থা বেগতিক দেখে হাতে আঁকা নকসার ছোট্ট কাগজটি গলাধকরণের চেষ্টায় শৈলেশ ততক্ষণে মুখে পুরে দিয়েছেন। মিঃ শচীন ভৌমিক শৈলেশের কণ্ঠনালী চেপে ধরে নক্সাটি উদ্ধার করলেন। নক্সটি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে শৈলেশ সেটা দাঁতে চিবিয়ে ছিলেন বলে অনেকটা অংশ দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও সেইটিই যে জেল ও জেলের পারিপার্শ্বিক অবস্থানেরই চিত্র তা বেশ বোঝা গেল। অপূর্ব পুলিশের অভিনয়! স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—শৈলেশ রায় একা দীঘির ঘাটে বসে থাকবে, শৈলেশ রায়ের পকেটেই জেলের নক্সা থাকবে, একজন জেল-সেপাই সেখানে আসবে, শৈলেশ রায়কে বিপ্লবী যুবক সন্দেহে জেল সেপাই তাকে গ্রেপ্তার করবে। এই সেপাইয়ের জীবনে ইতিপূর্বে বা পরে এইরূপ ঘটনা কি আর কখনোও ঘটেছে? এই ঘাটে বা অন্যত্র কোথাও এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনার আরো কি কোন নজির আছে?

কিভাবে, কেন বা কী সূত্রে শৈলেশ রায় নক্সা পকেটে নিয়ে তথ্য সংগ্রহে যাবে ও লালদীঘির ঘাটে সময় অতিবাহিত করবে তা গোপন বিপ্লবী দলের কোন্ কোন্ সদস্য জানতো? দলের নেতৃস্থানীয়রা কি একবারও সন্দেহ করেছিলেন যে, সংগঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই এই পুলিশী নাটকের মূল উদ্দেশ্য? এইরূপ প্রশ্ন এড়িয়ে জটিল পুলিশী চক্রান্তের মূল সূত্র উদ্‌ঘাটনে সংগঠকেরা যদি উদাসীন থাকেন তবে সেই ঔদাসীন্যের "মহৎ" কারণটি কী?

শৈলেশ রায়ের গ্রেপ্তারের পিছনে ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের চক্রান্তে সংগঠনের গোপন চক্রের কোন বিভীষণ সদস্য যে পুলিশকে আগে থেকেই শৈলেশ রায়ের তথ্য সরবরাহ করেনি—এ কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। দলীয় সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন শৈলেশ রায় ঐস্থানে জেল-সেপাই কর্তৃক এভাবে গ্রেপ্তার হতেই পাবে না। পুলিশ-চরদের অস্তিত্ব গোপনে ও বিপ্লবীদলে সন্দেহাতীত ভাবে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এইরূপ নাটকের সৃষ্টি পুলিশ অহরহই করে থাকে। ব্যাপারটা যে কেবল আমিই জানি তা নয়, অভিজ্ঞ বিপ্লবী নেতা ও সংগঠকেরাও তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তবু আমার আশ্চর্য মনে হয় ও খুব অবাক লাগে যখন দেখি বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এইরূপ পুলিশী-নাটককে প্রাধান্য দিয়ে মূল বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস গোপনে প্রয়াসী হন।

বেচারা শৈলেশ রায়, আন্দামানে আমার সান্নিধ্যে আসবার আগে পর্যন্ত ধারণাই করতে পারেনি যে, তার গ্রেপ্তারের পিছনে কোন বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত চক্রান্ত আছে। সরল মনে সে বিশ্বাস করেছিল আকস্মিকভাবে জেল সেপাই এসে সন্দেহবশেই তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

শৈলেশ রায়ের বিরুদ্ধে জেল ভেঙ্গে মাস্টারদাকে মুক্ত করার ষড়যন্ত্রের মামলা আনা হোল। এই মামলায় সাত বছরের জন্য তাকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হলো। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবক হাসিমুখে কালাপানি এলো দণ্ড ভোগ করতে। পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্যদের মধ্যে অনেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব-হাউস আক্রমণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আরও জানতে পারলাম মিঃ ডুর্নোর আক্রমণকারী ও মিঃ এলিসনের হত্যাকারী সেই দু'জন তরুণ সৈনিকও এদের মধ্যে বিদ্যমান। মিঃ এলিসনের হত্যাকারী সেই তরুণ সৈনিকই এই শৈলেশ রায়।

এলিসন হত্যার সূত্র উদ্‌ঘাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও পুলিশ বিফল মনোরথ হয়। লালদীঘির ঘাটে বন্দী হয়ে শৈলেশ রায় জেল ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র

মামলায় সাত বছরের জন্য আন্দামানে নির্বাসিত হ'লো। কিন্তু এই শৈলেশ রায়ই যে মিঃ এলিসনের হত্যাকারী তা পুলিশের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রয়ে গেল। হত্যাপরাধে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করাও সম্ভব হলো না। তবে সেই শৈলেশ রায়ই জেল ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র কার্যে পরিণত করার পথে লালদীঘির ঘাটে "আকস্মিক ভাবে" ধরা পড়ে কেন! দলের বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় শৈলেশ রায় যদি জেলের আশেপাশে ধরা পড়ে যেতে পারে তবে সেই বিভীষণের অনুকম্পাতে শৈলেশ রায় মিঃ এলিসনের হত্যাপরাধে বন্দী হোল না কেন?

মাস্টারদা তখনও জেলের বাইরে। নিজেই তিনি সংগঠকদের নিয়ে কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত। তাঁর গোপন দলের সুকঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মন্ত্রগুপ্তির কঠোর প্রয়োগে এলিসন হত্যারহস্য নিবিড় তিমিরে ঢাকা পড়ে এবং হত্যাকাণ্ডের নির্ভীক নায়ক শৈলেশ রায়ের পাত্তা পাওয়া পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এলিসন সাহেবের মৃত্যুদণ্ডের পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত! ভবিষ্যৎ 'বৈপ্লবিক' কর্মসূচী কার্যে পরিণত করণার্থে আগ্রহী আমাদের প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী বিনোদ দত্ত ও শৈলেশ রায়, কয়েকটি দরদী পরিবার ও বন্ধুজনের আশ্রয়ে তখনও নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার মধ্যে ফেরারী জীবন কাটাচ্ছিলেন। শৈলেশ রায় নোয়াখালিবাসী; কুমিল্লায় ও তার বিভিন্ন পরিচিত স্থান ও বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না।

ব্যক্তিগতভাবে সাহেব-হত্যা প্ল্যানের এটাই প্রাথমিক ব্যবস্থা। এছাড়া এলিসন-হত্যা প্ল্যানের মধ্যে কোন নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। বাংলার ইতিহাসে আগাগোড়া ব্যক্তিগত সাহসের উপর নির্ভর করেই ব্যক্তি-হত্যার পরিকল্পনা রচিত। জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার মূলে ছিল কানাইলালের মৃত্যুকে উপেক্ষা করার সাহস ও অমিত বিক্রম; দিনের আলোতে চৌরঙ্গীর উপর ভ্রমক্রমে টেগার্ট সাহেবের পরিবর্তে মিঃ আর্নেস্ট ডে-কে হত্যা করার প্ল্যানেরও মূল বৈশিষ্ট্য গোপীনাথের মৃত্যুপণ দুঃসাহস।

কার্ল মার্ক্স Armed Insurrection সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখেছেন—" ......In one word, according to the words of Danton—the greatest master of revolutionary policy yet known—'Audacity, audacity and yet again audacity?"

কার্ল মার্ক্স ফরাসী বিপ্লবের নেতা দাঁতের উদাও বাণী উদ্ধৃত করে বলেছেন, যে কোন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ও কৌশলের মূল বক্তব্য—'চাই বিক্রম, আরও বিক্রম ও সিংহ বিক্রম।' পরিকল্পনার এই মূল বিষয়টি যেখানে উপেক্ষিত, সেখানেই বিপ্লবীদের অবস্থা শোচনীয়।

আজও যখন ভাবি—মর্মান্তিক মনে হয়—১৯৩২ সালে চৌরঙ্গীর কাছে "The statesman" অফিসের দ্বারদেশে মৃত্যু-ভয়শূন্য চারজন যুবক—সম্পাদক মিঃ ওয়াট্‌সনকে গুলী করে—লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে যে মোটরে তারা চারজন চৌরঙ্গীতে এসেছিল সেই মোটরেই প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করে বেহালায় চলে যায়। সেখানে একটি স্তম্ভে মোটর গাড়িটিতে সামান্য ধাক্কা লাগে। পর মুহূর্তেই এই চারজন বিপ্লবী যুবক যারা জীবন তুচ্ছ করে রিভলবার হাতে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল, যারা জীবনকে সত্যই তুচ্ছ করে প্রত্যেকে পটাসিয়ম সায়ানাইড গলাধঃকরণ করে চির বিদায় গ্রহণ করল।

যাঁদের কাছে জীবন এত তুচ্ছ, মৃত্যু এত উপেক্ষণীয়, সংসারের কোন প্রলোভনেই—যারা আকর্ষিত হয় না এত সময় পেয়ে—সুদূর রাস্তা অতিক্রম করে এসে কেন এইরূপ শোচনীয় ভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিল?—এর উত্তর কে দেবে? এই আত্মত্যাগী যুবকদের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? নির্ভীক তরুণদল যারা নিজেদের জীবনপাতে ভ্রূক্ষেপ করে না, তাদের শিক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে নেতারা যদি সচেতন থাকেন তবে এইরূপ পরিণতির কি কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে? সে নেতা বা নেতৃস্থানীয়েরা সশস্ত্র সংঘর্ষের বাস্তবচিত্র অন্তরে কখনও উপলব্ধি করেন নি এবং নিজেরাও সেইরূপ মানসিক প্রস্তুতি হতে বহু দূরে, তাঁরা কি কখনও নির্ভীক সৈন্যদল তৈয়ারী করতে সক্ষম? আরও মনে পড়ে ১৯৩০ সালের ২৫শে জুলাই ডালহৌসী স্কোয়ারে স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাজা বোমা নিক্ষেপ করতে গিয়ে নিজের হাতেই সেই বোমার আকস্মিক বিস্ফোরণে অনুজা সেনের নির্মম মৃত্যু! চন্দননগরের বাড়িতে শ্রীকালিপদ ঘোষ যখন এই জাতীয় বোমার ফিউজ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন তখন তাঁকে হুঁসিয়ার করে বলেছিলাম যে ওই বোমা "Sucidal" (আত্মঘাতী) হবে দু'টি কারণ আমার কাছে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়েছিল—প্রথমত, তিন মিনিটের 'টাইম ফিউজ' বোমার সংযোগ করা অত্যন্ত impractical idea। যে-নেতা কখনও স্বহস্তে বোমা নিক্ষেপ করেননি বা যাঁর এ সম্বন্ধে কোনো

বাস্তব ধারণা নেই যে—নিশানা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়তে কতখানি সময় লাগেও লক্ষস্থলে পৌঁছাতে আরও ক'টি সেকেণ্ডের প্রয়োজন, তাঁর পক্ষে অনুজার বোমায় মাত্র তিন সেকেণ্ডের 'টাইম ফিউজ' সংযোগ করে মারাত্মক ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, নিজের হাতে তৈরী 'টাইম ফিউজ, টিস্যুকাগজ দিয়ে গান-কট্‌নাক বিচ্ছিন্ন রেখে সময় বৃদ্ধি করার Process ঠিক নয়। কারণ, হাতের মাপে 'ফিউজের' ভিতরে গ্রাননাকের ব্যবধান—মাপ অনুযায়ী রাখা সম্ভব নয়—ফিউজের মধ্যে যদি তুলোর টুক্‌রোগুলো একটু বেশী চাপাচাপি হয় তবে যে ক'টি সেকেণ্ড পাওয়া যাবে বলে স্থির থাকে তার অনেক আগেই বোমার বিস্ফোরণ ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। নেতার এই মূল শিক্ষা ও বাস্তব জ্ঞানের অভাবই বোমা বিস্ফোরণে অনুজার মৃত্যুর কারণ।

সুদীর্ঘকাল পরে নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এইসব আলোচনায় কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়—মূল উদ্দেশ্য অতীত ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমার এই উদ্দেশ্যকে যদি কোন হীন ও নীচ স্বার্থ প্রণোদিত নয় বলে মনে করতে পারেন তবেই উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখা আমার অনধিকার চর্চা নয় বলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন। ইতিহাসের এই পরিপ্রেক্ষিতে এলিসন হত্যার সার্থক প্ল্যানের কথা আমার মনে বিশেষ ছাযাপাত করে। এই ব্যক্তিগত হত্যার সার্থক পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য কি? এলিসন সাহেব কখন কোথায় যান আসেন, কিভাবে তিনি তার দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করেন বা শৈলেশ রাযকে এলিসন সাহেবের হত্যার পূর্বে বা পরে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে ইত্যাদির মধ্যে যদি একটা বিশদ পরিকল্পনা হযেছিল বলে ভাবি তবে প্ল্যানের মুখ্য দিকটি অবহেলিত হবে। এলিশন হত্যার প্ল্যানের মধ্যে যদি দেখতে পেতাম শৈলেশ একা একটা বিভলভার নিযে শত্রুর দু'টি রিভলভারের সম্মুখীন হয়নি, তাকে মোটরগাড়ি দিয়ে দেহরক্ষী দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল তবে কোনো বিশেষ প্ল্যান ছিল বলে ভাবতে অসুবিধা হোত না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই শৈলেশ একাই নির্ভীক চিত্তে একটি মাত্র রিভলভার নিযে এলিসন সাহেব ও তাঁর দেহরক্ষীর রিভলভারকে উপেক্ষা করে গুলি চালিয়ে এলিসনকে হত্যা করেছে।

আমার সুদৃঢ় অভিমত এলিসন হত্যা পরিকল্পনায় মুখ্য ছিল শৈলেশের মৃত্যুপণ বৈপ্লবিক দৃঢ়তা। বুকে দুর্বার সাহস, হাতে মুষ্টিবদ্ধ গুলিভর্তি রিভলভার ও হাসিমুখে দৃঢ় পদক্ষেপে রক্তক্ষয়ী মৃত্যুপথে অভিযান!

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে মাস্টারদার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নির্মলদা ও মাস্টারদার সঙ্গে আত্মগোপন করে আছেন, তিনিও এই ক্লাব—প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বাধা এলো। "গোপন-সংবাদ" পেয়ে শত্রুপক্ষ ক্যাপ্টেন কেমারণের নেতৃত্বে ধলঘাট গ্রামের যে বাড়িতে মাস্টারদা, নির্মলদা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও অপূর্ব সেন, আত্মগোপন করেছিলেন সে বাড়িটি ঘিরে ফেললো। খণ্ড-যুদ্ধে ক্যাপ্টেন্ কেমারণ নিহত হলেন এবং নির্মলদাকেও প্রাণ দিতে হোল। পলায়নের পথে অপূর্ব সেনও শত্রু রাইফেলের গুলিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। পুলিশও মিলিটারীর বেড়াজাল ভেদ করে প্রীতিলতা ও মাস্টারদা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণে সক্ষম হলেন। এই বাধার সৃষ্টিতে মাস্টারদা ক্লাব-আক্রমণ প্ল্যানটি সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন। আগেই ব্যবস্থা ছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারই এই আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। ধলঘাট খণ্ড-যুদ্ধের পরে পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হলে মাস্টারদার নির্দেশে-প্রীতিলতা বাড়ি ফিরে গিয়ে তার পূর্বেকার কর্মস্থল বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধানা-শিক্ষয়িত্রীর পদে আবার যোগ দিল। ক্লাব-আক্রমণে কল্পনা দত্তেরও সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা ছিল। প্রীতিলতা ও কল্পনার জন্য একই রকমের বিশেষ ধরণের দু'টি পোষাকও তৈরী হয়। ধলঘাটের বাড়িতে সশস্ত্র সংঘর্ষের পর তল্লাসীকালে পুলিশ অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ওই দুটি পোষাকের একটি উদ্ধার করে। পোষাক দু'টিতে—চেক্ সার্ট, দু'টি ধুতি আর একজোড়া সাদা পাগড়ি ছিল। অনেক কল্পনা জল্পনা করেও কেন এবং কে এই পোশাক ব্যবহার করবে পুলিশ তার কোন হিসেব লাগাতে পারে নি।

মাস্টারদার সঙ্গে কল্পনার যখন প্রথম দেখা হয় তখন সে বি. এস. সি. ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্রী। মাস্টারদা তাকে খুব শান্ত ও নিরীহ ছাত্রী হিসাবে চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশোনা করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন প্রয়োজনে কল্পনাকে তিনি ডেকে নেবেন। মাস্টারদার বিপ্লবী-জীবনের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী নির্মলদার অবর্তমানে নানা অসুবিধার মধ্যে ক্লাব-আক্রমণের প্রস্তুতি নতুনভাবে শেষ করবার দায়িত্ব এসে পড়লো। এই সময় সংগঠনের সকল কাজে তারকেশ্বর দস্তিদারই মাস্টারদার দক্ষিণ

হস্তস্বরূপ ছিলেন। ক্লাব-আক্রমণের তখনও বিলম্ব আছে। দলের কর্মীদের মনে সাহস ও উৎসাহ জাগিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য জেলার মত চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবীদেরও বিভিন্ন এ্যাকশনে নিযুক্ত থাকা উচিত— এ সিদ্ধান্তগ্রহণে সরোজকান্তি গুহের রিভলভারের গুলিতে ঢাকায় ডুর্নো সাহেব গুরুতর আহত হলেন। নির্মলদার জীবনের বিনিময়ে ক্যাপ্টেন্ কেমারন প্রাণ দিলেন—ধলঘাট-যুদ্ধের শহীদ অপূর্ব সেনের রক্তের ঋণ শৈলেশ রায়ের গুলিতে এলিসন্ সাহেবকে শোধ করতে হলো। মাস্টারদার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সংগঠকেরা ভিন্ন এই দু'টি বৈপ্লবিক অ্যাকশান্ কাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ বা জনসাধারণ কেউই তা জানতে পারলো না। পুলিশের সব চাতুরী ব্যর্থ করে এ' দু'টি আক্রমণাত্মক সাফল্যমণ্ডিত ঘটনা হওয়াতে সংগঠকদের উৎসাহ উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে গেল।

ধলঘাট সংঘর্ষের পরে সেই বাড়ির সাবিত্রী মাসীমা, পুত্র রামকৃষ্ণ ও কন্যা স্নেহলতাসহ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। রামকৃষ্ণ পুলিশের অত্যাচারে জেলেই প্রাণ ত্যাগ করে। সাবিত্রী মাসীমা অবিচলিত চিত্তে পুলিশের সমস্ত নির্মম অত্যাচার সহ্য করেন। কন্যা স্নেহলতার মানসিক সংগঠন কিন্তু মাতা পুত্রের দৃঢ় বিপ্লবী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। পুলিশের কাছে দ্বিধাহীন চিত্তে সে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি দিল। উপরন্তু মাতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে মামলার সাক্ষ্য দিতেও কসুর করল না। এই মেয়েটির কাছ থেকেই কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিলেন যে মাস্টারদার সঙ্গে বিপ্লবী দলের একজন সদস্যও পুলিশের বেড়াজাল ভেদ করে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ঐরূপ একটি পোষাক এবং একটি বিপ্লবী মেয়ের সেই বাড়িতে উপস্থিতি ও পলায়ন সম্বন্ধে পুলিশ স্বভাবতই হিসেব লাগাতে সচেষ্ট হোল—কে এই বিপ্লবী সদস্যা? পুলিশের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে প্রীতিলতা ও কল্পনার নামও ছিল। এ দু'জনের উপরেই পুলিশ কড়া নজর রাখলো। পুলিশের গতিবিধি দেখে কল্পনা আর প্রীতিও বুঝতে পারলো যে—যে-কোন সময়ে তাদের বন্দী হবার সম্ভাবনা। তারা মাস্টারদাকে খবর পাঠালো—আর বাইরে থাকা নিরাপদ মনে হচ্ছে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি যেন তাদের আত্মগোপনের নির্দেশ পাঠান বা কোন উপযুক্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

মাস্টারদা নিজেও তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছিলেন। আর দেরী না করে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে কল্পনাও প্রীতির কাছে মনি দত্তকে পাঠালেন। কল্পনাকে জানালেন—শান্তি চক্রবর্তী তার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করবে কিভাবে ও কোন্ পথে সে কল্পনাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। পীতিলতার সঙ্গে আলোচনা করে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার ভার দিলেন মনি দত্তকে। প্রীতিকে ও কল্পনাকে মনি দত্ত মাস্টরদার নির্দেশ জানালো।

মাস্টারদার নির্দেশ পেয়ে প্রীতিলতার সারা মনে সে কি কূলপ্লাবী আনন্দ —কি পরিতৃপ্তি—স্কুলের প্রধান-শিক্ষয়িত্রী পদের মায়া, স্নেহছায়াচ্ছন্ন গৃহ পরিবেশ—পিতামাতার অনাবিল স্নেহধারা—ভ্রাতাভগিনীর নির্মল ভালো-বাসা—নিমেষে কুটোর মত সেই আনন্দের প্লাবনে ভেসে গেল। বৃথা কালক্ষয় না করে প্রীতি সেই মুহূর্তেই মনি দত্তের সঙ্গে বাড়ি ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। মনি দত্ত স্কুলের ছাত্র—প্রীতির চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। প্রীতিলতা মনিকে বল্লো—"তুমি ভাই একটু বস, কিছু খেয়ে নাও, তার পরেই আমরা বেরিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে আমি সব গোছগাছ করে নিচ্ছি।"

মা-বাবার একান্ত স্নেহের পাত্রী মেধাবী ছাত্রী—প্রীতি প্রতিবারে ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়ে পাশ করেছে। এম. এ. পাশ করে এখন সে নন্দন-কানন বালিকা বিদ্যালযের প্রধান-শিক্ষয়িত্রী। এমন একটি কৃতী কন্যার উপর দরিদ্র পিতামাতার অগাধ বিশ্বাস, নির্ভরতা। তবু পুলিশের আনা-গোনা ও বিভিন্ন প্রশ্নাদির জন্য তাঁরা অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে দিন কাটাচ্ছিলেন। প্রীতিলতার এক মামা সব সময় প্রীতির উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখতেন যাতে কোন ছাত্র বা যুবক প্রীতির সঙ্গে কোন সময়েই দেখা করতে না পারে। প্রীতির সঙ্গে কোন ছাত্র বা যুবককে আলাপ করতে দেখলেই তিনি তাকে বিপ্লবী বলে সন্দেহ করতেন। মনি দত্তের আগমন ও প্রীতির সঙ্গে কথাবার্তা এবং তারপরেই প্রীতির একটু অস্বাভাবিক ব্যস্ততা মামাকে যৎপরোনাস্তি বিচলিত করে তুললো। তিনি মনি দত্তকে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন—না গেলে পুলিশে খবর দেবেন বলে শাসালেন। মামার তর্জন-গর্জনে প্রীতিলতাও সেদিন একেবারে ক্ষেপে গেল। যে-ঘরে মনি দত্ত বসেছিল কোমড়ে আঁচল জড়িয়ে লাঠি হাতে প্রীতি সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং উচ্চকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ করলো—"দেখি কার সাহস আছে

এগোও! আমার কাছে কেউ এলে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার অধিকার কারও নেই। বার যদি করতেই হয় তবে আমাকেও বার করে দিতে হবে।" এইরূপ আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য বাড়ির কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। প্রীতির বাবা কোনমতে এই জটিল অবস্থার কিছুটা মোলায়েম করলেন! কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রীতি মনি দত্তকে খানিকটা এগিয়ে দিতে সঙ্গে গেল। প্রীতির এই এগিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বাবা কিছু বলতে সাহস করলেন না। মনি দত্তকে এগিয়ে দিয়ে প্রীতি আর বাড়ি ফিললো না।

প্রীতিলতার নেতৃত্বেই ইউরোপীয়ান-ক্লাবটি আক্রান্ত হোক এবং এতে বাংলার মেয়েদের মধ্যে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা ও উৎসাহ আরও প্রখরতর হয়ে দেখা দিক এই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রীতির অনুপস্থিতিতেই মাস্টারদাকে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ প্ল্যানটি দ্রুত কার্যকারী করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেই অনুসারে তিনি নিম্নলিখিত বিপ্লবী কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতির পথে অগ্রসর হলেন।

(১) শৈলেশ্বর চক্রবর্তী—

(২) কালী দে—

(৩) মহেন্দ্র চৌধুরী—

(৪) সুশীল দে—

(৫) বীরেশ্বর রায় (পবাই কোড়া গ্রামের)

(৬) পান্না (লেখক অনন্ত সিংহের সমবয়সী—প্রথম থেকেই চট্টগ্রাম (বিপ্লবী শাখার সদস্য)

(৭) শান্তি চক্রবর্তী (সমুদ্র তীরে কাটলী গ্রামে বাড়ি)

(৮) প্রফুল্ল দাস (বাড়ি কাট্‌লী গ্রামে)

মাস্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী উপরোক্ত সদস্যেরা সংবাদ সংগ্রহ করা, বিভিন্ন পথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া, কাটলী গ্রামটিকে আক্রমণের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা, ক্লাবের সন্নিকটে কতগুলি গোপন স্থান স্থির করা, কে কিভাবে ও কোন পোষাকে সজ্জিত হবে, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় স্থির করলেন। সর্বোপরি এই ব্যাপারটি আগাগোড়া তদারকের ভার ন্যস্ত হোল তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর।

কাট্‌লী গ্রামের দু'এক মাইলের মধ্যেই ক্লাব-গৃহ। কর্ণফুলীর উত্তরে মাস্টারদার প্রধান হেড-কোয়ার্টারের কার্যালয় হতে কাট্‌লী প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূর। অতদূর হতে আক্রমণ চালানো অসুবিধাজনক

বলেই পাহাড়তলীর সন্নিকটে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবে কাট্‌লী গ্রামটির সুযোগ নেওয়া হোল। গৃহের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, জানলা-দরজা, লোকজন, ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহে দলের সাথীরা আত্মনিয়োগ করলো। এইসব তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকাকালীন কোন এক সুযোগে ক্লাবটির এক বেয়ারার সঙ্গে তারা সংযোগ স্থাপন করে। এই বেয়ারার ভূমিকার বিশেষ মূল্য আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারবো না। এর নাম অজানার অন্ধকারে রাখা চলবে না। সেই বেয়ারাটির নাম—দীনবন্ধু মজুমদার। আমাদের বন্ধু এই বেয়ারা—কালী দের কাকা নিশী দের শ্যালক। রাজনৈতিক জ্ঞান তার কিছুই ছিল না। সেই যুগ তখন আমাদেরই বা রাজনৈতিক জ্ঞান কতটুকু? আমরা বুঝতাম—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে হবে—যখন যেভাবে পারি তাদের হত্যা করতে হবে—ভারত থেকে দূর করে দিতে হবে! সেইযুগে বিপ্লবের এই সোজা কথাটি বুঝতে পারলেই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করতাম। দীনবন্ধুকেও এই বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। ক্লাব-আক্রমণ পরিকল্পনাটি সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী সর্বপ্রকার সাহায্যদানে দীনবন্ধু তার দায়িত্ব ত্রুটিহীন ভাবেই পালন করেছে।

ক্লাবগৃহের বৈশিষ্ট্যগুলি সাথীদের জানাবার ভার ছিল দীনবন্ধুর উপর। কোন দিন কোন্ সময়ে সাহেবেরা বিশেষ অনুষ্ঠানে মিলিত হন, প্রতিদিন কতজন সাহেব-মেম নাচ-গান ও মদ্যপানে রত থাকেন, অতর্কিত আক্রমণের প্রকৃষ্ট সময় কখন, কিভাবে অন্যের দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে কোন্ কোন্ দরজার আড়াল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে হাতবোমা নিক্ষেপ করা যায়—এইসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্যগুলি জানাবার ভার দীনবন্ধুকে দেওয়া হয়েছিল। আরও দু'টি বিশেষ দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। প্রথম—সাহেবেরা যে সময় চূড়ান্ত উন্মত্ত অবস্থায় প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকেন সেই সময়টি দীনবন্ধু আলোর সংকেতে আক্রমণকারী বিপ্লবীদের জানিয়ে দেবে। দ্বিতীয়টি হোল—কাট্‌লীর বাড়ি থেকে বিপ্লবীরা বেরিয়ে পর কোন একটি বিশেষ স্থান থেকে পথের নির্দেশ দিয়ে আক্রমণকারীরা যাতে আলোর সংকেত দেখতে পায়, ক্লাব-গৃহের খুব কাছাকাছি এইরকম কোন একটা গোপনস্থানে দীনবন্ধু তাদের নিয়ে যাবে।

এই প্রস্তুতি-পর্ব প্রসঙ্গে আর-একটি বিশেষ তথ্য এবং আরও একজন বিশেষ বন্ধুর পরিচয় প্রকাশ না করলে এই লেখায় ত্রুটি থেকে যাবে।

মাস্টারদা এবং আরও অন্যান্য আত্মগোপনকারী সংগঠকদের প্রায়ই নদী-পথে সাম্পানে (চট্টগ্রামের বিশেষ ধরণের নৌকা) করে যাতায়াত করতে হোত। নদীপথে যাতায়াতের জন্যই যে কেবল নৌকার প্রয়োজন ছিল তা নয়, সাম্পানে করে একস্থান হতে অন্যস্থানে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে যেতে হোত। নৌকার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছিল তারিণী মাঝি। তারিণী মাঝির বলিষ্ঠ দেহ, সবল বাহু ঝড়-জল ও দুর্যোগের ঘনঘটা উপেক্ষা করে বিপ্লবীদের নিয়ে সাম্পানে নদী-পাড়ি দিতে কখনও দ্বিধা করেনি। সব সময় জোয়ার-ভাটার গতি অনুসরণ করে তারিণী মাঝির সাম্পান চলতো না, বিন্দুমাত্র প্রয়োজনবোধে উজান বেয়ে বিপ্লবীদের নিয়ে সে বহুবার কর্ণফুলী পাড়ি দিয়েছে।

মাস্টারদার নির্দেশে কল্পনা এবং প্রীতির বাড়ি ছেড়ে এসে পৌঁছবার পর পাহাড়তলী ক্লাব-আক্রমণের পরিকল্পনা সমাপ্ত হল। দিন ঘনিয়ে এলো। উপযুক্ত পোষাকে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আটজন নওজোয়ান শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ক্লাব আক্রমণে অগ্রসর হলো।

"চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ"—১ম খণ্ডে শৈলেশ্বরের কথা সামান্য উল্লেখ করেছি। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী বিজ্ঞানের ছাত্র। বি. এস. সি পাশ। ১৯৩০ সালে রিভলভারের একবাক্স কার্তুজ মাথার নীচে রেখে শৈলেশ্বর সারারাত ঘুমোতে পারেনি পাছে কার্তুজগুলো আকস্মিক ভাবে ফুটে তাকে আহত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম প্রখ্যাত ব্যারিস্টার দেশনেতা শরৎচন্দ্র বসু মাস্টারদাকে উপহার দেবার অভিপ্রায়ে কত সহজে নিজের স্যুটকেসে পাঁচটি তাজা-বোমা নিয়ে কলকাতা হতে চট্টগ্রামে যান। দু'বছর আগে যে শৈলেশ্বরকে নিজের কাছে কার্তুজ রেখেই অত আতঙ্কিত হতে দেখেছি, সেই শৈলেশ্বরই আজ রিভলভার ও তাজা-বোমা হাতে নিয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি. নিজের প্রচেষ্টায় Subjectively নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেনি বা মানসিক দুর্বলতা ও ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি এমন একজনও বিপ্লবী সাথী আমি দেখিনি। আপাতদৃষ্টিতে যাদের দুর্বল ও ভীরু মনে হয়েছে Subjective ও Practical Training-এর মাধ্যমে তাদেরই যে আবার পুরোপুরি Death-defiant করে তোলা যায় সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

মৃত্যু-ভয়হীন প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা শৈলেশ্বর বৈপ্লবিক কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার বিলম্ব হেতু অধীর হয়ে উঠেছিল। শৈলেশ্বর মাঝে মাঝে আত্মহত্যা

করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠ্‌তো। আত্মহত্যার বিশেষ কোন কারণ সুস্পষ্ট-ভাবে সে কাউকেই বলেনি। শৈলেশ্বরকে বিশেষ ভাবে জানতো এমন বহু সাথীকে প্রশ্ন করেও শৈলেশ্বরের এই আত্মহত্যা-প্রবণতার কারণ জানতে পারিনি। এইটুকু মাত্র জেনেছি যে, সে যখন আত্মহত্যার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছিল মাস্টারদাই তাকে নিবৃত্ত করেছিলেন এবং এই মৃত্যু-পাগল সৈনিকের হাতেই পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন।

তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা) দীনবন্ধুর নাম দিয়েছিল—"জয়দ্রথ"। কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে "জয়দ্রথ" নামকরণ হয়েছিল আজ আর তা বলতে পারছি না। কথা ছিল বন্ধু জয়দ্রথের সঙ্কেত পাওয়ার পর আক্রমণ করতে যাওয়ার সময় তারা চার রকমের বিষয়বস্তু সম্বলিত মুদ্রিত প্রচার-পত্রগুলি চট্টগ্রাম শহরে বিলি করার জন্য একজন সাথীকে নিদেশ দিয়ে যাবে। অ্যাক্‌শনের সার্থকতার কথা ভেবে আক্রমণের সঠিক সময়ের পূর্বে প্রচারপত্র বিলি করা যে কোনমতেই যুক্তি সঙ্গত নয় তা সহজেই বোধগম্য। তাই শেষ মুহূর্তে নির্দেশ পাওয়ার জন্য একজন সাথীও এই দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিল।

রাত প্রায় ন'টার সময় ক্লাব-গৃহের অবস্থা বুঝে জয়দ্রথ আলো দেখিয়ে সঙ্কেত দিল। ক্লাবে উপস্থিত ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষেরা তখন খাওয়া-দাওয়া, মদ্যপান, নাচ-গান ও হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত ছিলেন! একটুও সময় নষ্ট না করে দ্বিধাশূন্য চিত্তে আক্রমণের উদ্দেশ্যে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বিপ্লবীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠ্‌লো—কেউ বললো, 'ক্লাব-কম্পাউণ্ডের প্রবেশ পথে দু' একটা মোটর গাড়ি দেখা যাচ্ছে,' কেউ বল্‌লো, 'সাহেবেরা ক্লাব ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে', আবার কেউ বল্‌লো, 'আরও একটু দেরী করলে ভাল হয়।' ক্রমেই দ্বিধাগ্রস্থ মনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলো—'আজ আক্রমণ চালানো স্থগিত রাখা উচিত।'

মরণ-পাগল শৈলেশ্বর এই সিদ্ধান্ত কোন মতেই মেনে নিতে পারছিল না। এ প্রস্তাবে সে ঘোরতর আপত্তি জানালো—সবাইকে বল্‌লো কাজ সম্পূর্ণ না করে ফেরা কোন মতেই উচিত হবে না এবং আক্রমণে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে বারে বারে অনুরোধ জানালো। সবই ব্যর্থ হলো—সকলের একই উত্তর—'অবস্থা আজ আমাদের অনুকূলে নয়; কাজেই আক্রমণ স্থগিত রাখা হোক্।' ক্লাবে ইংরেজদের দৈনন্দিন উৎসব উপভোগের অবাধ সুযোগ দিয়ে বিপ্লবী দলটি সেদিনকার মত বিদায় নিল; তারপর তারা দু'টি

ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্ন পথে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ফিরে চললো। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে যে বাড়িতে শৈলেশ্বর, কালী দে ও শান্তি চক্রবর্তী থাকতো, সেই বাড়ির কাছাকাছি একটি পুকুরের ধারে এসে দু'টি দলই আবার মিলিত হোল। যে দু'একজন শহর থেকে এসেছিল তারা পদব্রজেই শহরে ফিরে গেল। শান্তি চক্রবর্তী উত্তরের গ্রামে ফিরে যাবার জন্য মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দেকে নৌকার ব্যবস্থা করে দিল। গ্রামে গিয়ে এরাই মাস্টারদাকে এই অকৃতকার্যতার সংবাদ জানাবে।

নৌকাযোগে মহেন্দ্র ও সুশীল মাস্টারদার আশ্রয়স্থল—পতেঙ্গা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হল। গ্রামের নদীটির অপর পারে 'বন্দর' নামক স্থানে ফুটুদাকে (তারকেশ্বর দস্তিদার) এই অক্ষমতার বিবরণ জানাবার ভার শান্তি চক্রবর্তী নিজেই নিল। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী শৈলেশ্বর ও কালী দে রাত কাটাবার জন্য নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে চলল। ফুটুদাকে রিপোর্ট দিয়ে শান্তির ও সেখানেই ফিরে আসার কথা।

এত সুপরিকল্পিত আয়োজন সত্ত্বেও ক্লাব আক্রমণ না করে বন্ধুরা ফিরে আসাতে শৈলেশ্বর অত্যন্ত মর্মাহত। কিছুদিন আগে থেকেই শৈলেশ্বর "আত্মহত্যা করবো," "এই পৃথিবীতে আর থাকবো না," "কোন কিছুই ভাল লাগছে না," "শহীদেরা হাতছানি দিচ্ছে," ইত্যাদি নানা কথা কখনও অতি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আবার কখনও বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বারে বারেই বলছিল। তার এইসব "দুর্বোধ্য" কথাবার্তা থেকে ঘনিষ্ঠ সাথীরা বা মাস্টারদা কেউই চেষ্টা করেও এই সব উক্তির যথার্থ কারণ বুঝতে পারেননি এবং সে নিজেও কখনও কোন কথা খুলে বলেনি। তবে শৈলেশ্বর যে মর্মপীড়া বা কোন প্রকার মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল তাতে সন্দেহ নেই। কালী (কালী-কিঙ্কর দে) ও শৈলেশ্বর ইউরোপীয়ান ক্লাবের দরজা থেকেই সবার সঙ্গে ফিরে এসেছে—তখন থেকেই তারা দু'জনে একসঙ্গে আছে। কালী সর্বক্ষণ শৈলেশ্বরকে লক্ষ্য করছিল এবং তার মনে হচ্ছিল শৈলেশ্বর একেবারেই স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে। শৈলেশ্বর মাঝে মাঝে সুস্পষ্ট ইংরেজি ও বাংলায় বলছিল—"Mother country did not want that I should die at her alter—but I can't live any more……না, আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।……আমার মরতেই হবে—আমি মরবো……।"

শৈলেশ্বরের এই ধরণের কথা কালী আগেও শুনেছে। তার এই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বিচলিত হওয়া দেখে কালী দু' একবার শৈলেশ্বরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা

করলো—অস্থির ও অধীর না হবার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু শৈলেশ্বরের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

রাত প্রায় একটা। কালী ও শৈলেশ্বর নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে। খাটের উপরে শৈলেশ্বরের এবং খাটের পাশে মেঝেতে বিছানা পেতে কালী-র শোবার ব্যবস্থা। কালী-র মনে হচ্ছিল এত পরিশ্রান্ত থাকা সত্বেও যেন শৈলেশ্বর ঘুমোতে পারছে না। শ্রান্ত-ক্লান্ত কালী অবসন্ন শরীরে কোনও এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শৈলেশ্বর কালীকে জাগিয়ে বললো—"এক গেলাস জল দাও, আর একটা কলম ও কাগজ দাও।" কালী—"এত রাত্রে-কাগজ কলম আপনার কোন্ কাজে লাগছে?" একটু বিরক্ত হয়েই শৈলেশ্বর বললো—"অত কথায় তোমার কাজ কি? একটু কষ্ট করে এক টুক্‌রো কাগজ আর একটা কলম দেবে এতেই তোমার আপত্তি?" পাছে শৈলেশ্বর আরও বিরক্ত হয় তাই কালী আর দ্বিরুক্তি না করে তাকে এক গেলাস জল ও তার ফরমায়েস অনুযায়ী কাগজকলম এনে দিল। কালী ভেবেছিল শৈলেশ্বর হয়ত মাস্টারদার কাছে এই ব্যর্থতার রিপোর্টটি লিখে পাঠাবে আর নয়ত সে Pamphlet এর draft তৈরি করবে। শৈলেশ্বর শিক্ষিত—তার লেখার হাতও ভালো। ক্লাব-গৃহে আক্রমণের পর বিলি করার জন্য সে চার রকমের প্রচারপত্র লেখা হয়েছিল তার একটি শৈলেশ্বরের রচিত। কাজেই শৈলেশ্বর অত রাতে কাগজকলম চাওয়াতে কালী স্বাভাবিক ভাবেই মনে করেছিল শৈলেশ্বর নিজেদের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ সমালোচনা করে কিছু লিখবে। কালী আবার বিছানায় গেল—ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। সে দেখলো শৈলেশ্বর কাগজকলম নিয়ে বসেছে—কিছু লিখবে। কালী ঘুমিয়ে পড়লো। আবার কিছুক্ষণ পরেই শৈলেশ্বর কালী-র ঘুম ভাঙ্গালো—"এখন রাত কত—ক'টা বেজেছে?" অত রাতে এই প্রশ্নে কালী বিস্মিত হ'ল, কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার পিছনে অসম্ভব কিছু ঘটতে পারে বলে মনে করা কালীর পক্ষে সম্ভব হলো না। কালী বললো—"আপনি এখনও জেগে আছেন? ঘুমিয়ে পড়ুন—ঘুমিয়ে পড়ুন।" এই বলে কালী আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে এলো। ঘড়িতে তখন প্রায় ৫-৩০ মিনিট। তার শেষ ডাক। ডেকে বললো—"চিঠি রইল, আমি চললাম।" এই কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে পটাসিয়াম-সায়ানাইড মুখে পুরে দিল। লোকে জানে পটাসিয়াম-সায়ানাইডে মানুষ মুহূর্তে প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু

কালীর জীবনে শৈলেশ্বরের বিষপান এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। ঘড ঘড করে শৈলেশ্বরের গলা থেকে এক বিকট আওয়াজ হতে লাগলো—আশে-পাশে ও রাস্তায় কেউ থাকলেই ওই আওয়াজে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হবে। শৈলেশ্বরকে নিয়ে কালী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। কি করবে, কিসে তাকে একটু আরাম দেওয়া যায় ভেবে স্থির করতে পারছিল না। শৈলেশ্বর চিরবিদায়ের পথে—তার কাছে এ পৃথিবীর সেবা-যত্নের কোন মূল্যই তখন নেই। অনবরত সেই ভয়ানক ঘড় ঘড় আওয়াজ ঘরটিকে যেন কাঁপিয়ে তুলছিল। সেই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে পাছে কেউ ঘরে এসে পড়ে সেই ভয়ে কালী ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে সব স্তব্ধ হয়ে এল। বিছানার একপাশে কালি-কলম ও অন্য পাশে একটি খাতার পাতায় মাস্টারদাকে ইংরেজীতে লেখা একটি চিঠি নিয়ে শৈলেশ্বরের প্রাণহীন নিশ্চল দেহটি বিছানায় পড়ে রইল। আজ প্রায় আটত্রিশ বছর পরে—আত্মহত্যার আগের মুহূর্তে লেখা চিঠির বিষয়বস্তু কালী পুরো মনে করতে না পারলেও সেই চিঠির ইংরেজী একটি লাইন আজও তার মনে আছে এবং সেটি সে আমাকে বলেছে। সেই লাইনটি এখানে উদ্ধৃত করলাম····· Days are dull. Life is growing more and more anomalous day by day. Mind is absolute by rogue and vacant······"

শৈলেশ্বরের মৃতদেহ সামনে নিয়ে হতবুদ্ধি কালী—কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ইতি মধ্যে ফুটুদাকে ক্লাব-আক্রমণের ব্যর্থতার খবর জানিয়ে শান্তি ফিরে এলো। বাড়ি ফিরেই যে এইরূপ একটি নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা' সে ভাবতেই পারেনি। কি করেই বা জানবে—কি করেই বা জানবে যে কিসের দুঃখে কার প্রতি অভিমানে শৈলেশ্বর চিরকালের জন্য সবাইকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে? ফেরারী জীবনে গোপন আস্তানায় শান্তিরই বা কতটুকু কি করবার ক্ষমতা? তবু বিপ্লবীকে হাল ছাড়লে চলে না। শান্তি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ যুবক। সে শৈলেশ্বরের দেহ পরীক্ষা করে দেখলো। গলায় খুব ক্ষীণ ঘড় ঘড় শব্দ তখনও যেন দু' একবার শোনা গেল। বুকের স্পন্দনও যেন একেবারে স্তব্ধ হয়নি। শোনা যায় পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ জিহ্বা স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তার পুরো ব্যতিক্রম দেখে কালী ও শান্তির মনে ক্ষীণ আশা জাগলো—হয়ত শৈলেশ্বরকে বাঁচানো যেতে পারে!

কাট্টলী গ্রামে শান্তির বিশেষ পরিচিত একজন ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু যদি শৈলেশ্বরের চিকিৎসার পরিবর্তে আত্মহত্যার ব্যাপারটাই পুলিশকে জানিয়ে দেন তবেই বিপদ। তবু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও শান্তি ডাক্তার ডাকতে ছুট্‌লো—শেষ চেষ্টা করে দেখবে, যদি শৈলেশ্বরকে বাঁচানো যায়।

১৯২৩ সালে 'নাগরখানা যুদ্ধে' শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও রাজেন দাস শত্রুর হাতে জীবন্ত ধরা না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই তীব্র পটাসিয়াম-সায়ানাইড বিষ পান করেছিলেন—আমাদের দলের প্রায় সব সাথীরাই এই ঘটনা জানতো। আশ্চর্য? এই উগ্র বিষে মাস্টারদাদের কারও জীবনান্ত ঘটেনি। সেইজন্য মাস্টারদাকে আমরা কোন কোন সময়ে "নীলকণ্ঠ" বলে অভিহিত করতাম। তাঁরা তিনজন এই তীব্র বিষ হজম করেছিলেন—কি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা! সবই তখন "মায়ের লীলা" বলে মনে হয়েছিল। তাই ঐশ্বরিক প্রভাবের গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে ছুটে গিয়েছিলাম। ১৯৩০ সালেও আমাদের দলের সদস্যদের সকলেরই "মায়ের" চরণে অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। পটাসিয়াম-সায়ানাইড খোলা অবস্থায় থাকলে বা বাতাসের সংস্পর্শে এসে বোতলের অগ্রভাগের কিছুটা Oxidized হয়ে গেলে বিষের শক্তি যে নষ্ট হয়ে যেতে পারে—এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে "ভগবৎ বিশ্বাসী মনের" গতি অসম্ভব। কাজেই, শৈলেশ্বরও যদি "মায়ের করুণা" হতে বঞ্চিত না হয়, তবে হয়ত সেও বেঁচে যাবে! এক নিমেষেই শান্তির মনে এতসব কথার উদয় হোল। কোনরূপ দ্বিধা না করেই শান্তি ডাক্তার আনতে ছুটলো!

ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলেন যে শৈলেশ্বরের ঘুম আর ভাঙ্গবে না! এখন সমস্যা শব সৎকার—মৃতদেহের চিহ্নমাত্র যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শান্তি আরও দু'চার জন সাথীকে খবর দিল। রাত্রিবেলা ব্যবস্থানুযায়ী তারা এসে উপস্থিত হোল।

মহরমের রাত। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে মিছিলের বিভিন্ন পথ পরিহার করে সাথীরা গোপনে সমুদ্র তীরে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এলো। বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে বালুকারাশির গভীরে শৈলেশ্বরের শেষ শয্যা রচিত হোল। সযত্নে জাতীয় পতাকায় আবৃত শবদেহে পুষ্পার্ঘ্য দানে অন্তরের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে ভারাক্রান্ত মনে সাথীরা বিদায় নিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পর্দার অন্তরালে এইরূপ বহু শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। কখনও তা সাধারণের জানবার সুযোগ হয়নি।

ক্লাব আক্রমণের ব্যর্থতার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমস্ত খবর মাস্টারদা ধীর স্থির ভাবেই শুনলেন। সেখানে উপস্থিত না থাকলেও খবর শুনে মাস্টারদার মনের জিজ্ঞাসা আমি অনুমান করতে পারি। তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম বলেই ছোটখাটো অক্ষমতা ও ব্যর্থতায় তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিশেষ রূপটি আমার জানা। কোন বাধাকেই তিনি বড় করে দেখতেন না—অন্তরের প্রবল প্রতিরোধ শক্তিতে সকল বিফলতাকেই সহজভাবে গ্রহণের ক্ষমতা রাখতেন। সকল অকৃতকার্যতা ও নিষ্ফলভাব বাস্তব কারণ নির্ধারণে আত্মনিয়োগ করে অবিচল নিষ্ঠায় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

অপ্রত্যাশিত অকৃতকার্যতার কথা শুনে মাস্টারদা যখন চিন্তামগ্ন, তখনি সংবাদ এলো—'শৈলেশ্বর আত্মহত্যা করেছে।'

সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে ধীর পদক্ষেপে সম্মুখ পানেই চলতে হবে—কোন বিপ্লবী নেতার পক্ষেই মাঝপথে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হয়ে থেমে যাওয়া সম্ভব নয়। মাস্টারদার কাছেই শিখেছি বাধা, বিপত্তি ও নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে শত সহস্রগুণ বেশী দৃঢতার সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে—সমস্ত বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বারে বারে প্রস্তুত হতে হবে—আঘাতের পর আঘাতে শত্রুকে বিপর্যস্ত করে তুলতে হবে—পরাজয়ের মনোভাব ছাড়তে হবে, তবেই একনিষ্ঠ বিপ্লবীর কাছে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর ঔদ্ধত্য আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে।

আটজন বিপ্লবীকে নিয়ে যে-দলটি পূর্বে প্রস্তুত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে আজ শৈলেশ্বর নেই। পরিকল্পনা একবার বানচাল হলে আবার প্রস্তুত হতে সময়ের প্রয়োজন—কিন্তু তা বলে বিলম্ব করা চলবে না—কাজেই প্রস্তুতির অভিযান আবার পূর্ণ উদ্যমে শুরু হোল।

"আত্মহত্যা প্রবণতার" মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে মাস্টারদা হয়ত ভেবেছিলেন —সর্বদাই আত্মবিনাশে প্রস্তুত এই মৃত্যুভয়হীন মরণ-পাগল বিপ্লবী, প্রাণ দেবার সংকল্পে নিশ্চয়ই স্থির চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবে—নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিতে দ্বিধা

করবে না। শৈলেশ্বরকে আত্মহত্যা হ'তে বিরত করবার উদ্দেশ্যেই হয়ত মাস্টারদা ক্লাব-আক্রমণের নেতৃত্বভার তাকেই অর্পণ করেছিলেন।

চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্র বাহিনীর সাংগঠনিক ও সংগ্রামী অগ্রগতির পথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মাস্টারদার পাশেপাশে থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিপ্লবী সভ্যের ব্যাপারে, তাদের সম্পূর্ণ অজান্তেই, সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ নিজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে দলের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে— নানাভাবে তাদের নিবৃত্ত করতে হয়েছে। আবার কেউ হয়ত কোন সুযোগে রিভলভার, পিস্তল, প্রভৃতি জোগাড করে নিজের একটি "স্বাধীন চক্র" সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন—তাঁদের প্রতি আমাদের একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা আছে একথা বুঝিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করতে হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সমস্যায় তাদের মনঃস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর সাথীদের মনস্তত্ত্ব অনুসারে মাস্টারদা নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে রিভলভার, পিস্তল ইত্যাদি ফেরত নিয়েছেন হিংসা ও আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় যারা সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছিল চট্টগ্রাম জেলার বাইরে তাদের স্থানান্তরিত করে কাজের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সকল সংগঠন ও সকল দলের মধ্যেই আবহমানকাল হতে এই নীতি প্রচলিত। কিন্তু আসল কথা হোল কতখানি সার্থকতার সঙ্গে নেতৃবৃন্দ ও সংগঠকেরা সেই সূক্ষ্ম মনঃস্তাত্বিক নীতি প্রয়োগ করতে পারেন।

সাথীদের মধ্যে Team Sprit যাতে গড়ে ওঠে তার প্রতি মাস্টারদার সব সময়েই লক্ষ্য ছিল। কোন এ্যাক্শানের জন্য দল গঠিত হলে তাদের মধ্যে একজনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতে হয়। অ্যাক্শান পরিচালনার্থে Artificial leader অপেক্ষা Natural leader এর নেতৃত্বেই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী।

দ্বিতীয়বার ক্লাব-আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মাস্টারদা এমন একজন নেতার কথা চিন্তা করছিলেন যিনি দলের সকলেরই আস্থাভাজন ও যিনি বিপ্লবী দলটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালনায় সক্ষম এবং সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনা দ্বিধায় সকল নির্দেশ মেনে নিয়ে যাঁকে আনুগত্য দিতে প্রস্তুত।

মাস্টারদার ইচ্ছায়—এবারে ক্লাব-আক্রমণকারী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রীতিলতা নির্বাচিতা হলেন। "প্রীতিদি" দলের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী এবং তাঁর বিপ্লবী মনের দৃঢ়তা ও কর্মশক্তিতে সকলেই আস্থাবান। সাহসের

পরীক্ষায় ও বিপ্লবী জীবনের কঠোর আত্মত্যাগে আমাদের দেশের নারীরাও যে পুরুষের সমকক্ষ—প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা তাঁর জীবন উৎসর্গ করে তা প্রমাণ করেছেন।

আমাদের সশস্ত্র অভিযান চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে বিপ্লবী বোনদের কেন আহ্বান করা হয়নি—এই প্রশ্ন বাংলার বিপ্লবীদের মন আলোড়িত করে তুলেছিল। "অগ্নিগর্ভ—চট্টগ্রাম," "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" ১ম ও ২য় খণ্ড গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা'র পুনরাবৃত্তি আর করলাম না।

বাংলার নারী-সমাজের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার কোন কারণই ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে বোনেরা যুদ্ধ করতে পারবে না—আমাদের মনে এইরূপ অবান্তর চিন্তাধারারও কোন স্থান ছিল না। সাংগঠনিক সমস্যার কথা ভেবে ও স্বল্পতার জন্য সামরিক-শিক্ষার অসম্পূর্ণতায় বিপ্লবী ভাই-বোনদের একত্র অভিযান পাছে সফল করে তোলা না যায় সেই ভয়েই প্রথম আক্রমণে বোনেদের সঙ্গে নিতে আমরা সাহস করিনি।

আমরা জানতাম, বোনেরা আমাদের ভুল বুঝবে না। তারা যে সত্যিই ভুল বোঝেনি তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। তা'ছাড়া পরবর্তীকালে বোনেরা বাস্তবেও দেখেছে যে, তাদের প্রতি কোন Prejudice বা তাদের উপেক্ষা করার মনোবৃত্তি অথবা তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোনটাই আমাদের কখনও ছিল না।

মাস্টারদা ও নির্মলদা চেয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ বর্বরেরা বাংলার যে নারী সমাজকে নির্যাতনে অপমানে পদে পদে লাঞ্ছিত করেছে, সেই নারী সমাজেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করুক! গতিশীল জগতের বৃহৎ পরিধি হ'তে বিচ্ছিন্ন—অন্ধকার গৃহকোণে বন্দিনী নারী-সমাজ একবার যদি বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হন তাহলে তাঁরাও অসাধ্য সাধন করতে পারেন—এ-বিষয়ে মাস্টারদা, নির্মলদা উভয়েই সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন লাঞ্ছিত নারীসমাজের প্রতীকস্বরূপ প্রীতি ও কল্পনা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করবে—পিছনে পড়ে না থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে ভাইদের পাশে এসে দাঁড়া''র জন্য তারা ভারতের নারী সমাজকে অস্ত্র ঝন্‌ঝনায় ডাক দিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দফা আক্রমণ-প্রস্তুতি সুরু হোল। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টাতেও মাস্টারদাকে বহু নতুন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কল্পনা দত্ত পুরুষ বেশে বিপ্লবী-সাথী শান্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে training নেবার উদ্দেশ্যে কাট্টলীগ্রামের অভিমুখে যাচ্ছিল। পাহাড়তলীর কাছাকাছি দেওয়ান হাট নামক স্থানে কতিপয় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি কল্পনাকে মহিলা বলে সন্দেহ করে এবং তার পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। দেখতে দেখতে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠলো। এই পরিস্থিতিতে কোন উপায় না দেখে কল্পনা নিকটবর্তী থানাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিল এবং জানালো সে দেওয়ানহাটের স্থানীয় ডাক্তার জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের পরিচিতা। কল্পনা ডাক্তারবাবুর ছেলের সহপাঠিনী এবং সেই সূত্রেই ডাক্তার-বাবুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

এখানে স্থানীয় সংবাদপত্র 'পাঞ্চজন্য' হতে সামান্য উদ্ধৃতি দিলাম—"১৭—৯—৩২ তারিখে পুরুষবেশে তিনটি লোক ট্যাক্সিযোগে পাহাড়তলীর দিকে যাইতেছিল। দেওয়ানহাটের নিকটে তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া একটি লোকের সন্দেহ হয় যে ইহাদের মধ্যে একজন রমণী আছে। অপর এক ড্রাইভার শেখ দেওয়ান তাহাদের দেখিয়াছে এবং কল্পনাকে সনাক্ত করিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে ভেলুযাদীঘির উত্তরে সুরেন ডাক্তারের কাছে লইয়া যায় এবং পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ যাইয়া সেখানে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। কল্পনাকে Suppression of Terrorist Act মতে সোপর্দ করা হয়। সে জামিনে মুক্ত হইয়া নিরুদ্দিষ্টা হয়।" (পাঞ্চজন্য থেকে উদ্ধৃত)।

দুর্ঘটনা খুব সামান্য হলেও সংগঠনের চলার পথে এই সব বাধাও প্রস্তুতির গতি ব্যাহত করে। পুরুষবেশী কল্পনাকে থানায় বন্দী হতে হোল। পুলিশের বড় কর্তারা প্রাণপণে জানতে চেষ্টা করলেন কল্পনা এই বেশে কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কল্পনার কাছ থেকে কিছু জানবার দুরাশা পুলিশকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। কল্পনার মুখে যা' শুনেছি তাই এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। পুলিশের রিপোর্ট বা সংবাদপত্রের খবরের চাইতে আমাদের প্রত্যক্ষ রিপোর্টের সত্যতা অনেক বেশী—তাই আমার লেখাতে সর্বত্রই নিজেদের জানা বিবরণগুলিরই অগ্রাধিকার।

১৯৩২ সালের ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর কল্পনাকে জেল-হাজতে রাখা হোল। কল্পনার বাবা তখন সরকারী চাকরীতে অন্য জেলায় কর্তব্যরত। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি ছুটে এলেন। কল্পনাকে জামিনে মুক্ত করে আনবার চেষ্টা চলতে লাগল।

এদিকে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ। আক্রমণকারী দলটিও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর বিলম্ব করা উচিত নয়—বিলম্বে আরও কোন বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে—এই আশঙ্কায় ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত দশটায় আক্রমণের সময় ধার্য হোল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণকারীদলের ও দলনেত্রীর পরিচ্ছদ স্থির করা হল। পুলিশ ও মিলিটারীর তাণ্ডবে চট্টগ্রাম তখন সশঙ্কিত, বিপর্যস্ত। স্থানে স্থানে ক্যাম্প, যখন তখন সৈন্যদলের টহলদারী, যেখানে সেখানে চেক্-পোস্ট। সেই অবস্থায় চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের রাতের মত সামরিক পোষাক ব্যবহার মাস্টারদা সমীচীন মনে করলেন না। সকলেই সার্ট-গায়ে মালকোচা দিয়ে ধুতি পরে ও বাবার সোলের জুতোপায়ে আক্রমণে যাবে স্থির হোল। গরিলা-যুদ্ধ পদ্ধতিতে শত্রুকে অতর্কিতে যাতে আক্রমণ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্থির হোল প্রীতিলতা ও অন্যান্য সবার মত ধুতি-সার্ট ও বাবার সোলের জুতো পরবে। মাথার চুল ঢেকে রাখার জন্য মাথায় একটা সাদা পাগড়ির ব্যবস্থা হল। প্রীতির সার্টটি চেক কাপড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

মাস্টারদার নির্দেশেই প্রীতি এই অ্যাক্শনের নেত্রী। প্রীতি মাস্টারদাকে প্রশ্ন করেছিল অতজন উপযুক্ত ভাই বর্তমানে এই গুরুভার বহনের সম্মান তাকে কেন দেওয়া হচ্ছে? মাস্টারদা যুক্তি দিয়ে প্রীতিকে বুঝিয়ে ছিলেন —সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অনুচরেরা ভারতীয় নারীসমাজের প্রতি তাদের উৎপীড়ন ও অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করবে ভারতীয় বিপ্লবী রমণীর বোমা ও রিভলভারের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মুখে। দ্বিতীয়তঃ, মাস্টারদা তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—"আমি চাই ভারতীয় নারী সমাজ তাদের স্বাধীন সত্তা নিয়ে সমান অধিকারে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াক। তোমার সাহস ও চরম আত্মত্যাগের আদর্শ ভারতের নারীসমাজের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করুক—এই আমার ইচ্ছা ...।"

আটজন বিপ্লবী যুবকের ছোট দলটির সামনে নেত্রীপদের দায়িত্ব নিয়ে মাস্টারদা প্রীতির নাম ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় সকলেই উৎফুল্ল—সবাই প্রীতির নির্দেশ পালনে স্থির প্রতিজ্ঞ—বীর-কদমে একসঙ্গে প্রীতিদিকে অনুসরণ করে সবাই ইউরোপীয়ান-ক্লাবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং বোমা ও গুলীবর্ষণে সাম্রাজ্যবাদী পাশবিকতার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে।

প্রথমবার এই আক্রমণ পরিকল্পনা চলাকালে শৈলেশ্বর মানসিক প্রতি-ক্রিয়ায় ভুগছিল। সাথীদের কাছে বহুবার সে প্রকাশ করেছে—সে আর

বাঁচতে চায় না, তাকে মরতেই হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং সত্যি সত্যিই সে আর বাঁচলো না—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো। প্রীতিলতাও ক্লাব আক্রমণে যাওয়ার পূর্ব হতেই নিকটতম সাথীদের ও মাস্টারদাকে বার বার বলেছে—সে আর ফিরবে না, তাকে এই অভিযানেই প্রাণ দিতে হবে। ভাইয়েরা অনেক বুঝিয়েছে, মাস্টারদাও প্রীতিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রীতির এই মনোভাব সুস্থ নয়—ঠিক নয়। "মরতেই হবে"—একথা মনে করবে কেন? যুদ্ধে যদি মরণ আসেই তবে তাকে সাদর অভ্যর্থনায় বরণ করে নেবে—কিন্তু বাঁচবার চেষ্টা না করে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?" প্রীতির এক কথা, সে সবাইকে বলতো—"আমাকে নিয়ে তোমাদের আত্মগোপন করে থাকা কত অসুবিধা। আমার জন্য তোমাদের নিরাপত্তা অনেকখানি ব্যাহত। কি জানি মাস্টারদাও হয়ত আমার জন্যই ধরা পড়ে যাবেন—না, না, আমার বেঁচে থাকা উচিত নয়। নির্মলদা, রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য শহীদেরা আমাকে ডাকছে—তাদের কাছেই আমার স্থান। শত্রুর রিভলভারের গুলীতে আমি যদি নাও মরি তবু আমাকে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতে হবে। আমার কাছে বিষ থাকবে—প্রাণ থাকতে আমি ধরা দেব না—আর ফিরেও আসবো না।"

অগ্নিযুগের তরুণ-তরুণীদের ভাব-প্রবণতার ইতিহাসে এইরূপ বহু ঘটনা আছে। ২৪শে সেপ্টেম্বরে সকাল থেকেই মৃত্যুসংকল্প ত্যাগ করবার জন্য সাথীরা প্রীতিকে অনেক বুঝিয়েছে। তারকেশ্বর ও মাস্টারদা প্রীতিকে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের সংকল্প হতে বিরত করবার জন্য সস্নেহে বহুপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন। কিন্তু অচল অটল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রীতিকে তার সংকল্প হতে কেউ বিচ্যুত করতে পারলেন না।

প্রীতি মাস্টারদার কাছে বিদায় নিল—"মাস্টারদা শৈশব থেকেই আপনাকে ভক্তি করে এসেছি। আশীর্বাদ করুন আপনার দেওয়া এই গুরু দায়িত্ব পালনে যেন সফল হই। আপনার আশীর্বাদে পুরুষেরা যা পারে নারী বলে তা'তে যেন আমি অপারগ না হই। আমাকে শক্তি দেবেন—আমি যেন সংকল্পে দৃঢ় থাকি……।"

মাস্টারদা নীরবে অন্তরের অব্যক্ত গভীর ভাষাতেই আশীর্বাদ করলেন। একে একে আটজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী সৈনিক মাস্টারদার আশীর্বাদ নিয়ে রাত্রের দক্ষ-যজ্ঞে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

শহরের সীমানা হতে মাইল দুই দূরে কাট্টলী গ্রাম সংলগ্ন পাহাড়তলী

ইউরোপীয়ান ক্লাব। অন্ধকারে মাঠের উপর দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারীর অজ্ঞাতে ক্লাবটির একেবারে কাছাকাছি পর্যন্ত আসা যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে নিরাপদে অপেক্ষাও করা যায়।

আক্রমণের ঠিক আগের মুহূর্তে গেরিলা সৈন্যদলের—শুধু গেরিলা সৈন্যদল নয়—যে কোন যুদ্ধার্থী সৈন্যদলেরই একটি নির্দিষ্টস্থানে মিলিত হওয়ার নিয়ম। সামরিক শিক্ষাগ্রন্থে এই স্থানকে 'Rendezvous' (রাঁদেভু) বলা হয়। আক্রমণ যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে ও নিকটতম দূরত্ব হতে প্রয়োজনীয় আদেশ নির্দেশ দেবার বা নেবার সুবিধার্থে উপযুক্ত স্থানে হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা দরকার। তাই কাট্টলীগ্রামেই কিন্তু হেড্কোয়ার্টার করা হলো।

শৈলেশ্বরের নেতৃত্বে প্রথমবার ক্লাব আক্রমণকালে মাস্টারদার পরিবর্তে কাট্টলীতে তারকেশ্বর দস্তিদার উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়বারে প্রীতিলতার নেতৃত্বে আক্রমণ অনেক বেশী দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং মাস্টারদা কাট্টলী গ্রামের ফিল্ড হেড্কোয়ার্টারে উপস্থিত হলেন।

অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রবল ভাবপ্রবণতার অসংখ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বৈপ্লবিক অন্তরে ভাবপ্রবণতা না থাকলে শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করা সম্ভব নয়। যে-ভাবপ্রবণতার তীব্র উন্মাদনায় বিপ্লবীরা মরণকে তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে, দু'হাত বাড়িয়ে রাইফেলের বুলেটকে অভিনন্দন জানায়, অমৃতের সুধাধারা বোধে পটাসিয়াম সাইনাইডের মত তীব্র গরল আকণ্ঠ পান করে—সেই সকল মরণ পাগল বিদ্রোহী বীরেরা তাদের অন্তরের প্রেরণা হৃদয়ের আবেগ উপেক্ষা করবে কি করে? ভাবপ্রবণ হৃদয়ের আবেগে অন্তরের প্রেরণায় তারা বিপ্লবের একটা অর্থ মনে মনে বুঝে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। যুক্তিবাদের ভিত্তিতে 'বিপ্লবের অর্থ কি' তখনো তারা তা হৃদয়ঙ্গম করেনি। যুক্তিবাদ অনুশীলনের মাধ্যমে বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক অর্থ বা রূপ বুঝেছেন বলে আজ যাঁরা মনে করেন, আমার মতে সেই সকল বিষয়বস্তু যদি তাঁরা sentiment দিয়ে—প্রেরণা দিয়ে গ্রহণ করতে না পারেন তবে তাঁদের বোঝাটা কেবল 'বাহ্যিক বোঝার' গণ্ডিতেই নিবদ্ধ থাকবে। বিপ্লবী sentiment ও বিপ্লবী প্রেরণার যেখানে অভাব, সেখানে যুক্তিবাদের অবতারণার অর্থই হচ্ছে নিজেদের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার গোপন প্রয়াস মাত্র!

বিপ্লবী মনের আবেগ ও ভাবপ্রবণতা সবযুগে সর্বকালে বিপ্লবীদের মৌলিক ও অপরিহার্য গুণ। এই সত্য স্বীকার করা কোন বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব নয়!

ক্লাব-আক্রমণ প্রস্তুতির আরম্ভ ও ব্যর্থতার ইতিহাসের পিছনে যে ভাব-প্রবণতার অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল তাকে বাদ দিয়ে কেবল অস্ত্রসংঘাতের ঘটনার বিবরণ দিলে অগ্নিযুগের সেই বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অধ্যায়টির গুরুত্ব অবহেলিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাই ইতিপূর্বে আবেগ ও প্রবণতার দিকটিই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। এখন সাংগঠনিক দিকটির কথা বলি।

কালী দের কাকা নিশি দের শ্যালক দীনবন্ধু মজুমদার এই ক্লাবের বেয়ারার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কাট্টলীগ্রামে কোন এক সমর্থকের বাড়ি যোগাড় করেন। অ্যাকশনের ঠিক আগের দিন মাস্টারদা এ বাড়িতে আসেন। তারকেশ্বরও এই বাড়িতে উপস্থিত ছিল। ক্লাব আক্রমণে নির্বাচিত আটজন সৈনিকও এখানে এসে মিলিত হলো। বর্তমানে ব্যতিক্রম—এই আটজনের মধ্যে শৈলেশ্বর নেই! শৈলেশ্বরের পরিবর্তে নেতৃত্বভার প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের।

মাস্টারদা প্রত্যেককে অস্ত্র দিলেন—প্রীতিলতা ও কালী দের হাতে রিভলভার, মহেন্দ্র চৌধুরীর হাতে পুলিশ-মাস্কেট্রি, সুশীল দে, বীরেশ্বর রায়, পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস প্রমুখের হাতে অনুরূপ মাস্কেট্রি। সরকারী অস্ত্রাগার থেকে আমরা যেসব পুলিস মাস্কেট্রি হস্তগত করেছিলাম, সেইসব মাস্কেট্রির নল কেটে আকারে ছোট করা হয়েছিল। মাস্কেট্রির গুলির পাল্লা রাইফেল অপেক্ষা অনেক কম। নল কেটে ফেলার দরুণ যদিও মাস্কেট্রির গুলির পাল্লা আরও অনেক কমে গিয়েছিল, তবু নিকট থেকে point blank fire-এর আশানুরূপ সুফল পাওয়া সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। যেহেতু খুব কাছাকাছি, আড়ালে দাঁড়িয়ে "ক্লাব-গৃহের মধ্যে গুলী চালাতে হবে, তা'তে এইরূপ ছোট আকারে মাস্কেট্রি নেওয়াতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অসংখ্য পুলিশ ও মিলিটারীর সদা জাগ্রত সতর্ক দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্যই মাস্কেট্রির আকার এইরূপে ছোট করা হয়েছিল। ক্লাব-আক্রমণকারীরা আটজন বিপ্লবী সৈনিকের মধ্যে সাতজনকে দুটি রিভলভার ও পাঁচটি ছোট মাস্কেট্রি এবং শান্তি চক্রবর্তীকে একটি কৃপাণ দেওয়া হোল। এ ছাড়া আটজনের মধ্যে বাছাই করা ছ'জনের সঙ্গে দেওয়া হোল হাতবোমা। শান্তি চক্রবর্তী, বীরেশ্বর রায় ও প্রফুল্ল দাস—এই তিনজনের প্রত্যেকের কাছে দু'টি করে হাতবোমা ছিল। মাস্টারদা কর্তৃক যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচিত এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের সামান্য একটু পরিচয় এখানে দিচ্ছি—

(১) প্রীতিলতাকে নেতৃত্বের অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে আগেই লিখেছি।

(২) কালী দে—১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে, ২২শে এপ্রিল স্মরণীয় জালালাবাদ রণাঙ্গনে ইংরেজ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরে ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুত ও তার ব্যবহারে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত হয়। ক্লাব-আক্রমণে কালীর মত নির্ভীক ও অভিজ্ঞ "সৈনিকের" নির্বাচন যে নির্ভুল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) নির্ভীক বিপ্লবী মহেন্দ্র চৌধুরীও কালী দে'র মতই ১৮ই ও ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। তার মত সাহসী ও বিচক্ষণ সৈনিকের মনোনয়ন সম্বন্ধেও কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

(৪) পান্না সেন আমাদেরই বয়সী। মাস্টারদার নেতৃত্বে গোড়া থেকেই সে বিপ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সদস্য ছিল। কাজেই ক্লাব-আক্রমণে তার অংশগ্রহণের যোগ্যতা সম্বন্ধেও কারও কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

(৫) বলিষ্ঠ ও সুগঠিত দেহ প্রফুল্ল দাস। সকলেই তাকে "গামা" বলে সম্বোধন করত। ব্যক্তিগতভাবে প্রফুল্ল দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না বলেই তার সম্বন্ধে শোনা কথায় কিছু লিখলাম না। তবে তার "গামা" নামকরণ থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে সেই "গামাকে" এই অ্যাকশানের যথার্থ উপযুক্ত সৈনিক বোধেই মাস্টারদা নির্বাচিত করেছিলেন।

(৬) শরীর-চর্চায় বিশেষ পারদর্শী বলিষ্ঠ দেহ সুশীল দেকে আমি আগে থেকেই জানতাম। সে গ্রামেই থাকতো। ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণে যদিও সে নির্বাচিত হয়নি, তবু, পরের দিনে—১৯শে এপ্রিল আরও অনেকের সঙ্গে এসে ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির চট্টগ্রাম শাখায় তার সক্রিয় ভাবে যোগ দেবার ব্যবস্থা ছিল। ক্লাব-আক্রমণে সুশীল দের নির্বাচনও পুরোপুরি সমর্থ যোগ্য।

(৭) বীরেশ্বর রায়:—ব্যক্তিগতভাবে এই তরুণ সাথীটি সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার সুযোগ হয়নি। জেল হতে বাইরে এসেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কাজেই বীরেশ্বরের সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, মাস্টারদা তার হাতে মাস্কেট্রি ও দু'টি হাতবোমা দিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে চাই--মাস্টারদা যাকে দু'টি হাতবোমা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন তাঁর শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে আস্থা সম্পন্ন না হলে তিনি কখনই তা' দিতেন না।

(৮) চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের আগে শান্তি চক্রবর্তীকে আমি দেখিনি। শান্তি চক্রবর্তী কাট্টলী গ্রামের ছেলে। আন্দামান সেলুলার জেলেই শান্তির

সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আন্দামান সেলুলার জেলে কালী দে, সুশীল দে ও ও আমি একত্রে ছিলাম। মহেন্দ্রকে আগে থেকেই জানতাম—১৮ এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের রাত্রেও আমরা একত্রে শহর দখলে অংশগ্রহণ করেছি। মহেন্দ্র অবশ্য আন্দামানে নির্বাসনে যাযনি।

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারী কালী, সুশীল ও শান্তি—এই তিনজনেই আন্দামানে গিয়েছিল এবং এদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই এই আক্রমণের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করেছি। ক্লাব-আক্রমণের পর অন্যান্যদের মত শান্তি চক্রবর্তী বিভিন্ন বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত ছিল। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি, গৈড়লা গ্রামে শান্তি, কল্পনা ও মণি দত্ত মাস্টারদার সঙ্গে একই বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিল। নিশীথ রাত্রে মিলিটারীরা হঠাৎ এই বাড়ি ঘেরাও করে মাস্টারদাকে বন্দী করে। শান্তি, কল্পনা ও মণি দত্ত সৈন্যবেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সময় রাইফেলের একটি বুলেট শান্তির বুকের একটু উপর এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাবি দ্বীপ গ্রামে আমাদের দরদী সাহায্যদাতা রমণী চৌধুরীর গৃহে শান্তি আশ্রয় গ্রহণ করে। মাস্টারদা এই আশ্রয়স্থলটির নাম দিয়েছিলেন—"Amiable Shelter" শান্তি এই আশ্রয়স্থলে এসে ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পুনরায় পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে যায়। মাস্টারদার গ্রেপ্তারের সাত বছর পরে ফেরারী অবস্থায় এই "Amiable Shelter" এ ই শান্তি ধরা পড়ে এবং "Arms Act" প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় সাত বছরের জন্য দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে যায়। পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারীদের সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগ শেষ পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেনি। এই বিবরণটুকুই বুঝতে সাহায্য করবে যে, শান্তিকে তরবারি ও দুটো তাজা হাতবোমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই নির্ভুল ছিল।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণের প্ল্যান ছিল—আটজন আক্রমণকারী তিনটি বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ক্লাবের তিনদিক থেকে একসঙ্গেই আক্রমণ চালাবে। পূর্ব দিকের মেইন্ গেট দিয়ে প্রবেশ করবে প্রীতি, কালী ও শান্তি। প্রীতি ও কালীর হাতে থাকবে দুটো আর্মি রিভলভার এবং শান্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে দুটো তাজা হাত বোমা ও উন্মুক্ত কৃপাণ। দ্বিতীয় দলে—সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আক্রমণ চালাবে। ক্লাবের উত্তর দিকে দরজার পরিবর্তে বড এক খোলা জানালা ছিল। এই জানালার লাগাও বিলিয়ার্ড খেলার বড ঘরটি। তৃতীয় দলে, বীরেশ্বর, পান্না ও "গামা" উত্তরের এই জানালা দিয়ে আক্রমণ চালাবে।

এ পর্যন্ত কেবল উপযুক্ত সৈনিক নির্বাচন ও আক্রমণ চালাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্বন্ধেই বললাম। কিন্তু এই ক্লাব-আক্রমণ অভিযানের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মাস্টরদা এই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন এবং বাংলার জনসাধারণ ও বিপ্লবী তরুণদেরও আক্রমণের সেই বিশেষ "বৈপ্লবিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি" সম্বন্ধে অবহিত করা বিশেষ প্রয়োজন বলেই মনে করেছিলেন। সেই জন্যই প্রথমবার আক্রমণের সময় যেমন চার ধরণের মুদ্রিত প্রচারপত্র বিলি করার ব্যবস্থা ছিল এবারেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হোল। একটি প্রচারপত্রে প্রীতিলতার নিজের লেখা একটি বীরত্বপূর্ণ বিবৃতি ছিল। দ্বিতীয়টি হিজলী জেলের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ও আসানুল্লা হত্যার পর চট্টগ্রামে যে নৃশংস অত্যাচার ও নিপীড়ন চলেছিল তারই বিরুদ্ধে এই ক্লাব-আক্রমণ অভিযানটিকে সমর্থন করে দীনেশ্বরের নিজের হাতে লেখা। ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের রাতে ইংরেজচরদের জীবিত বা মৃত—যে-কোন অবস্থায় বিপ্লবী সরকারের কাছে উপস্থিত করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে বলে যেরূপ ঘোষণা ছিল, ক্লাব আক্রমণের তৃতীয় প্রচারপত্রটিও সেই ভাবেই রচিত। ছাত্র, যুবক, শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা সকলেই যেন বিপ্লবের অগ্রগতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন—এই অনুরোধ জানিয়ে মাস্টারদা নিজেই চতুর্থ প্রচারপত্রটি রচনা করেন।

এই চারটি প্রচারপত্রই ইংরেজীতে লেখা ও মুদ্রিত। যতদূর সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজেদের গোপন আস্তানায় ছোট্ট প্রেসে এইগুলি ছাপানো হয়। সহজেই বোধগম্য যে, এই প্রচারপত্র যদি অ্যাকশনের আগে শত্রুপক্ষের হস্তগত হয় তবে সংগঠনকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। মাস্টারদার সাংগঠনিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে, সুড়ঙ্গ পথে দলের মধ্যে কোন বিভীষণের প্রবেশই একেবারে অসম্ভব ছিল।

যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী সেনাপতিরা যে কেবল আক্রমণের প্ল্যানই করেন তা' নয়—আক্রমণ বা যুদ্ধ সমাপ্তির পরে সৈন্যেরা কে কোথায় যাবে বা কিভাবে পজিশান্ নেবে তার ব্যবস্থাও তাঁরাই আগে থেকে করে রাখেন। মাষ্টারদা সবার জন্য পরবর্তী কার্য-কৌশল ও নিরাপদ পথে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার সু-ব্যবস্থাও রেখেছিলেন।

রাত দশটা—ক্লাব-আক্রমণের নির্দ্ধারিত Zero Hour! ক্লাব-আক্রমণের প্রায় দু'ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে অস্ত্রশস্ত্রে সু-সজ্জিত হয়ে আক্রমণকারী

সৈনিকদলের যাত্রা করার কথা। আগেও বলেছি, এখনও বলছি—অগ্নি-যুগের বিপ্লবীরা ভাবপ্রবণতা ও বিপ্লবী-প্রেরণা দিয়েই পরিচালিত হতেন। আজ তাঁরা চলেছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে—তাদের কাছে রিভলভার—পিস্তল নিশ্চয়ই থাকবে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা যে নিশ্চিত মৃত্যু-পণ সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন তার ভয়াবহ রূপটি এই বিপ্লবী সৈনিকেরা অন্তরে অনুভব করছিলেন। জীবনের হয়ত এইখানেই শেষ—কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত পরস্পরের কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে হবে! জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে বিদায়ের পূর্ব-মুহূর্তে এই বিপ্লবী সৈনিকেরা মা-কালীর আশীর্বাদ প্রার্থনা না করে পারেন নি।

একটি ঘরে বেদীর উপর। মা-কালীর ছবি ক্লাব-আক্রমণকারী আট জন তরুণ বিপ্লবী প্রত্যেকে তাদের রাইফেল, বোমা, রিভলভার, শাণিত তরবারি, প্রভৃতি মায়ের পাদমূলে সাজিয়ে রাখলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! মা আজ তাঁর বিপ্লবী সন্তানদের কাছ হতে ফুল-বেলপাতার অর্ঘ পেলেন না—পেলেন তাঁদের অন্তরের অর্ঘ—তাদের সব চাইতে প্রিয় সাথী অস্ত্রের অর্ঘ!

সৈনিকেরা আটজন,। তারকেশ্বর ও মাস্টারদা সারিবদ্ধ হয়ে নীরবে মায়ের সামনে দাঁড়ালেন—মায়ের চরণে নিবেদিত হোল গভীর অন্তরের নীরব প্রার্থনা—খেটক খর্পর-ধারিণী মহাকালী! শত্রু নিধনে তোমার সন্তানদের জয়যুক্ত কর!

এই অনুষ্ঠানের পর আট জন নির্ভীক বিপ্লবী সৈনিক মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রক্তক্ষরা বন্ধুর গন্তব্য পথে এগিয়ে গেল। পূর্ব-ব্যবস্থানুযায়ী মাস্টারদাও তারকেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে নৌকা যোগে কাট্টলী গ্রাম পরিত্যাগ করলেন ও নদীর অপর পাড়ে "বন্দর" নামক স্থানে ক্লাব-আক্রমণের ফলাফলের সংবাদের প্রতীক্ষায় রইলেন।

অন্ধকারে গাছ-গাছালির আড়ালে আটজন সশস্ত্র বিপ্লবী আক্রমণ চালাবার পজিশনে প্রস্তুত। অদূরে আলোঝলমল ক্লাব-ঘর। বাতাসের হিল্লোলে পিয়ানোর মধুর ঝঙ্কার; ইংরেজ নর-নারীর সান্ধ্য-মিলনোৎসবের নাচে গানে সুরাসিক্ত প্রমোদ কোলাহলে চট্টগ্রাম শহরের এই নিভৃত প্রান্তটি প্রাণ-চাঞ্চল্যে মুখরিত। কেবল আজই নয়—সুদীর্ঘ দিন ধরে এই ক্লাব-গৃহে ইংরেজ বড়কর্তাদের আনন্দভোগের ব্যবস্থা। দু'শ' বছরের শাসন ও শোষণের বুনিয়াদের উপর, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসককুলের বিলাসব্যসনের জন্যই এই

সব ইউরোপীয়ান ক্লাবের অস্তিত্ব—এ যেন নিরন্ন দরিদ্র পরাধীন জাতির প্রতি এক নির্লজ্জ ব্যঙ্গ ও দাম্ভিক উপহাস!

আমাদের এই ভারতভূমি প্রেম, ত্যাগ ও ক্ষমার দেশ। এই দেশেই বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রমুখ, ধর্মাবতার বৃন্দ উদাত্ত কণ্ঠে বার বার ঘোষণা করেছেন—'সর্বজীবে দয়া কর—আচণ্ডালে কোল দাও—অন্তরের হিংসা, দ্বেষ, বৈরীভাব ত্যাগ কর।' মহাত্মাজীর অহিংস ধর্মও অনুরাগ কথাই বলে। এই প্রেম ধর্ম, ক্ষমা-ধর্ম বা অহিংস-ধর্মের প্রচার ভারতের পরাধীন দুর্বল জাতিকে আরও শক্তিহীন, আরও দুর্বল করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সবল ও পরাক্রমশালী হতে সাহায্য করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংসাত্মক প্রচণ্ড শাসন ও শোষণের কাছে যীশুখৃষ্টের অমৃতময় শুভবাণী আত্মগোপন করাই শ্রেয় মনে করেছে। বুদ্ধদেবের "সর্বজীবে দয়া কর"—এই প্রেমের বাণী সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডবের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক যীশু গান্ধীজীর অহিংসা নীতি সুশোভিত তেরঙ্গা ঝাণ্ডা সাম্রাজ্যবাদী মিলিটারী বুটের তলায় বারে বারে দলিত নিষ্পেষিত হয়েছে।

বিপ্লবীরা কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর স্বরূপ বুঝতে একটুও ভুল করেন নি। তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের ও গান্ধীজীর অহিংস নীতির শান্তির বাণী প্রচারে—জনগণকে শান্ত ও ক্লীব করে রাখবার প্রয়াস দেখতে পেয়েছেন। তাঁরা বুঝেছেন ভারতবাসী যতদিন শ্রীচৈতন্য, গান্ধীজী প্রমুখের প্রেম ও ক্ষমাধর্মে বিভোর হয়ে আত্ম-মগ্ন থাকবে, সেই সুযোগে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অ্যাটমবম্ তৈরী করবে, চন্দ্র অভিযান সফল করে ফিরে আসবে—বিশাল সৈন্য-বাহিনী রণসজ্জায় সজ্জিত করে তুলবে—অহিংসা ও প্রেমের পূজার জন্য নয়—পরাধীন জাতির "মহৎ মঙ্গলের" জন্য নিজেদের স্বার্থ কায়েম করবার উদ্দেশ্যে পদানত এই বিশাল ভারতভূমির নিরীহ নিরন্ন জনগণকে দাবিয়ে রেখে শোষণ ও শাসন করবার জন্য।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—"চোরা কভু নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।" সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির কাছে ধর্মের মন্ত্র, শান্তির বাণী সকলই অর্থহীন—শান্তির বাণীর মিথ্যা আবরণের আড়ালে তারা চায় আসুরিক শক্তির বৃদ্ধি ও বিস্তার। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই চরিত্রের কথা ভুলে গেলে ধর্মপ্রাণ পাঠকবর্গের মনে হবে ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণ করে নির্দোষ নর-নারীকে হত্যা করার নিষ্ঠুরতার যৌক্তিকতা কোথায়? সাম্রাজ্যবাদীর সময়-শক্তির ও আসুরিক

ক্ষমতার কবল হতে আত্মরক্ষার্থে ক্ষমতাহীন রক্তাক্ত সংগ্রাম ভিন্ন এই পরাধীন জাতির নিঃস্ব জনগণের আর কোন পথ পথ নেই। "Extreme hatred toward enemy"—শত্রুর প্রতি অপরিসীম ঘৃণার মনোভাবই এই পরাধীন অক্ষম জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সক্ষম করে তুলেছে। বিপ্লবীদের সামরিক প্রস্তুতির এই বিশেষ দিক্‌টির পর্যালোচনা না হলে তাঁদের বৈপ্লবিক চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় উপেক্ষিত হবে। বিপ্লবীদের অন্তরেও সর্বসাধারণের মতই দয়ামায়া প্রেমে ভালোবাসার স্বাভাবিক উৎস বিদ্যমান। সেই স্বাভাবিক স্রোতে গা ভাসিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর উৎপীড়ন হতে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উৎখাত করবার জন্য নিজেদের Subjectively তৈরী করে তোলবার সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। যাঁদের মন Subjectively প্রস্তুত হয়েছিল তাঁরাই ইংরেজ-সরকারের প্রতিভূদের হত্যা করবার কর্মসূচী গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন।

আর বেশী দেরী নেই—জয়দ্রথ (দীনবন্ধু) আলো দেখিয়ে এখনই হয়ত সঙ্কেত দেবে! আটজন বিপ্লবী সৈনিক তাদের নিজের নিজের অস্ত্রশস্ত্রাদি যথাযথভাবে যথাস্থানে আছে কিনা দেখে নিল। এই আসন্ন আক্রমণের মুহূর্তগুলি তাদের বিচলিত করেছিল—বিলম্ব তাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

সময় হোল। নাচে গানে ক্লাব-গৃহ মুখর। আলোর সংকেত দেখা গেল। এবার আর দ্বিধা করা চলবে না—বীরত্বের সঙ্গে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। প্ল্যান অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট পথ ধরে ক্লাব-ঘরের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে তারা এগিয়ে গেল। পুব-দিকের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলো প্রীতিলতা, শান্তি ও কালী। সুশীল ও মহেন্দ্র প্রবেশ করলো দক্ষিণের দরজা দিয়ে। বীরেশ্বর, পান্না ও পামা উত্তরের বড় খোলা জানালায় পজিশন নিল।

আন্দামান জেলে শান্তি, কালী ও সুশীল-দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় এই আক্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত জানবার সুযোগ পেয়েছিল। প্রথম আক্রমণ বা "Fire" কে করেছিল তা' আমি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। নিজের অভিজ্ঞতায় প্রথম আক্রমণ সুরু করার অর্থ বা বৈশিষ্ট্য কি তা' জানতাম বলেই প্রশ্নটি করেছিলাম এবং উত্তর পেয়েছিলাম—"শান্তি চক্রবর্তীই প্রথম গিয়ে হাতবোমা নিক্ষেপ করে।" শান্তির নিক্ষিপ্ত বোমা ফাটা মাত্রই নিমেষের মধ্যে তিনদিক থেকে একই সঙ্গে হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং মুহুর্মুহু রিভলভার ও মাস্কেট্রির গুলী চলে।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে ক্লাব-গৃহে মিলিত ইংরেজ নর-নারী সকলেই আত্মরক্ষার্থে মরীয়া হয়ে হাতের কাছে যে যা' পেলেন—চায়ের কাপ, মদের বোতল, গ্লাস, ট্রে, চেয়ার প্রভৃতি ছুঁড়তে লাগলেন। হাতবোমার জোর শব্দ, রিভলভার মাস্কেট্রির অজস্র গুলীর আওয়াজ, চেয়ার, মদের বোতল প্রভৃতি ছোঁড়াছুঁড়ি ও ঘন ধূম্রজাল এমনই একটা ভযাবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, সেই সময় কতজন হত বা আহত হয়েছে জানা সম্ভব ছিল না। দরজা ও জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আটজনের ক্ষুদ্র দলটি খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই আক্রমণ চালিয়েছিল। চারুবিকাশ দত্তের ও শ্রীআনন্দ গুপ্তের লেখা বইতে এই আক্রমণের বিবরণ পাওযা যায়। তাঁরা হযত এইরূপ আক্রমণের বাস্তবতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে না পেরেই লিখেছেন যে, দুই পক্ষেই গুলী বিনিময় হয ও প্রায় পনেরো মিনিট ধরে এই যুদ্ধ চলে।

ঝটিকাবেগে এইরূপ অতর্কিত আক্রমণ এক মিনিটের বেশী কোনমতেই চলতে পারে না। সকল দিকের নির্গমন পথ রুদ্ধ একটা ঘরের মধ্যে পঁচিশ-তিরিশ জন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাকে বোমা, রিভলভার ও মাস্কেট্রি নিয়ে আক্রমণ করলে, সেই আক্রমণের পরিণতিতে এক মিনিটের বেশী লাগতেই পারে না এবং এই ক্ষেত্রে লাগেওনি। এক মিনিটের মধ্যেই যা' ঘটবার ঘটেছিল—কেউ মরলো, কেউ কেউ আহত হোল, আবার কেউ পালিযে প্রাণ বাঁচালো। আক্রমণ শেষ করে আমাদের বিপ্লবী দলটিও স্থান ত্যাগ করলো।

এই এক মিনিট আক্রমণ চলা কালে সবাই তিনভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের কার্যস্থান হতেই আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই অবস্থায সেই সময়ে নিজেদের কেউ আহত হয়েছে কিনা তারা জানতে পারেনি। ক্লাব-গৃহ ত্যাগ করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারা জানতে পারলো প্রীতিলতা আহত।

শান্তি, প্রীতিলতা ও কালী দে প্রথম থেকেই একসঙ্গে ছিল। এই অভিযানে অংশ গ্রহণের আগে থেকেই প্রীতিলতা যে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণের অভিলাষ প্রকাশ করে আসছিল তা' পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আলোর সঙ্কেতের পর ক্লাব অভিমুখে যাত্রাকালেও প্রীতি কালী দেকে বলেছিল—কালীদা, আমি কিন্তু মরবই। আমি নিজের পটাশিয়াম সায়নাইডটুকু নিশ্চয়ই খাবো। কিন্তু কি জানি, তবু যদি প্রাণ যেতে দেরী হয় তবে আপনার ভাগের পটাশিয়াম টুকুও কিন্তু আমার মুখে দিয়ে দেবেন।" এই কথা কালী শুনেছে বটে, কিন্তু খুব একটা আমল দেয়নি। মাস্টারদা, তারকেশ্বর ও বাকি সাতজন সাথী যদিও প্রীতিলতার এইরূপ স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণের সংকল্প জানতো,

তবু শেষ পর্যন্ত যে প্রীতিলতা আত্মহত্যা করবেই—এটা তারা সঠিক বুঝতে পারেনি। সকলেই ভেবেছিল অভিযান শেষ করে প্রীতিলতাও সকলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

ক্লাব-গৃহ থেকে পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের ফটকের দূরত্ব প্রায় একশ' গজ। ওয়ার্কশপের ফটকের সামনে এসে প্রীতিলতা বসে পড়লো ও নিজের কাছে রক্ষিত পটাশিয়াম-সায়ানাইড গলাধঃকরণ করে সেইখানেই ঢলে পড়লো। দলের অন্যান্য সকলে এগিয়ে গেছে—কেবলমাত্র কালীকে পাশে দেখে প্রীতি বললো—"কালীদা, আমি চল্‌লাম।"

প্রীতিলতার স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রীতি তাকে বলেছিল—"আপনার ভাগের বিষটুকুও আমাকে দেবেন, আমি যেন কষ্ট না পাই।" প্রীতিকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে কালী অস্থির হয়ে উঠলো এবং প্রীতির কথামত মৃত্যুকালে প্রীতির যাতে কষ্ট কম হয় সেই উদ্দেশ্যে নিজের জন্য রক্ষিত পটাশিয়ামটুকুও প্রীতির মুখের গুঁজে দিল।

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য ও নাটকীয় বলেই মনে হবে। কালী দে আজও সুস্থ শরীরে বর্তমান এবং তারই কথা হুবহু আমি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। পাঠকবর্গ হয়ত ভাবতে পারেন কালী দে নিজেই রং ঢং লাগিয়ে একটা গল্প সাজিয়েছে। এমন কি এই ক্লাব-গৃহ আক্রমণকারী অন্যান্য সাথীরাও হয়ত এই বিবরণ মিথ্যা বলে অভিহিত করতে পারে। কিন্তু আমার যতটুকু যুক্তি ও বিবেচনা শক্তি আছে তার উপর নির্ভর করে কালী দে প্রদত্ত এই বিবরণ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

যে সকল সাথীদের কাছ হতে এই সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে তাদের মূল্যায়ন করেছি। মাস্টারদা কাকে কতখানি বিশ্বাস করতেন, কা'র উপর কতটুকু নির্ভর করতেন তার গুরুত্ব বুঝে এবং প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা দিয়ে বিচার করে দেখেছি—কে কতখানি Subjective বা Objective বিবরণ দিচ্ছে।

কালী দে ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং জালালাবাদ রণাঙ্গনে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ফেরারী অবস্থায় "ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে" লিপ্ত হয় এবং পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণকল্পে দু'বারই যোগ দেয়। বিশেষ লক্ষ্য করার কথা হোল—মাস্টারদা সেই আক্রমণে অংশ-গ্রহণকারীদেরমধ্যে প্রীতিলতার হাতে একটি ও কালীর হাতে একটি রিভলভার দিয়েছিলেন। এই সব data আমার বিবেচনার বিষয় এবং কালী দের মিথ্যা

অত্যুক্তি করার অভ্যাস আছে কিনা তাও হিসেবের মধ্যে ধরে নিয়ে অভিমত প্রকাশ করলাম। প্রীতিলতার মুখে কালী যে বিষটুকু গুঁজে দিয়েছিল, সে বিবরণ নাটকীয় ও অবিশ্বাস্য হলেও আমি তা' মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। বিপ্লবীদের জীবনে এইরূপ নাটকীয় ঘটনা শুনতে যদিও অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য, তবু তা' বাস্তবসত্য।

পরের দিন সকালে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সারা বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হোল। অব্যাহত ও প্রচণ্ড সামরিক শাসনের মধ্যে পুলিশ ও মিলিটারীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এইরূপ একটি সশস্ত্র আক্রমণ কিরূপে সংঘটিত হল তার জন্য প্রতিটি সংবাদপত্র বিস্ময় প্রকাশ করে। চট্টগ্রামের "দৈনিক পাঞ্চজন্যে" নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়:

"২৪-৯-৩২ তারিখে রাত্রিতে পাহাড়তলী-ক্লাব আক্রান্ত হয়। সেখানে তখন Whist drive খেলা চলিতেছিল। প্রায় ৪০ জন মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিল। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হইয়া ধূমাচ্ছন্ন হয়। ঘরের বারান্দা ও অন্যান্য দিক হইতে গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। মিসেস সলিভান্ হত ও ১১ জন আহত হয়.

কিছুদূরে পুরুষ বেশে সজ্জিতা একজন রমণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই রমণী প্রীতিলতা বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে। ডাক্তার ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহার কয়েকটি আঘাত সাংঘাতিক এবং অনেকগুলি গুরুতর। প্রীতিলতা "সাইনেড অব পটাশিয়াম" যোগে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন।......তাহার পোষাকের মধ্যে যে ঘোষণা-পত্র পাওয়া যায় তাহাতে সে লিখিয়াছে যে ১৮।৪।৩০ তারিখের সংগ্রামের অনুসরণেই এই সংগ্রাম করা হয়। (The raid was an act of war undertaken in continuation of the fight of 18. 4. 30').

"সেই দিনই চারি রকমের বিপ্লব-সমর্থক ইস্তাহার চট্টগ্রামে বিলি করা হয়। তাতে শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণকে ইংরেজ-শাসন ও ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান করা করা হয়।"—('পাঞ্চজন্য' থেকে উদ্ধৃত)।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের মত একটি বিরাট পরিকল্পনার সাফল্য সরকারকে বিচলিত করে তুললো। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় আক্রমণ চালিয়ে নিমেষের মধ্যে দলের সকলে উধাও হওয়াতে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ আরও বেশী সচকিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

প্রীতিলতার মৃতদেহ পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের ফাটকে রেখে পূর্ব নির্দ্ধারিত পথ ধরে দু'টি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণকারীরা কাট্টলীতে প্রফুল্ল দাসের আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হয়। অস্ত্রাদি সমস্তই প্রফুল্ল দাস নিজের হেফাজতে রাখেন। পান্না ও বীরেশ্বর শহরে ফিরে যায়। কালী, সুশীল, শান্তি ও মহেন্দ্র পতেঙ্গার নদী-ঘাট হ'তে নৌকা যোগে মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে পূর্ব-নির্ধারিত "বন্দর" নামক স্থানে উপস্থিত হয়।

মাস্টারদা ঘটনার পূর্ণ-বিবরণ শুনে তাদের কৃতকার্যতার জন্য অত্যন্ত খুশী হলেন। এই আক্রমণে ব্যবহৃত হাতবোমা গুলি Striker যুক্ত ছিল—তবে, আমরা আগে যেসব Striker যুক্ত বোমা ব্যবহার করেছি তা' থেকে এগুলি বেশী স্বয়ংক্রিয় ছিল। প্রত্যেকটি বোমা কার্যকরী ভাবে বিস্ফোরিত হয় বলে তারকেশ্বরকে মাস্টারদা অভিনন্দন জানান।

এই অভিযানে সকলেই জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছিল সত্য, কিন্তু প্রীতির ঐরূপ স্বেচ্ছা-মৃত্যু তাদের সকলের মন বেদনাতুর করে তুলেছিল। প্রীতিলতার মত বিপ্লবী কর্মীকে হারানো সংগঠনের অপূরণীয় ক্ষতি। ধীর শান্ত ভাবেই মাস্টারদা এই ক্ষতি স্বীকার করে নিলেন।

এই ঘটনার পরে পুলিশ ও মিলিটারী আরও তৎপর হয়ে উঠলো। সরকার মাস্টারদাকে ধরার জন্য পুরস্কারের টাকার অঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিলেন। ক্লাব-আক্রমণের পরে যে-সব ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল তা'তে ইংরেজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়। প্রীতিলতার সঙ্গে সেইরূপ ঘোষণার একটি অনুলিপি পুলিশ পেয়েছিল। সেই অনুলিপির কিয়দংশ চট্টগ্রামের দৈনিক সংবাদপত্র 'পাঞ্চজন্যে' প্রকাশিত হয়েছিল। যথা—"সেই মহান নেতা (মাস্টারদা) যখন আমায় উক্ত আক্রমণের নেতৃত্বভার নিতে বলেন তখন আমি সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এত উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ভাইরা থাকতে আমার মত সামান্য বোনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কেন? কিন্তু মাষ্টারদার অখণ্ডনীয় যুক্তি শুনে আমি বিষয়টি ভাল করে উপলব্ধি করি। আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সর্বময় ঈশ্বররূপে যাঁকে শৈশব হতেই ভক্তি করে এসেছি—তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম যেন অর্পিত দায়িত্ব সসম্মানে পালন করতে পারি।.........
পুরুষেরা যা পারে নারীরা তা পারবে না কেন? নারী সমাজ আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে তারা আর পুরুষদের পশ্চাতে পড়ে থাকবে না।.........

"চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা স্মরণীয় ১৮ই এপ্রিলে এবং তৎপরে জালালাবাদে,

সাহমিরপুরে (কোলার পোল) ফেনীতে, চন্দননগরে, চাঁদপুরে, ঢাকায়, কুমিল্লায় ও ধলঘাটে যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তাতে কেবল বাংলায় নয় সমগ্র ভারতের যুবকদের কল্পনা আকৃষ্ট হয়েছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি। আজকের সংগ্রামও তারই একটি অংশ।"

'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় আরও কিছু কিছু সংবাদ তখন পরিবেশিত হয়। প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে পুলিশ যেসব জিনিস পেয়েছিল তার একটি তালিকাও 'পাঞ্চজন্য' কাগজে ছাপানো হয়—প্রীতিলতার সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে (১) রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের তিনটি ফটো (২) ছয় কপি ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান আর্মির নোটিশ (৩) পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান (৪) শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি। (৫) একটি চামড়ার বেল্ট (৬) তিনটি কার্তুজ (৭) একটি Whistle (৮) তিনটি বিবরণ (৯) তাহার স্বহস্তে লিখিত একটি বিবৃতি।

—('পাঞ্চজন্য' থেকে উদ্ধৃত)।

হাইকোর্টে মাষ্টারদার বিচার সম্বন্ধীয় সরকারী দলিলে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সংক্রান্ত যে সব ঘটনার বর্ণনা দেখা যায় তার মধ্যে এখানে বিশেষ কয়েকটির উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। মুদ্রিত জাজমেণ্ট কপি ২৪১ পৃষ্ঠায় Mr. Batra-র স্বাক্ষ্যে মাননীয় বিচারপতিরা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে দেখছি :—

"......Sir, Batra has proved that there was a whist Drive at the European Institute at Pahartali on 24. 9. 32 and, according to P. W. 29 there were about 40 Ladies and Gentlemen present. About 10. P. M. there was a sudden explosion in the Hall and the room was filled with smoke. Shots were heard and attempt was made to take cover. This witness saw someone firing a gun or rifle on the verandah, and heard reports of firing from other sides of the building. When the firing ceased, I found Mr. Rosario and Mrs. Mac Donald wounded and assisted in giving first aid and taking them to hospital. On return he found that Mrs. Sullivan had been killd and and saw two bombs."

হাইকোর্টের জাজমেণ্টে আমরা আরও একজন সাক্ষীর বর্ণনায় বোমা বিস্ফোরণে ক্লাবঘরের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ পাই :—

"P. W. 36. the officer-in-charege, Double Moorings Thana, got news of the Raid about 11-30 P. M. and proceeded to the Institution. He found the dead body of Mrs. Sullivan and founed the place in a stake of disorder, with the walls, doors and furniture splindered. He found many fragments of bombs and some exploded bombs. He prepared a list of things found in presence of Mr. Nolan P. W. 37."—

"Mr. Nolan found two persons wounded in front of the Institution and the dead body of Mrs. Sullivan. He saw the damage caused to the walls, floor and furniture. He also saw the dead body of an Indian woman dressed in male attire about two yards from the Institute. He learnt latter that she was Pritilata waddader and he was present at the search of her person by P. W. 17."

Mr. Nolan-এর সাক্ষ্য থেকে বিস্ফোরণে মৃত মিসেস সুলিভ্যানের ও প্রীতিলতার বিবরণ পাচ্ছি। সিভিল সার্জেন এবং একজন ডাক্তারের প্রীতিলতার পোস্ট-মর্টম রিপোর্ট সম্বন্ধেও মাননীয় বিচারপতি লিখেছেন :

"P.W. 155 Capt. Sen Gupta who was acting as Civil Surgeon, assisted in an inquest on Mrs. Sullivan, whose death was due, in his opinion, to shock and haemorrhage caused by gunshot wounds. This witness examined also 11 other persons, three ladies and 8 gentlemen, who had all injuries caused, in his opinion, by fragments of bombs or gun-shot. A number of the injnries were dangerous in nature, whilst the large majority were severe.

"P. W. 34 held a postmortem examination on the dead body of Pritilata waddader. The only injury found was··· due to some blunt penetrating substance. An examin

ation of the stomach and intestines indicated that death was due to poisoning and so the stomach and viscera were sent to the Chemical Examiner, whose report is Ex. 57. From this the witness has given his opinion that Pritilata's death was suicidal and caused by cyanide of potassium poisoning."

মাননীয় বিচারপতিদের জাজ্‌মেণ্টে অন্যান্য সাক্ষীদেরও অনেক বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। সব বিবরণগুলিই মোটামুটি একই ধরণের। প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে প্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে প্রীতির নিজের হাতে লেখা একটি বিবৃতি ছিল। জাজ্‌মেণ্ট কপিতে দেখা যাচ্ছে :—

"Lastly there was found a statement in manuscript Ex. 56 which we are satisfied from the evidence of P.W.S. 170 and 48 as well as by one personal comparison which the speciman writing Ex. 328. taken by P. W. 166 to be in the writing of Pritilata. This statement appears to us of much importance that he quote it *in extenso* as follows."

প্রীতিলতার মৃতদেহ তল্লাসীতে পাওয়া বিবৃতিটির উপর মাননীয় বিচারপতিরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের জাজ্‌মেণ্টে বিবৃতিটির পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন। বিবৃতিটি এই :—

"LONG LIVE THE REVOLUTION"

"I solemnly declare I belong to the Chittagong Branch of the Indian Republican Army whose lofty ideal is to liberate my mother country from the yoke of the tyranical exploiting and imperialistic British Government and to establish a Federated Indian Republic instead. This remarkable Chittagong party has captured the imagination of the youths and has given a new impetus to the Revolutionaries of Bengal, nay of the whole of India by its unprecedented display of the memorable 18th April, 1930,

and its subsquent heroic achievements on the holy Jalalabad hill at Samirpur, at Feni, at Chandannagar, at Chandpur, at Dacca, at Comilla and at Dhalghat. I feel proud that I have been thought fit to be a member of such a glorious party.

"We are fighting freedom's battle. To-day's action is one of the items of that continued fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and have played havoc with the lives of millions of Indians both male and female. They are the sole cause of our complete ruin—moral, physical, political and economic —and thus have proved the worst enemy of our country, the greatest obstacle in the way of recovering our independence. So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British Community, offical or non-official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being. In a fight for freedom we must be ready to remove, by any means, whatsoever every obstacle that stand in our way.

"When I was summoned by Great 'Masterda' the venerable leader of my party to join to-day's armed raid I felt myself fortunate enough seeing my long-felt hankering fulfilled and at last accepted the task with full sense of responsibility. But when I was asked by that exalted personality to lead the raid, I felt diffident and protested by saying why a sister should take the lead when so many able and experienced brothers were present. Masterda soon convinced me by his able arguments and I took my leader's command on my head and invoked the all-mighty Father, whom I have adored since my Childhood, to assist me in discharging my grave duty.

"I think I owe an explanation to my conutrymen. Unfortunately there are still many among my countrymen who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of Indian womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives. I wonder why there should be any distinction between male and female in a fight for her cause (*sic*). Instances are not rare that the Rajput ladies of hallowed memory fought bravely in the battle-field and did not hesitate to kill their country's enemies. The pages of history are replete with high admiration for the heroic exploits of these distinguished ladies. Then why should we, the modern Indian women, be deprived of joining this noble fight to redeem our country from foreign domination. If sisters can stand side by side with the brothers in a Satyagraha movement, why are they not be entitled in a revolutionary movement ? Is it because the method is different or because females are not fit to take part in it ? As regards the method, i.e. armed rebellion is not a new method. It has been successfully adopted in many countries and the females have joined it in hundreds. Then why should India alone regards this method as an abominable one ? As regards fitness, is it not sheer injustice to the females that they will always be thought less fit and weaker than the males in a fight for freedom ? Time is come when this false notion must go. If they are yet less fit it is because they have been left behind.

"Females are determined that they will no more lag behind and stand side by side with their brothers in any activities however dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and

will get themselves ready to face all danger and difficulties and join the revolutionary movement in thousands.

"Now I should briefly relate how I was draw into the revolutionary organisation.

"When I was studying in the Matriculation class in the Dr. Khastagir's Girls School, I got an idea of a revolutionary organisation in Chittagong and was told that there was a very powerful man endowed with many qualities befitting a revolutionary leader, at the helm of this organisation.

"During the two years stay at Dacca for my Intermediate Course, I was engaged in preparing myself as a fit comrade of the Great Masterda. However I did not neglect my study and in the year 1930 I passed the Intermediate Examination standing first among girls and fifth in the General competition.

"It was the morning of the 19th April, 1930 when I came home after examination and heard of the glorious activities (of previous night) of the Chittagong heroes. My heart was filled with deep admiration for these great souls. But it pained me much that I could not take part in such heroic exploits and could not have a glimpse of 'Masterda' whom I have adored since I heard his name. The thought of Jalalabad martyrs tinched my heart to its very depth. With such a state of mind I left for Calcutta for my B. A. Degree. The thought of my country was ever predominant in my mind. I saw the tears of mothers mourning the loss of their beloved sons who sacrificed their lives on the alter of freedom.

"With all these a new impetus came to me when I was asked by one of my brothers to visit Ramkrishnada in the Alipure Central Jail where in a solitary cell he was awaiting

extreme penalty meted out to him by the British Law for his love of country. I passed for a cousin sister of Ramkrishnada and anyhow managed to see every day this smart jolly young hero. I had about forty interviews with him before his execution. His dignified look, free conversation, calm surrender to death, sincere devotion to God, childlike simplicity, loving heart, sound knowledge and profound realisation impressed me very deeply and made me ten times more forward then what I have been. The association of this dying patriot made a great contribution to the adornement of my life towards perfection. After Ramkrishnada's execution my hankering after some practical revolutionary action grew more intense. However, I had to pass some months more in Calcutta for my B. A. Examination. In the meantime I tried several times to have an interview with Masterda but failed.

"After my examination in 1932, I hurried towards home with strong determination to interview Masterda anyhow. In a few days my long-cherished desire was fulfilled and I soon stood before Masterda and Nirmalda, the two great personalities guiding the famous Chittagong Revolutionary Party.

"In my short interviews with Nirmalda I recognised his noble and beautiful heart in which staunch revolutionary principles and strong religious temperament so nicely combined. I am fortunate that I got apportunities to come in touch with such a great soul that silently passed away from the world without giving the country-men any opportunity to know how great, how pure, how uncommon it was.

"Nirmalda's tragic end gave me a severe shock and I became more desperate. The reslult of my B.A. Examination

was out by this time and I passed with Distinction. A few days after I plunged myself heart and soul into the revolutionary preparation leaving for good my beloved family.

"Firm faith in my Almighty Father and cordial devotion to Him have been the most valuable treasure tome since my childhood. I have carefully cherished this treasure in my bosom throughout my whole life and to-day when I have come finally prepared to entrace His feet that I have so earnestly hankered, my treasure seems to me more precious, more pleasant and more illuminating. Had not my revolutionary ideal been thoroughly consistent with my devotion to the Almighty I would never been a revolutionary.

"With an invocation to Him, I launch to discharge my to-day's responsibility and pray to Him to purge me clean so that I may be worthy offering to Him."

প্রীতিলতা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে যাওয়ার আগে থেকেই সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিল যে, সে আর কোন মতেই ফিরে আসবে না। ডাক্তারের পরীক্ষার রিপোর্টেও আমরা জানতে পাই বোমার Splinter-এর আঘাতে প্রীতির সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। এ থেকেই মনে হয় আত্মরক্ষার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেপরোয়া ভাবেই প্রীতি আক্রমণ চালিয়েছিল। স্বেচ্ছামৃত্যু-বরণে স্থির সঙ্কল্প হয়েই সে তার জীবনের শেষ বিবৃতিটিও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে সরকারী দলিল থেকে প্রীতিলতার সেই শেষ বিবৃতিটি প্রকাশে সক্ষম হওয়াতে নিজেকে খুব উপকৃত মনে করছি। ক্লাব-আক্রমণ ঘটনার সমকালে বা মাষ্টারদার বিচার চলাকালীন সময়ে সরকারী বিধিনিষেধের কঠোর বেড়াজাল ভেঙ্গে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বিবৃতিটি প্রচারিত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। পূর্ণাঙ্গ বিবৃতিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে বিবৃতিটির হুবহু বাংলা অনুবাদ নীচে দিলাম :

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

"আমি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমি ভারতীয় গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক, এই বাহিনীর উচ্চ আদর্শ

আমাদের মাতৃভূমিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র স্থাপন করা। চট্টগ্রাম শাখার অত্যাশ্চর্য সাফল্য বাংলা দেশের, শুধু বাংলাদেশের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের অবিস্মরণীয় ঘটনা, পবিত্র জালালাবাদ পাহাড়ের সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম এবং পরবর্তী সমীরপুর, ফেণী, চন্দননগর, চাঁদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা এবং ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধ সবই তাদের প্রেরণা দিয়েছে। এইরূপ এক গৌরবোজ্জল সংস্থার সভ্য হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আমি গর্ববোধ করছি।

"আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। আজকের সংঘর্ষও সেই ধারাবাহিক সংগ্রামের একটি অংশ। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর জীবন ধ্বংস করেছে, বহু বছর ধরে আমাদের রক্ত শোষণ করেছে। এইভাবে নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দৈহিক দিক থেকে আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারাই একমাত্র কারণ, কাজেই তারা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এইজন্য আমরা আজ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছি, সে ইংরেজ সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ লোক যেই হোক না কেন। যদিও কোন মানুষের প্রাণ হরণ করা একেবারেই আনন্দের কাজ নয়, তবু স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে কোন উপায়ে পথের সমস্ত বাধা অপসারণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

"আমাদের মহান নেতা মাস্টারদা যখন আজকের সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন, আমি তখন আমার এতদিনের আকাঙ্খা পূর্ণ হতে চলেছে দেখে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করলাম এবং আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে এ ভার গ্রহণ করলাম। কিন্তু সেই মহান নেতা যখন আমাকে এই আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বললেন তখন আমি আমার নিজের শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম, এত অভিজ্ঞ ও শক্তিমান দাদারা থাকতে আমার মত একটি বোনকে কেন এ দায়িত্ব দিতে চাইছেন? মাস্টারদা তাঁর অপূর্ব যুক্তির সাহায্যে শীঘ্রই আমার সন্দেহ ভঞ্জন করলেন এবং আমি আমার নেতার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে আমি ছোটবেলা থেকে পূজো করে এসেছি আজ এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম।

"আমার দেশবাসীর কাছে বোধ হয় আমার কাজের একটা কৈফিয়ৎ

দেওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আজও আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত-পালিত একটি মেয়ে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেছে শুনলে চমকে উঠবেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীপুরুষে ভেদাভেদ কেন থাকবে। চিরস্মরণীয় রাজপুত রমণীরা তো বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন এবং দেশের শত্রুদের বধ করতে একটুও দ্বিধা করেননি! এই সমস্ত মহীয়সী নারীদের প্রশস্তিতে ইতিহাসের পাতা পূর্ণ হয়ে আছে। তবে আমরা, আজকের যুগের মেয়েরা বিদেশী শাসন থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করার মহৎ কাজ থেকে বঞ্চিত হব কেন? সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যদি ভাইবোনেরা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে তবে বিপ্লবী আন্দোলনেই বা পারবে না কেন? এর কারণ কি এই যে, দুটো আন্দোলনের ধারা আলাদা, না মেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনের উপযুক্ত নয়? আন্দোলনের ধারা হিসাবে অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম বলে এ একটা নতুন কিছু নয়। বহু দেশেই এই সংগ্রাম সাফল্যলাভ করেছে। তবে কেন একমাত্র ভারতেই একে নিন্দার্হ বলে মনে করা হবে? সামর্থ্যের কথা যদি ধরা হয় তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের চেয়ে নারীরা কম সক্ষম একথা মনে করা কি অন্যায় নয়? এই ভুল ধারণা দূর করবার সময় আজ এসেছে। মেয়েরা যে এখনও পিছিয়ে আছে তার কারণ—তাদের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে।

"নারীরা এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তারা আর পিছিয়ে থাকবে না এবং সংগ্রাম যতই কঠিন ও বিপদসঙ্কুল হোক না কেন ভায়েদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। আমি আন্তরিকভাবে আশাকরি আমার বোনেরা আর নিজেদের দুর্বল ভাববেন না, এবং ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামে হাজারে হাজারে যোগদান করে সমস্ত রকম বাধা এবং বিঘ্নের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হবেন।

"এখন, আমি কেমন করে বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে এলাম তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবো।

"ডাঃ খাস্তগীর হাইস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়ার সময় আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের কথা জানতে পারি এবং শুনতে পাই যে বিপ্লবী সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত সর্বগুণসম্পন্ন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একজন এই দলের নেতা। ঢাকায়, দু' বছর ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আমি নিজেকে মাষ্টারদার উপযুক্ত সহকর্মী হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য চেষ্টা করতে থাকি।

অবশ্য লেখাপড়ায় আমি অবহেলা করিনি ; ১৯৩০ সালে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সব মিলিয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আমি ইন্টারমিডিয়েট্ পাশ করি।

"১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল আমি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরে আসি এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের (গতরাত্রের) গৌরবোজ্জ্বল কীর্তির কথা শুনতে পাই। এই মহান্ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে ওঠে। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আমি কোন অংশ নিতে পারলাম না বলে, এবং যে মাষ্টারদার নাম শোনার পর থেকেই শ্রদ্ধা করে আসছি তাঁকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না বলে আমার মনে খুব দুঃখ হ'ল। জালালাবাদের শহীদদের জন্য আমার অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। মনের এই অবস্থায় আমি বি. এ. পড়তে কলকাতায় চলে গেলাম। আমার স্বদেশের কথা তখন সর্বদাই আমার মনে জেগে থাকতো। যে সন্তানেরা স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই প্রিয় সন্তান বিচ্ছেদ-বিধুরা জননীদের শোকাশ্রু আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

"মনের এইরকম অবস্থায় আমার এক দাদা আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণ তখন একটি নির্জন সেলে নিজের দেশকে ভালবাসার জন্য চরম দণ্ডের অপেক্ষা করছেন। এই সাক্ষাৎকার আমাকে নতুন উদ্দীপনা এনে দিল। আমি রামকৃষ্ণদার মাসতুতো বোন হিসেবে যেতাম এবং প্রায় প্রতিদিনই আমি এই সপ্রতিভ আনন্দোচ্ছল তরুণ বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। প্রাণদণ্ডের আগে প্রায় চল্লিশ দিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর আত্মমর্যাদাপূর্ণ ভাব, সহজ কথাবার্তা, মৃত্যুর কাছে শান্ত আত্মসমর্পণ, অকপট ঈশ্বর-ভক্তি ; শিশুসুলভ সরলতা, স্নেহপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান ও সুগভীর অনুভূতি আমাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং আগের চেয়ে দশগুণ প্রগতিশীল করে তুলছিল। মৃত্যুপথ-যাত্রী দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্য আমার জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। রামকৃষ্ণদার প্রাণদণ্ডের পরে কোন একটি বাস্তব বৈপ্লবিক অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। অবশ্য, আমাকে আমার বি. এ. পরীক্ষার জন্য আরও ন'মাস কলকাতায় থাকতে হ'ল। এর মধ্যে আমি কয়েকবার মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই।

"১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে কোন উপায়ে মাষ্টারদার সঙ্গে

দেখা করবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসি। অল্প ক' দিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘদিনের আশা পূর্ণ হ'ল, চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের দুই বিখ্যাত নেতা মাস্টারদা ও নির্মলদার সামনে আমি উপস্থিত হ'লাম।

"নির্মলদার সঙ্গে অল্প ক'দিনের সাক্ষাতেই আমি তাঁর চরিত্রে সুদৃঢ় নীতিবোধ এবং গভীর ধর্মবোধের সমন্বয় লক্ষ্য করেছি। আমার সৌভাগ্য যে, আমি এই মহাত্মার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। তাঁর দেশের লোক জানলো না কত বড়, কত পবিত্র, কী অসাধারণ এক মানুষ নিঃশব্দে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন!

"নির্মলদার শোচনীয় মৃত্যু আমাকে তীব্র আঘাত হানলো এবং আমি আরও মরীয়া হয়ে উঠলাম। এই সময় আমার বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুলো এবং আমি ডিষ্টিংশনে পাশ করলাম। এর কিছু কাল পরেই আমি আমার প্রিয় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে এসে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

"শৈশব থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে অখণ্ড বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠসম্পদ। এই সম্পদ আমি সারাজীবন সযত্নে রক্ষা করেছি এবং আজ যখন আমি তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে চলেছি তখন এই সম্পদ যেন আরও সুখকর, আরও মূল্যবান্, আরও দীপ্তিমান বলে মনে হচ্ছে। আমার বৈপ্লবিক আদর্শ যদি সর্বশক্তিমানের ভক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে না পারতো তাহ'লে বোধহয় আমি কখনই বিপ্লবী হতে পারতাম না।

"ঈশ্বরের প্রতি আবাহন জানিয়ে আমি আজকের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি যেন আজ আমাকে মলিনতা মুক্ত করে পবিত্র করে তোলেন, যাতে আমি তাঁর চরণে স্থান পাবার উপযুক্ত হই।"—[প্রীতিলতার ইংরেজী বিবৃতিটির এই বাংলা অনুবাদটি করেছেন—শ্রীমতী নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়]।

"The statements in Ex. 56. also indicate clearly that the Party respon-ible for the Pahartali Raid was the same. Party responsible for the Armoury Raids of April, 1930, and other over acts at Jalalabad, Feni, Chandernagore, Chandpur and Dhalghat, and afford strong confirmation of the belief that conspiracy for waging war was in active

existance and that the Pahartali Raid, to quote the words of this documents was one of the items of that continued fight"

—(Judgement of Surjya Sen, passed by the Honourable High Court—Page 224)

এই উদ্ধৃতিতে দেখতে পাচ্ছি : মাননীয় বিচারপতিরা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণও 'Waging war'—অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মাধ্যমে বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল এই ক্লাব আক্রমণ তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সেই একই জাজমেণ্ট কপির ২৪৫ পৃষ্ঠায় মাস্টারদার পক্ষ সমর্থনকারী মাননীয় ব্যারিষ্টার মহোদয় Argument করেছেন যে, পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ সরকারের বিরুদ্ধে 'Wage war' হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় না—যেহেতু কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে সেই আক্রমণ চালানো হয়নি। বিচারপতিগণ আইনজ্ঞদের এইরূপ argument-এর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নি ; উপরন্তু জোর দিয়ে বলেছেন এই ক্লাব-আক্রমণও His Majesty King Emperor-এর বিরুদ্ধে—'was undoubtedly an act of waging war.'

জজসাহেবেরা তাঁদের জাজমেণ্টের সমর্থনে বিপ্লবীদের ইস্তাহারের উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন :—

…… ……the yoke of the tyranical, exploiting, and imperialistic British Government

—হাইকোর্টের মাননীয় জজদের সিদ্ধান্তে আমরা দেখতে পাই চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল 'imperialistic British Government'-এর বিরুদ্ধে ও তারা 'King Emperor'-এর বিরুদ্ধে 'wage war' অর্থাৎ যুদ্ধ চালিয়েছে। বৃটিশ-সরকার এই সত্য কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেননি। তবু এত বড় একটা সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহকে চারু বিকাশ দত্ত প্রভৃতি লেখকদের বইতে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নামে অভিহিত করা হয়েছে দেখে খুবই আশ্চর্য মনে হয়।

এই সম্বন্ধে হাইকোর্টের মাননীয় ইংরেজ-বিচারকদের জাজমেণ্টের খানিকটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা পড়ে সকলেরই মনে হবে যে-সকল লেখকেরা সজ্ঞানে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে বিকৃতভাবে 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' বলে আখ্যায়িত

করেছেন তাঁরা ইংরেজ জজের জাজ্‌মেণ্টের পরিপ্রেক্ষিতে কতখানি উপহাসের পাত্র হয়েছেন ! জাজমেণ্টে আছে :—

"At the time of argument it was continued that the Raid at Pahartali was not an act of waging war, and stress was laid on the fact that there is no evidence to show that Government Servants were in the Institute at the time of the Raid. One of the persons present, Inspector Mac Donald, was a Government servant. But the question whether Government servants were present or not does not seem to us of any importance. On the clear admissions of Exs. 56, 51, 52, and 54 the outrage was campaign against the lives of every member of the British Community, official or non-official, with the avowed object of liberating India from the yoke of the tyranical, exploiting, and imperialistic British Government and we are clearly of opinion that such a compaign against this portion of the subjects and the Government of His Majesty the King Emperor was undoubtedly an act of waging war. We also satisfied that the persons committing this act of war were members of the same conspiracy which resulted in the Armoury Raid of April, 1930......"

—(Judgement of Surya Sen passed by the Honourable High Court—Page 245)

(একই জাজ্‌মেণ্টের আরও ছ'টি উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি)। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সময় যে চারিটি ইস্তাহার ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্‌লিকান আর্মির নামে প্রচারিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রীতিলতার Statement এবং আর একটি ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল যে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি। 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে এই বিবৃতিটির উল্লেখ আছে। সরকারী দলিল থেকে অপর ছুইটি ইস্তাহারের একটির কপি নিম্নে দেওয়া হোল :—

"In Ex. 52. it is stated that 'The Indian Republican Army

plunges to-day into this bloody revenge and lets the British Rulers know that, however weak and helpless, India will never tolerate these sorts of wanton barbarity with equanimity and silence, and further that 'The Indian Republican Army which had so long aimed at the official chamber alone, declares henceforward a general expedition against the European Community and orders on indiscriminate massacre of European lives and seizure of their goods and property."

—(Judgement of Surjya Sen passed by the Honourable High Court—Page 245)

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারকেরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রচারপত্রটি তাঁদের রায়দানের স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁরা বলেছেন, বিপ্লবীরা ইতিপূর্বে বৃটিশ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা নিয়েছিল বটে কিন্তু পরবর্তী কালে British Community-র স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধেই, প্রতিশোধ নেবার জন্য ও তাদের সর্বপ্রকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার জন্য প্রচারপত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের দিন হতে বিভিন্ন স্থানে বারে বারে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের সম্মান বজায় রাখা যতই সুকঠিন হয়ে উঠলো ততই তারা হিংস্র আক্রোশে শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশবাসীর উপরে রক্তলোলুপ হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো—তাদের অত্যাচার নিপীড়নের মাত্রা পূর্ব ইতিহাসের গণ্ডিকেও ছাড়িয়ে গেল।

সূর্য সেন বুঝেছিলেন ধর্মের কথায় প্রেমের বাণীতে বৃটিশ-দস্যুর হৃদয় পরিবর্তিত করা সম্ভব নয়—তাদের বোঝাতে হবে আমাদের দেশের মা-বোন-শিশুর প্রাণ তাদের মা-বোন ও শিশুদের প্রাণের চেয়ে কোন অংশেই কম মূল্যবান নয়। তাই ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির চট্টগ্রাম শাখা এইরূপ প্রচারপত্রের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেছিল।

জাজ্মেণ্ট কপি থেকে অপর প্রচারপত্রটিও এখানে উদ্ধৃত করলাম :—

Ex 54. is a declaration in the following terms :—

'In presence of our declaration of the 18th April, 1930, we the soldiers of the Chittagong Branch of the

Indian Republican Army launch to-day a campaign against the lives of the members of the British Community—be they official or non official, merchants or peasants. They are the sole cause of our countries (Counyry's !) utter ruin. They are responsible for brutal repression on our countrymen, such as Chittagong, Hijli, Jallianbagh and other similar incidents. They are the worst enemy of our country.

'Our fight for country's freedom has begun long ago. To-days' campaign is one of the links in the chain.

'May god bless us and assist us in our sacred campaign.'

—(Judgement of Surya Sen passed by the Honourable High Court.—Page 245).

উপরোক্ত প্রচারপত্রটিও একই ধরণের। এর বিশেষত্ব কেবল—এতে চট্টগ্রাম, হিজলী, জালিয়ানওয়ালবাগ প্রভৃতি স্থানের বৃটিশ অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু বছর পরে আজ এই সব প্রচারপত্র পড়ে কারও কারও হয়ত মনে হতে পারে বিপ্লবীরা এতখানি "নিষ্ঠুর" না হলেও পারতেন। অন্তরে "আধা-নিষ্ঠুরতার" ভাব পোষণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা চলে না। সত্যিই যদি লড়াই করতে হয় তবে শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন ঘৃণা পোষণ করতে হবে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজন। প্রীতিলতার মত মেয়ে এবং তারই মত শত শত ভাইবোনেদের হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে "নিষ্ঠুর" "নির্দয়" ও "নির্মম" হয়ে ওঠা —সম্ভব নয়। প্রীতিলতা তার শেষ বিবৃতিতে লিখেছে—"So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British Community, official or non-official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being......"—বিপ্লবীরা "নির্মম" "নিষ্ঠুর" নয়। তাদের অন্তরেও স্নেহ, মমতা, প্রেম ভালোবাসার ফল্গুধারা প্রবাহিত। অপরিসীম মমতাপূর্ণ দরদী কোমল হৃদয়গুলিই নিরুপায় পরাধীনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচারে, নিষ্ঠুর উৎপীড়নে,

ক্ষমাহীন আক্রোশ ও সীমাহীন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে আজ কুর্নিশ-কঠোর! চরম আঘাতে শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করে তুলতে, নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা আজ বদ্ধপরিকর!

সশস্ত্র সংগ্রামে শত্রুকে চরম আঘাত হানবার মানসিক প্রস্তুতির জন্য বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, সততা ও সাধনার প্রয়োজন। প্রীতির চরিত্রে কোনটারই অভাব নেই। চরম মুহূর্তে চরম আত্মত্যাগের সংকল্পে প্রীতি দুর্জয় শক্তির অধিকারিণী! সামরিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে আত্মরক্ষায় উদাসিনী প্রীতির হস্ত-ধৃত বিভলভারের মুহুর্মুহু গর্জনে ক্লাব-গৃহ প্রকম্পিত। প্রীতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস নরমেধযজ্ঞের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে কোনমতেই ফিরে আসা চলবে না!

প্রীতির কথা লিখতে গিয়ে আজ বিপ্লবী ফরাসী তরুণী যোয়ান অব আর্কের বিজয়গাথার কথা মনে পড়ছে। ১৪ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগে ফরাসী দেশের অরলিয়েন্ প্রদেশ হতে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান কল্পে যোয়ান্ অব আর্ক ফরাসী-বাসীর অন্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন—পরাধীন দেশবাসীর অগ্নোৎসাহ নির্জীব প্রাণ সজীব করে তোলেন। এই বিপ্লবী যুবতীর বিক্রম ও সাহসে ফরাসীবাসীরা স্বাধীনতার জন্য চরম আত্মত্যাগের সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফরাসী জনগণ দুর্জয় শক্তি নিয়ে এই যুবতীর নেতৃত্বে বিশাল বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৃটিশ শক্তি পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আর চার্লস্ Rheims এর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী বিপ্লবী যোয়ান্ অব আর্কের নির্ভীক নেতৃত্ব ইতিহাসের পাতায় এক অমরগাথা। সীমিত শক্তিতে ও সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে প্রীতির অভিযানের মূল্যায়ন হলেও আমার মনে হয় প্রীতিলতা যোয়ান অব আর্কের অনুরূপ বৈপ্লবিক শক্তি নিয়েই বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে।

এই প্রসঙ্গ আরও মনে করিয়ে দেয় চিতোরে "জহর-ব্রত" কাহিনী। প্রায় পাঁচ মাস কাল চিতোর অবরুদ্ধ। চিতোর অবশ্যম্ভাবী পতনের আশঙ্কায় রাজপুত রমণীরা অনুষ্ঠানপূর্বক "জহর-ব্রতের" আয়োজন করলেন এবং শত্রুর হাতে যাতে লাঞ্ছিত হতে না হয় তার জন্য স্বেচ্ছায় আগুনে আত্মাহুতি

দিলেন। ক্ষতবিক্ষত দেহ প্রীতিলতার স্বেচ্ছা-মৃত্যুবরণও যেন জহর-ব্রতের প্রতিচ্ছবি বহন করে।

গড় কতঙ্গার নাবালক রাজার বিধবা মাতা—রাণী দুর্গাবতী আকবর সেনাপতি আসফ খাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন। যুদ্ধে পরাজিতা বীরাঙ্গনা রাণী শত্রুহস্তে অপমানিতা হবার আশঙ্কায় শাণিত ছুরিকায় নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করেন। বীরাঙ্গনার এই স্বেচ্ছামৃত্যুবরণে বিজয়ী শত্রুদল—সম্পূর্ণ বিজয়গৌরব উপভোগে যেন কুণ্ঠা বোধ করে। তেমনই আজ ইংরেজশত্রুকে উপেক্ষা করেই যেন প্রীতিলতার মৃত্যুনীল নিশ্চল দেহও ভূমিশয্যায় শায়িত!

যোয়ান অব আর্কের অমরগাথা, রাজপুতরমণীদের চির অবিস্মরণীয় জহরব্রত কাহিনী, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরঙ্গনা রাণী দুর্গাবতীর স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ, ইত্যাদি ইতিহাসের পাতায় যেরূপ অমর অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে প্রীতিলতার বীরত্ব-গাথাও স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় সেইরূপ সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতবাসী ভুলবে না রাণী লক্ষ্মীবাইকে—ভুলবে না প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে পরাজিতা লক্ষ্মীবাঈ সিপাহী বিদ্রোহের নেতা তাঁতিয়া টোপির সাহায্যে গোয়ালিয়র অধিকার করেন। গোয়ালিয়র পুনরুদ্ধারে সমবেত বিশাল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে পরাজিতা লক্ষ্মীবাই সিপাহী বিদ্রোহের নেতা তাঁতিয়া টোপির সাহায্যে গোয়ালিয়র অধিকার করেন। গোয়ালিয়র পুনরুদ্ধারে সমবেত বিশাল ইংরেজবাহিনীর বিরুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করেন। প্রীতিলতার কাহিনী আমাদের মনে লক্ষ্মীবাঈয়ের স্মৃতি জাগরুক করে তোলে—লক্ষ্মীবাঈয়ের পাশা-পাশি প্রীতিলতার ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে!

ইণ্ডিয়ান্ রিপাবলিকান্ আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবীরা এত আকস্মিক ও সুষ্ঠুভাবে ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রমণ সম্পন্ন করেছিলেন যে, ইংরেজ-সরকারের পুলিশ ও মিলিটার প্রাণপন চেষ্টা সত্ত্বেও প্রীতিলতা ভিন্ন অ্যাক্শানে আশ্রয়-গ্রহণকারী অন্য কারও সন্ধান মিললো না। স্যার চার্লস্ টেগার্ট ও মিঃ লোম্যানের সৃষ্ট ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টও তাদের সমস্ত বুদ্ধি খরচ করে এবং বিপ্লবী দলে নিযুক্ত নিজেদের এজেণ্ট মারফত শত চেষ্টা করেও ক্লাব আক্রমণকারীদের পরিচয় বা নাম-ঠিকানা আবিষ্কারে সক্ষম হলো না।

এই আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুশীল দে, কালী দে ও শান্তি চক্রবর্তীকে অন্যান্য বিভিন্ন চার্জে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ষড়যন্ত্র বা আর্মিস্ এ্যাক্ট অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের আইনের বিচারে দণ্ডিত হয়ে তারা আন্দামানে নির্বাসিত হয়। এদের মুখেই আমরা এই ক্লাব আক্রমণের বিস্তারিত জানতে পারি। মহেন্দ্র চৌধুরী, বীরেশ্বর রায়, পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস প্রমুখেরাও অন্যান্য ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত মামলায় বা বিনা বিচারে আটক বন্দী হয়ে জেলে প্রেরিত হন।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারীরা প্রায় সকলেই অন্যান্য বিভিন্ন চার্জে একে একে বন্দীত্ব বরণে বাধ্য হলেন—কেউ দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হলেন, কেউ-বা বিনা বিচারে জেলে আটক হয়ে রইলেন। এছাড়াও ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার আরও অনেকেই পুলিশের হস্তে বন্দী হলেন। সকলেরই জানা আছে যে—কোন একটা ঘটনার অনুসন্ধানে পুলিশ একসঙ্গে অনেককেই গ্রেপ্তার করে থাকে, এবং তারা প্রলোভন দেখিয়ে, নানা অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে ও নানাভাবের কথোপকথনের মাধ্যমে বন্দীদের কাছ হতে ঘটনার মূলসূত্র ও রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

চট্টগ্রামে এইরূপ ব্যাপক ও অতন্দ্র পুলিশী ব্যবস্থা কায়েম থাকা সত্ত্বেও সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রান্ত হওয়াতে Scotland Yard trained পুলিশদের পক্ষে এই শোচনীয় পরাজয় মেনে নেওয়া দুঃসহ অপমান-জনক হয়ে দাঁড়ালো। ক্লাবের সদস্যদের এইরূপ নির্মমভাবে আক্রমণকারী সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের কি উপায়ে গ্রেপ্তার করা যায় তার জন্য পুলিশবাহিনী নতুন উদ্যমে ব্যাপকভাবে জাল বিস্তারে উদ্যোগী হয়ে উঠলো। এই ঘটনার পরে পুলিশের তৎপরতা যে সহস্রগুণ বেড়ে যাবে সে সম্বন্ধে মাস্টারদার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাই সীমিত শক্তি নিয়েও তিনি এই পুলিশী তৎপরতা প্রতিহত করবার জন্য সকল প্রকার সম্ভাব্য চেষ্টার ক্রটি রাখলেন না। দলে নতুন রিক্রুট সংগ্রহের ব্যাপারে যত রকম সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন বিভিন্ন সংগঠকদের কাছে তার নির্দেশ পাঠালেন। ক্লাব-আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশ-গ্রহণকারীরা এবং বিশেষ কর্তব্যভার নিয়ে সাহায্যকারীরা ব্যতীত কাদের দ্বারা ক্লাব আক্রান্ত হয়েছিল ঘূণাক্ষরেও আর কেউ তা জানতে পারলো না। অন্যান্য বিভিন্ন case-এ ক্লাব-আক্রমণকারীরা যখন ধরা পড়ে গেল, মাষ্টারদা তখন আরও কঠোর নির্দেশ দিলেন কারও মুখ থেকে ভুলেও যেন ক্লাব-আক্রমণে অংশগ্রহণকারীদের নাম উচ্চারিত না হয়। এই নির্দেশ যে

অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছিল তা'তে কোন সন্দেহই নেই, কারণ শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-সরকার ক্লাব-আক্রমণকারীদের কারও হদিশ পায়নি। জেল থেকে বেরিয়ে আমরা এদের নাম প্রকাশ করবার আগে পুলিশের পক্ষে এদের পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

আমরা কেউ যদি মনে করি মাষ্টারদা সদস্যদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন— "এই আক্রমণসংক্রান্ত ব্যাপারে তোমরা কেউ মুখ খুলবে না," আর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সেই নির্দেশ মেনে নিল—এটা অত সহজ ব্যাপার নয়। মাষ্টারদা যাদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে ছিলেন এবং যারা এইরূপ কঠোর দায়িত্বপূর্ণ নির্দেশ পালন করেছিল, তাদের সকলকেই প্রথম সারির বিপ্লবী হিসাবে আগে থেকেই যদি শিক্ষিত ও প্রস্তুত করা না হোত তবে মাষ্টারদা বা অন্য কোনও মহা বিপ্লবীর "নির্দেশও" নির্দেশই থেকে যেত—কখনই আর তা' বাস্তবে রূপায়িত হোত না।

আন্দামানে থাকাকালে বিশ্ব মহানায়ক লেনিনের লেখা পড়ে জানতে পারি যে, তাঁর Central Committeeতে বিশ্বাসঘাতক মেলিনভ্স্কি সবার চোখে ধুলো দিয়ে সদস্য হিসাবে বহু দিন পর্যন্ত ছিলেন। লেনিন লিখেছেন —" · that malinovosky could not do the greatest mischief because of efficient co-ordination of legal and illegal activities." সূর্য সেনের নেতৃত্বে জনসাধারণের সংগঠন বলতে যা' ছিল তা' ছাত্র, যুবক ও বিভিন্ন সমর্থকদের সংগঠন। আমরা যেমন এই আইনসম্মত সংগঠন বজায় রাখতে চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনি আবার বিপ্লবীদের নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক গোপন সংগঠনও প্রথম থেকেই আমাদের গড়ে তুলতে হয়েছে। সূর্য সেনের নেতৃত্বে এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর Compact core of Revolutionaries প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছিল বলেই—কে বা কাহারা ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুর্নোর আক্রমণকারী এবং কুমিল্লার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট মিঃ এলিশনও বা কার গুলীতে নিহত হয়েছিলেন আর কারাই-বা ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রমণ করেছিল পুলিশের পক্ষে প্রাণপাত করেও এইসব ঘটনার সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। সূর্য সেনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যই হোল পুলিশ ইন্টেলিজেন্সের পরাজয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের সাফল্য।

কেবলমাত্র সংগঠনের কার্যকলাপ আরও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালনা করবার নির্দেশ দিয়েই মাস্টারদা ক্ষান্ত ছিলেন না। দলে যদি কোন বিভীষণ

থাকে তবে প্রয়োজনের খাতিরে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হলেও 'বিশ্বাসঘাতকের পরিত্রাণ নেই'—দলের ভিতর এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আমাদের বিপ্লবী দলের একজন সদস্যের গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিল। তার অজান্তে তার উপরে সজাগ দৃষ্টি রাখা হোল। হিমাংশু ভৌমিকের (ডাক নাম—রাজা) উপর ওই সদস্যটির গতিবিধির সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তার প্রতি চরমদণ্ড বিধানের ভার ন্যস্ত হোল। বলিষ্ঠ দেহ হিমাংশু সকলেরই প্রিয় পাত্র এবং মাস্টারদার অত্যন্ত বিশ্বাসভজন নিষ্ঠাবান কর্মী। সাথীদের কাছে হিংমাংশু তার মনোভাব জানালো—"যদি প্রমাণ পাই এই সদস্যটি পুলিশের সঙ্গে গোপন সংযোগ রেখেছে ও বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে তবে তার আর নিষ্কৃতি নেই। আমি তাকে গলা টিপেই মেরে ফেলবো।"

আমাদের বিপ্লবী সাথীরা কিছুদিনের মধ্যেই সুনিশ্চিতভাবে জানলো যে, সেই সদস্যটি পুলিশের চর। হিমাংশুর হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হোল। তার সবল বাহু দুটি চঞ্চল হয়ে উঠলো—বিশ্বাসঘাতকের বেঁচে থাকবার অধিকার নেই—আর কালবিলম্ব নয়। একদিন অন্ধকার রাত্রে গ্রামের পথে হিংমাশুর হাতে প্রাণ দিয়ে তাকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হোল। এই ক্ষুদ্র প্রাণটি নিতে পিস্তলের একটি গুলীও খরচ হয়নি শাণিত ছোরার ব্যবহার বা আঘাতের জন্য লোহার ডাণ্ডারও প্রয়োজন হয়নি—হিংমাশুর সবল হস্তের নিষ্পেষণেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঐ বিশ্বাসঘাতক তার পুরস্কারের দৃষ্টান্ত রেখে পথের ধুলায় নিথর নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো।

ইংরেজ সরকারের পুলিশ বার বার এইভাবে অপদস্ত হয়ে অক্ষমতার গ্লানি ঢাকতে আরও মরিয়া হয়ে উঠলো। কারও উপর একটু সন্দেহ হওয়া মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করতে লাগলো। যে সব থানায় ও গ্রামে বিপ্লবীদের আনাগোনা আছে বলে সন্দেহ সেই সব স্থানে ছাত্র-যুবক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সকলের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে নানাভাবে তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলো। সকল কর্মকাণ্ডের হোতা সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে কেবল ছাত্র ও যুবকদের উপর আন্দাজে এইরূপ অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে গেলেই যে বিপ্লবী সংগঠনকে কোনমতেই খর্ব করা সম্ভব হবে না—এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মাস্টারদার মস্তকের মূল্য অনেক বেড়ে গেল। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হোল—জীবিত বা মৃত যেভাবেই হোক্ সূর্য সেনকে চাই-ই—যে ধরিয়ে দিতে পারবে বৃটিশ সরকার তাকে দশহাজার

টাকা পুরস্কার দেবেন। কেবল এই নয়, গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে এই পুরস্কারের কথা প্রচারিত হোল। সূর্য সেনের ফটো সমেত সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রচারপত্রে বড় বড় গ্রাম, বাজার, রাস্তা, কোর্ট-কাছারী, রেল-স্টেশন, প্রভৃতি ছেয়ে গেল। এই প্রলোভনের কাছে শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউ আত্ম-বিক্রয় করতেও পারে এই আশঙ্কায় জনসাধারণ খুবই আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলো। তা' ছাড়া সরকার অমানুষিক কঠোর দমন-নীতি চালিয়ে বিপ্লবীদের সমর্থকদের বহুবার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে—যদি ফেরারী বিপ্লবীদের কেউ আশ্রয় দেয় তবে তাদের আর পরিত্রাণের কোন পথ থাকবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু সমর্থক ভিটে ছাড়া হয়ে হাজতবাসী হলেন। কিন্তু সরকারের এইরূপ কঠোর দমন-নীতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও মাস্টারদা সব সময়েই নতুন নতুন সমর্থক ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল লাভে সক্ষম হয়েছেন।

ভয় ভাবনা ছেড়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে কত দরদী পরিবার যে মাস্টারদাদের আশ্রয় দিয়েছেন তার সীমা নেই। বড় বড় অক্ষরে সংবাদপত্রে নাম প্রকাশিত হওয়ার কোন কল্পনাই এইসব অগণিত দরদী সমর্থকদের মনে স্থান পায়নি। সেই সব মহৎ অনামী বিপ্লবীদের স্বার্থত্যাগ, সাহস ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের একনিষ্ঠ অবদানের কথা জানাও সম্ভব নয়। তাঁদের সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি খুব সামান্য হলেও তা' এখানে প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য বলেই মনে করছি।

নিজেদের ভিতর বিভিন্ন আশ্রয়স্থলগুলির বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৩ সাল থেকে সাথী অর্দ্ধেন্দু দত্ত ও তার পিতা ভারত দত্ত তাঁদের বাড়িটি বিপ্লবীদের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাথী অর্দ্ধেন্দু দত্ত সম্বন্ধে ইতিপূর্বে "অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" পুস্তকে লিখেছি। যুব বিদ্রোহের পূর্বে জেল হতে এসে এই অর্দ্ধেন্দু দত্তের সঙ্গেই আমি প্রথম সংযোগ স্থাপন করেছিলাম। অর্দ্ধেন্দু দত্ত বিপ্লবী সাথী তারকেশ্বর দস্তিদারের বন্ধু ও সহপাঠী। ১৯২৪—২৮ সালে, আমরা জেলে থাকাকালীন তারকেশ্বর ও অর্দ্ধেন্দু'র উপরেই সংগঠন পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। অর্দ্ধেন্দু দত্তের হেফাজতেই আমাদের চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী দলের অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত ছিল। স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালে একবার খুব গোপনে অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে তার বাড়ীতেও আমি যাই। বোয়ালখালি থানার "বিদুগ্রামে" অর্দ্ধেন্দুর পিতা ভারত দত্তের বাড়ী। ফেরারী অবস্থায় মাষ্টারদা এই বাড়ীটির নামকরণ করেছিলেন—"কেবিন"; মাষ্টারদা এই "কেবিন" শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন।

আমাদের অপর একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল পটিয়া থানার "হাবিলাশ" দ্বীপের অন্তর্গত। সাথীদের কাছে এই আশ্রয়স্থলটি "Amiable Lodge" নামে পরিচিত। এই বাড়িটির মালিক রমণী চৌধুরী। তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে সরকার তাঁর বাড়িটি ভেঙ্গে চুরমার করেন ও তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই বাড়িটি পুলিশ থানার খুবই সন্নিকটে। থানার নিকট বর্তী হওয়ার সুযোগে রাইফেলের গুলীতে আহত শান্তি চক্রবর্তীকে এই বাড়ীতেই রাখা ও তাকে সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

হাবিলাশ দ্বীপের আর একটি বাড়ীও মাস্টারদাদের নিরাপদ আস্তানা হিসাবে ব্যবহৃত হোত। মাস্টারদা সেই বাড়ীর নাম দিয়েছিলেন "Safety shelter"। এখানেও তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন। পুলিশ থানা পটিয়ার অন্তর্গত "গৈরলা" গ্রামের শান্তি ঘোষের বাড়ীও ফেরারী বিপ্লবী ফৌজের আশ্রয়স্থল ছিল। এই আস্তানাটির নাম দেওয়া হয়—"Happy Lodge" (বাড়ীর সামনে কোন Name plate-এ যে এইরূপ নাম যে লেখা থাকতো তা নয়, মাষ্টারদা নিজেদের ভিতর এইরূপ নাম ব্যবহার করতেন)। এই 'Happey Lodge" আস্তানাতেই বোমায় ব্যবহৃত পিক্রিক্ অ্যাসিড্ তৈরী করা হোত।

পুলিশ-ষ্টেশন পটিয়ার "বলবাট" গ্রামে "মাতাজীর আশ্রয়" নাম দিয়ে আর একটি বাড়ীও মাষ্টারদারা আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই বাড়ীটি ছিল সাবিত্রী মাসীমার। এখানেই পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন কোমারন্, নির্মলদা ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়, মাষ্টারদা ও প্রীতি-লতা চতুর্দিকে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে উধাও হন ও বোয়ালখালি পুলিশ ষ্টেশনের "জ্যৈষ্ঠপুর" গ্রামে একটি বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এই বাড়ীটির নাম-করণ হয়—' কুটির"। একই আশ্রয়স্থলে বেশীদিন ফেরারী জীবন অতিবাহিত করা কোন সময়েই সুবিধাজনক নয়। কাজেই মাষ্টারদাদেরও থাকবার জায়গা বদলের প্রয়োজন দেখা দিত। একই গৃহে হয়ত বার বার তাঁরা ফিরে ফিরে এসেছেন, কিন্তু একটানা বহুদিন একস্থানে থাকা সমীচীন মনে করেন নি। আমাদের দরদী সমর্থকদের মধ্যে একজনের বাড়ী ছিল আনোয়ারা থানার "পরৈকোড়া" গ্রামে। গৃহস্বামীর নাম ছিল রমণী চক্রবর্তী। এই বাড়ীটির নাম দেওয়া হয়েছিল "কপালকুণ্ডলা"। কেন, কিসের জন্য বা কি ভেবে এইরূপ নামকরণ হোত এবং কেই-বা প্রথম এই সব নাম দিতেন ও তারপর থেকে কেমন করে সেই নামগুলিই দলের সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত

হোত তার সবিশেষ বিবরণ আজ আর আমার মনে নেই। একটি বাড়ীর নাম যেমন "কপালকুণ্ডলা" দেওয়া হয়েছিল তেমনি—"কালী মা" বলেও তাঁরা আর একটি আশ্রয়স্থলের নাম দিয়েছিলেন। শেষোক্ত আশ্রয়স্থলটির কর্ত্রী ছিলেন ক্ষীরোদাবালা বিশ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে অত্যন্ত 'কঠিন' ও ভয়ঙ্করা মনে হোত, কিন্তু তাঁর স্নেহ-মমতা ও আতিথেয়তার তুলনা ছিল না। প্রথম দৃষ্টিতে সকলে তাকে ভয় পেত বলেই হয়ত এই বাড়ীটি "কালীমা" নামে অভিহিত হয়। এইরূপ বহু বাড়ী মাস্টারদারা ব্যবহার করতে পেরেছেন। সেইসব দরদী বন্ধুরা নিজেদের জীবন বিপন্ন জেনেও বিপ্লবীদের সর্বতোভাবে কেবল যে সাহায্যই করেছিলেন তা' নয়, এছাড়াও এমন এমন অবস্থারও সম্মুখীন হয়েছিলেন যাতে পাড়া-প্রতিবেশীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াও তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

একেই তো চতুর্দিকে বিপদ লেগেই আছে, তার উপরেও আবার নতুন বিপদ এসে জুটলো। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বীরেন দে, মাস্টারদাদের একটি গোপন আশ্রয়স্থলে ফেরারী জীবন অতি-বাহিত করছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও অস্ত্রশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের জন্য মাঝে মাঝে নতুন সদস্যেরা এই বাড়ীতে আসতো। প্রাথমিক অস্ত্রশিক্ষা কালে একজন সদস্য একটি দুর্ঘটনা ঘটায়—অসাবধানতাবশে রিভলভারটি হঠাৎ "ফায়ার" হয়ে যায় এবং বীরেন দে রিভলভারের গুলীতে দারুণভাবে আহত হয়। বীরেনের জঙ্ঘার অস্থি চুরমার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা কোনমতেই সম্ভব হলো না। ফলে ক্ষতস্থানটি সেপ্‌টিক্ হয়ে তিন দিনের দিন বীরেনের মৃত্যু ঘটে। বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর মৃতদেহ যেমন কাট্টলীর সমুদ্রতীরে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে বীরেন দের মৃতদেহও চট্টগ্রামের কোন এক নির্জন স্থানে সেভাবেই গোপনে সমাধিস্থ হলো। অসাবধানতাবশে আমাদের মধ্যে আরও একজনকে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, তার নাম—সুকুমার কানুনগো। তার মৃতদেহও অনুরূপ ভাবেই কোন এক নির্জন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

এখন "স্যানাটোরিয়াম্" নামক আশ্রয়স্থলের ছোট্ট একটি ঘটনার কথা বলি। এই আশ্রয়স্থলের গৃহস্বামী মহেন্দ্র বিশ্বাস—বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে। মহেন্দ্রবাবুর দু'টি ছেলে—দু'টিকেই তিনি মাস্টারদার নেতৃত্বে স্বাধীনতার যুদ্ধে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর উদ্ভট কল্পনা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার কোন তুলনা ছিল না। মাস্টারদাকে চিরকাল আশ্রয় দেবার গৌরবের অধিকারী তিনি

হবেন—এই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। উৎসাহভরে তিনি মাস্টারদা ও অন্যান্য বন্ধুদের বলতেন, মাস্টারদার ঘর থেকে একটা সুড়ঙ্গ কেটে সুড়ঙ্গের মুখটি বাইরের নিরাপদ রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে যাবেন—এই ব্যবস্থাতেই পুলিশের পক্ষে মাস্টারদাকে বন্দী করা কঠিন হবে। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার সুযোগ ও সুবিধা যদি তাঁকে দেওয়া যেত তবে কে জানে হয়ত-বা তাঁরই ব্যবস্থানুযায়ী পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে মাস্টারদা শেষ বারেও নিষ্কৃতি পেতেন। বোয়ালখালি থানার "কানুরখিল" গ্রামে এই মহেন্দ্রবাবুর বাড়ী। এখানে কেবল মাস্টারদাই যে আত্মগোপন করে থাকতেন তা' নয়, অন্যান্য ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুরাও আশ্রয় নিতেন। মহেন্দ্রবাবুর দুই ছেলে—এক ছেলের নাম সুশীল বিশ্বাস, আরেকটির নাম আজ আর মনে নেই। এই বাড়ীতেই একদিন রাত্রে অতর্কিতে পুলিশ হানা দেয়। শান্তি সেন (বর্তমানে ইতিহাসের অধ্যাপক), ধীরেন দাস ও যুব বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী বিনোদ দত্ত সেইদিন রাত্রে সেই বাড়ীতে উপস্থিত ছিল। পুলিশের এই অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ করে বিনোদ দত্ত ও ধীরেন দাস পলায়নে সক্ষম হয়। দুই পক্ষেই গুলী চলে। পুলিশের গুলী বিনোদ ও ধীরেনকে স্পর্শ করেনি—অন্ধকারে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে শান্তি সেন ও আমাদের দরদী বন্ধু গৃহস্বামী মহেন্দ্র বিশ্বাস ও তাঁর দুই ছেলে পুলিশের হাতে বন্দী হয়। পুলিশী বিক্রমে মহেন্দ্রবাবুর গৃহটি ধূলিস্যাৎ হল জেল ও বিচারে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল। চট্টগ্রাম জেলে জেল-শাসনের প্রতিবাদে মহেন্দ্রবাবু অনশনে মৃত্যু বরণ করলেন। বিপ্লবীরা কিভাবে এই মহান্ আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইতিহাসবিদেরা কিভাবে এই মহান্ বিপ্লবী চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন করবেন, তা আমার জানা নেই। তাঁর বিপ্লবী নিষ্ঠার প্রতি অন্তরের অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রান্ত হওয়ার পর চট্টগ্রামের পরিস্থিতি একেবারে নতুনরূপ পরিগ্রহ করলো। চট্টলবাসী তথা ভারতবাসী আর কখনও যাতে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তোলার দুঃসাহস না করে দেশ-বাসীকে সেই চরম শিক্ষাদানের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর হলেন। দু'শো বছরেরও

অধিককাল সাম্রাজ্যবাদীশাসনের যে নগ্নরূপ ভারতবাসীকে উৎপীড়িত ও আতঙ্কিত করে রেখেছে, ক্রোধোন্মাদ শাসকসম্প্রদায়ের সেই দানবিক প্রতি-হিংসার বীভৎস তাণ্ডবে চট্টগ্রামের আকাশ-বাতাসমথিত হয়ে উঠল! অত্যাচারে উৎপীড়নে, দেশবাসী বিপন্ন পর্যুদস্ত—কত পরিবার ভিটে ছাড়া—গৃহহারা।

এইরূপ নিদারুণ অবস্থায় বিপ্লবী দলপতিদের সম্মুখে মাত্র দু'টি পথ খোলা —হয় তাঁরা ভারতবর্ষের বাইরে জাপান, চীন, রুশ, ইংল্যাণ্ড বা মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণান্তে বিপ্লবী ঐতিহ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবেন, নয়তো নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করে যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করবেন। মহানায়ক সূর্য সেনের অন্তরে বিপ্লবের আগুন শত সহস্রগুণ অধিক তীব্রতায় জ্বলে উঠলো! জাপান, চীন বা বিদেশের কোন রাজ্যই নিরাপত্তার জন্য তাঁকে আকর্ষণ করলো না! সহস্র বাধা-বিঘ্নও ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে অন্ধকারের বুক চির বিপ্লবী মশাল হস্তে ইংরেজ-সরকারকে আঘাতের পর আঘাত হানবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় অটল সূর্য-সেনের অন্তরে চট্টগ্রামের বিপ্লবী হেড-কোয়ার্টাব পরিত্যাগ করার চিন্তাও কোন রেখাপাত করলো না।

বাংলার বুকে অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ বিপ্লবী তরুণী বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা। প্রীতিলতার আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার অমর কাহিনী বর্ণনায় আমরা যেমন গর্ব বোধ করি ঠিক তেমনি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রায় একবছর আগে বাংলার দুইটি কিশোরীর দুঃসাহসিক অভিযানের স্মৃতি ও আমাদের মনে অম্লান হয়ে আছে। বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীর রিভলভারের অব্যর্থ নিশানায় কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ ষ্টিভেন্সকে প্রাণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। নিম্ন আদালতে এই দুই বিপ্লবী কিশোরীর ফাঁসির হুকুম হয়; কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কা না হওয়াতে হাইকোর্টের বিচারপতিরা চরম দণ্ডের পরিবর্তে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। স্যার স্ট্যানলি জ্যাক্সন্ ও লর্ড আরউইনের পরিবর্তে সেই সময়ে যদি বড়লাট লর্ড উইলিংডন এবং বাংলার গভর্নর স্যার জন এণ্ডার্সনের আধিপত্যকাল হোত তবে কেবল "নাবালিকা" কেন, তাঁরা যদি দুগ্ধপোষ্য শিশুও হতেন, আজ আমরা তাঁদের শহীদ বেদীতেই মাল্য প্রদানে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হতাম। শান্তি-সুনীতি প্রথম শহীদ নহেন সত্য, কিন্তু বাংলার বিপ্লবী নারীদের মধ্যে প্রথম সার্থক সশস্ত্র পদক্ষেপ তাঁদেরই!

তারপর, যদিও বীণা দাসের লক্ষ্যভ্রষ্ট রিভলভার কন্‌ভোকেশন অনুষ্ঠানে স্যার স্ট্যান্‌লি জ্যাক্‌সনকে বুকের রক্তে ভারতবাসীর রক্তঋণ পরিশোধের সুযোগ দিল না—সুনিশ্চিত মৃত্যু হতে তিনি পরিত্রাণ পেলেন, তবু সেদিনের বীণা দাসের বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। এই সকল অগ্রবর্তী বলিষ্ঠ আদর্শ অন্তরে গ্রহণ করেই প্রীতিলতা দুঃসাহসিক ও চরম আত্মত্যাগের শীর্ষ-সোপানে অধিষ্ঠিতা।

প্রীতিলতার শৌর্য-বীর্যের অমর গাথা সীমিত গণ্ডির ব্যবধানে যোয়ান্‌ অব আর্ক, রাণী দুর্গাবতী, ঝাঁন্সির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সমকক্ষ বললে অত্যুক্তি হয় না। কঠোর মিলিটারী শাসনের মধ্যেও পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দুঃসাহসিক অভিযান কাহিনী, ১৮ই এপ্রিলের যুব-বিদ্রোহের সাফল্য ও ২২শে এপ্রিলের জালালাবাদ যুদ্ধ জয়ের গৌরবোজ্জ্বল বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্বলতা ও শিক্ষা, যতই মর্মান্তিক বা আমাদের পরিপন্থী হোক না কেন, তা' প্রকাশে পরাঙ্মুখ হলে সার্থক ইতিহাস হবে না। লেখার এই ধারার সামঞ্জস্য বজায় রেখে ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণের বিপ্লবী সাফল্য ও নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধেও সঠিক মূল্যায়ন করতেই হবে। যাত্রার আসরে, থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে, সিনেমার পর্দায় বা সভামঞ্চে যেভাবে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়—বিপ্লবী ঐতিহ্যের কথা বলে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায়, সেই গণ্ডিতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের বর্ণনা সীমাবদ্ধ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। "কাঁপাইরা আত্রবণ কাঁপাইয়া রণস্থল উঠিল সে ধ্বনি।" 'মুহুর্মুহু কামান গর্জনে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে পনেরো মিনিট ধরে অবিরাম বোমা, মাস্কেট্রি ও রিভলভারের গুলী চল্‌লো এবং ক্লাব-গৃহে উপস্থিত ইংরেজ স্ত্রী পুরুষকে ক্ষত-বিক্ষত করে বিপ্লবী যুবকেরা অন্তর্হিত হোল।"— এইরূপ চমকপ্রদ বিবরণ দিয়ে গল্প শেষ করতে আমার কলম বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। যেভাবে ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের ঘটনার মূল্যায়ন করেছি ও তা' থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছি, সেইভাবেই পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ থেকেও বিপ্লবী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করবো।

(১) প্রথমবার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বভার বিপ্লবী শৈলেশ্বরের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু 'জগতের কিছুই ভাল লাগে না'—এই প্রকার বিবাগী মনোভাব কোন মতেই একটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণকারী নেতার উপযুক্ত নয়। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে কখনও একটি দুঃসাহসিক কাজে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি

একজন বিপ্লবী সৈনিক হিসাবেও নিজ দায়িত্বটুকু পালনেও সম্পূর্ণ অপারগ। শৈলেশ্বর সেদিন এই আক্রমণের কর্মসূচী পরিত্যাগ করে বাড়ী ফিরে আত্মহত্যা করেছিল।

(২) সেইদিন ক্লাব-গৃহ আক্রমণ করা হোল না কেন? আক্রমণে কি বাধা ছিল? নিরস্ত্র ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ প্রতিদিন যেমন আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকে সেইদিনও ক্লাবের আমোদকক্ষে তারা পানাহার ও নাচে-গানে মত্ত ছিল। বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিপ্লবীরা তাদের আক্রমণ করবে—এই অবস্থায় আক্রমণে অসুবিধা বা বাধা কিসের? হঠাৎ কোন সৈন্যদল প্রহরায় মোতায়েন হলে বাস্তবে নিশ্চয়ই বাধার সৃষ্টি হোত, কিন্তু সেইরূপ কোন ঘটনাই তো সেদিন সেখানে ঘটেনি। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে বলে যার সাঙ্কেতিক নির্দেশ দানের কথা ছিল সময়মত সেই সঙ্কেতও সে পাঠিয়েছিল।

(৩) এই আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীদের মুখেই শুনেছি যে, তারা আতঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্থ মনে সেইদিন ফিরে এসেছিল।

(৪) দ্বিতীয়বার সেই সাতজন বিপ্লবী প্রীতিলতার নেতৃত্বে ঐ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্য এগিযে গেল। শত্রুর সম্মুখীন হতে প্রীতিলতার মনে ভয়-ভাবনার লেশমাত্র ছিল না। বুলেট ও বিস্ফোরণের মাঝে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণে আর শান্ত পরিস্থিতিতে নিজের শয্যায় শুযে মৃত্যুবরণে মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ ভয়ঙ্কর রূপও মৃত্যুভীতিহীনা প্রীতির মনে শঙ্কা জাগাতে পারেনি। এই সংগ্রামীদলটিকে নিযে অসম সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গেই ক্লাব গৃহ আক্রমণে সে এগিয়ে গিয়েছিল। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব না থাকলে এইরূপ চরম আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসিক কর্মসূচী নিযে বিপ্লবীরা বাস্তবে কখনও এগিযে যেতে পারে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

(৫) চতুর্দিক বন্ধ একটি ঘরের তিন দিক হতে আকস্মিক আক্রমণের বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, রিভলভার ও মাস্কেট্রি হতে গুলীও চলেছিল সত্য, কিন্তু শেষ পরিণতিতে দেখতে পাই বোমার টুক্‌রোর আঘাতে বা shock-এ ইংরেজদের মধ্যে একমাত্র মিসেস্ সুলিভানই প্রাণ দিয়েছেন। অন্যান্য দশ বারোজন সামান্য আহত হয়েছেন বটে কিন্তু কাউকে হাসপাতালেও থাকতে হয়নি। দু'টি তাজা বোমা অবিস্ফারিত অবস্থায় সেই ঘরেই পড়েছিল। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা যদিও কঠিন সত্য, তবু কেমন করে এটা সংঘটিত হোল?

(৬) কোন প্রকার যুক্তির অবতারণা করে বা বিভিন্ন "কারণে" সাফাই গেয়ে এই বিপ্লবীদলের আত্মপক্ষ সমর্থন করা চলবে না; নিজেদের দুর্বলতা

স্বীকার করতেই হবে—ভয়, আতঙ্ক ও মৃত্যু-বিভীষিকাই যে তাদের বিচলিত করেছিল তা'তে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। ভয়ে আমাদের হাত কেঁপেছিল—অন্তরের সাহস হারিয়েছিলাম—প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছাটাই প্রবল ও প্রধান স্থান অধিকার করেছিল—একথা নিঃসন্দেহে নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—বলা উচিৎ!

(৭) যে প্ল্যান অতি সহজ, যাতে অবোধ্য কিছুই নেই—'বোমা-পিস্তল নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং দয়ামায়া শূন্য নিষ্করুণ চিত্তে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের হত্যা করবো'—এই প্ল্যান প্রথমবার কার্যে পরিণত না হওয়া ও দ্বিতীয়বার কার্যে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ক্লাবে সমবেত ইংরেজ নর-নারীর নরমেধ-যজ্ঞে সেই অভিযানের সমাপ্তি ঘটলো না কেন? এর একমাত্র উত্তর—অন্তরে মৃত্যুভীতি পোষণ করে আমরা আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম, তাই প্রোগ্রাম সমাপ্ত হোক বা না হোক্ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসাটাই শ্রেয় মনে করেছিলাম।

(৮) এই আক্রমণে প্রথম বোমা নিক্ষেপকারী বিপ্লবী শান্তি চক্রবর্তী অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির ছিল। আন্দামানে একত্রে থাকাকালীন তার নির্ভীক চিত্রের যেমন বহু পরিচয় পেয়েছি তেমনি আবার তাকে আত্ম-প্রবঞ্চনা হতে অনেক উর্দ্ধে থাকতেও দেখেছি। চট্টগ্রামের ভাষায় সে আমাকে যে মৌখিক বর্ণনা দিয়েছিল তার সারমর্মটুকু এখানে উদ্ধৃত করছি—······"আঁরা ত যাইয়ারে বোমা-গুলী চালাইছি। আর তারা সাব-মেম হলে পাওলর ডোইল্যা কেটুলী, ট্রে, চা'র কাপ-পিলট্, মদর বতল, সুডার বতল, চেয়ার—হাতর কাছে যিয়ান পাইয়ে পাগাহ্ পাগাই মাইত্তো আছিল······এব্বাবে আঁবার হোঁগে থিয়াইয়ারে তারা যে রইম্যা পাওলর নান্, জিনিসপত্র মেলা মাইত্তো আছিল, আঁরা বেয়াগ্‌গুন ধাই আস্যি যে আরি।"—(আমরা আক্রমণ করলে সাহেব-মেমেরা হাতের কাছে যে যা পেয়েছে—কেটলী, ট্রে, চায়ের কাপ-প্লেট, মদের বোতল, সোডার বোতল, চেয়ার, ইত্যাদি নিয়ে যেভাবে ছুঁড়ে মারতে সুরু করলো তাতে আমরা পালিয়ে এসেছি)।

(৯) এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, Revolutionary Master Strategists Danton বিপ্লবের সাফল্যের জন্য যে রণনীতি নির্ধারিত করেছেন তা অনুসৃত হয়নি বলেই ক্লাব-আক্রমণের পরিণতি সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেনি। মনীষী কার্ল-মার্ক্স বৃটিশ মিউজিয়ামে স্তূপীকৃত পুস্তকরাশির মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণায় সারাজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি সশস্ত্র শ্রেণী-সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী বৈপ্লবিক

অভ্যুত্থানের কথা—Armed Insurrection-এর নির্ভুল নিয়ম, কৌশল ও ও নীতি সম্বন্ধে লিখেছেন। মনীষী মার্ক্স মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন বলেই Master strategist দাঁতের বিপ্লবী strategy উদ্ধৃত করেছেন —"Be daring, still more, daring, always"! বিপ্লবী সংগ্রামের strategy-ই হোল এই নির্দেশ। এ ভিন্ন কোন সার্থক বৈপ্লবিক strategy কেউই গ্রহণ করতে পারে না।

(১০) নরেশ, বিধু, রজত, মনা ও টেগরাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে প্রমোদ চৌধুরী, গোপীনাথ সাহা ও হরিপদ ভট্টাচার্যের সাহস ও বিক্রমের কাহিনী। বারে বারে মনে পড়ে বিনয়, বাদল ও দীনেশের কথা। এই সব বিপ্লবীরা যদি ক্লাব-গৃহ আক্রমণে উপস্থিত থাকতেন তবে কি একজন ইংরেজও সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হোত? প্রাণের আকুল আবেগে অন্তরে আজ ঝড়ের তোলপাড়—১৮ই এপ্রিল পুলিশ লাইনে যদি বিনয়, বাদল দীনেশ প্রমুখরা উপস্থিত থাকতেন তবে কি আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে যেতাম? কোন প্ল্যান ছাড়া, জল, রসদ, দূরবীন, কম্পাস্—কিছু ছাডা পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ বানচাল করে দিয়ে চারদিন ধরে কি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম? তাই অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি বিপ্লবের Master Strategy—"adausity! adausity! yet again adausity"। অর্থাৎ বিনয়, বাদল, দীনেশ, টেগরা গোপীনাথ, নরেশ, বিধু, রজত, মনা, অমরেন্দ্রদের মত নির্ভীক মরণ-জয়ী বিপ্লবী ভিন্ন বৈপ্লবিক কোন পরিকল্পনা কখনও সুসম্পন্ন হতে পারে না। ক্লাব-আক্রমণে দ্বিধাগ্রস্ত মনের অসম্পূর্ণ পরিণতির কারণই হলো প্রত্যক্ষ আক্রমণকারীদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী নির্ভীক বিপ্লবী চরিত্রের অভাব!

(১১) প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে নরেশ, রজত, মনা বা দীনেশ, বাদল, প্রমোদ চৌধুরীকে যদি অস্ত্র চালনায় শিক্ষিত করে ও মানসিক প্রস্তুতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্ভীক সৈনিক রূপে তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল তবে ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রমণকারী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যোদ্ধাদেরও সেইভাবে মৃত্যুশঙ্কাহীন-চিত্ত আত্মোৎসর্গকারী করে শিক্ষিত করা গেল না কেন? স্বয়ং মাষ্টারদাই তা পারলেন না কেন? যদি কেউ মনে করেন বিনয়, বাদল, মনাকে কোন "নেতা" শিক্ষিত, ও বিপ্লবমন্ত্রে উজ্জীবিত করে নির্ভীক সৈনিকরূপে তৈরী করেছিলেন এবং তাতে "নেতারই" সম্পূর্ণ কৃতিত্ব—তবে তা মস্ত ভুল। তরুণ অন্তরে বৈপ্লবিক element (পদার্থ) বাস্তবে যদি

বিরাজিত না থাকে তবে কোন বিপ্লবী নেতারই, তিনি যত বড় বিপ্লবী মহানায়কই হউন না কেন শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একজন ভীরু কাপুরুষ স্বার্থপরকে চরম আত্মত্যাগেচ্ছু নির্ভীক সৈনিকে পরিবর্তিত করতে পারেন না। তা যদি সম্ভব হোত তবে লেনিন, স্ট্যালীন, মাও-সেতুং প্রভৃতি মহানায়কদের পরিচালনার মধ্যে বিশ্বাসঘাতক, ভীরু কাপুরুষ কেউ থাকতো না। পৃথিবীতে যত বড় এবং শক্তিশালী রেডিও (বেতার) ট্রান্সমিটার থাকুক না কেন তা একটি ভাঙ্গা Receiving Setকে কাজে লাগাতে পারে না। যদি Receiving Set দুর্বল হয়—তার প্রাণশক্তি অনুপাতেই শক্তিশালী Trasmitter তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দুর্বল Setকে কোন মতে কাজ চালাবার উপযুক্ত করে। কানাইলালের বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার জন্য নেতার প্রয়োজন হয় না। জেলের মধ্যে রিভলভার যোগাড় করে বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করা তার পক্ষে অতি সহজ। বন্ধু প্রমোদ চৌধুরী রিভলভারের অপেক্ষা রাখে নি—জেলের মধ্যেকার একটি লোহার ডাণ্ডাই ভূপেন চাটার্জিকে পরপারে পাঠাবার জন্য তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যাঁরা এইরূপ অদম্য বিপ্লবী শক্তির অধিকারী তাঁদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নেতার প্রয়োজন হয় না। বরং তাঁদের সান্নিধ্যে নেতারা বলীয়ান বোধ করেন। তবে যদি কেউ মনে করেন সে তাদের অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই, তবে কিন্তু তাও ভুল হবে। নেতাদের সময়পোযোগী বৈপ্লবিক রাজনীতি, বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা ও বৈপ্লবিক যুক্তিবাদের প্রয়োজনীয়তা থাকবেই এবং তরুণ বিপ্লবীরা তাদের বৈপ্লবিক হৃদয়ের প্রেরণায় সেই সব খাঁটি বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে চিরকাল শিক্ষাগ্রহণ করেছে ও করবে।

ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী ছোট্ট গেরিলা দলের সামগ্রিক দোষত্রুটির বিচার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমার বিশ্লেষণের পরিসমাপ্তি টানছি যে তাঁরা Danton-এর Master Revolutionry Strategy—"Be Dairng—Be Still more daring—and be daring always!"—অন্তরে অন্তরে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। সেই জন্যই ইউরোপীয়ান্-ক্লাব আক্রমণের পরিণতি আশানুরূপ হয় নি।

স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রীতিলতার চরম আত্মোৎসর্গ বাংলার তরুণ প্রাণে যেন নূতন করে বৈপ্লবিক উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া জাগালো।

মাষ্টারদার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হলো—"ভীরুতাই বিপ্লবী জীবনের মহা শত্রু—ভীরুতা, কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা বর্জন করতে হবে—আরও, আরও অনেক বেশী সাহসী হতে হবে—অনমনীয় দৃঢ়তায় শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার্থে প্রস্তুত হতে হবে"—।

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সদস্যদল নূতন উদ্যমে নূতনভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে এলেন।

তারকেশ্বর দস্তিদার ও দলের সংগঠকদের নিয়ে মিলিত আলোচনায় মাষ্টারদা স্থির করলেন পল্টন মাঠে ক্রিকেট খেলার সময় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকবর্গের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে হবে।

কল্পনা দত্ত প্রথম সারির একজন কর্মী। কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিজের বাড়ীতেই সে তখন নজরবন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তার সর্বপ্রকার গতি-বিধির উপরেই পুলিশের কড়া নিয়ন্ত্রণ—কলেজ থেকে সোজা বাড়ী ফিরতে হবে, সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত বাড়ীতেই থাকতে হবে, অভিভাবক ছাড়া একা কোথাও যাওয়া চলবে না—ইত্যাদি, ইত্যাদি নানা বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি।

পাহাড়তলীর রাস্তায় একদিন কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী লোকের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য পুরুষ-বেশীনী কল্পনাকে বাধ্য হয়ে নিজেই থানায় উপস্থিত হতে হয়—এবং সেখানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়—এই ঘটনা আগেই বর্ণিত হয়েছে।

মাস্টারদার আপীলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের জাজ্‌মেণ্ট থেকে সংগৃহীত এত দিনের পুরোনো ঘটনার কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে লিপিবদ্ধ হোল। জাজ্‌মেণ্টের ৬৬ পৃষ্ঠায় বিচারকেরা সেখ্‌ আহম্মদের জবানবন্দীর উল্লেখ করেছেন :—

"………I am a motor driver. I remember the day a female was arrested in a male attire at Pahartali. I was seated in the Motor-stand about 7 p.m. 6-7 days before the Pahartali Raid, I saw Abdul Baser's car, with three passengers. They got down and went to the east, towards the station by the south of the Beluadighi. Abdul Baser told me that he believed that one of the passengers was a female. He said that he had understood this from their conversation. I followed those three. They went to east

and then turned north by the east of Beluadighi Tank. They went north near the foot of the hills. Then they turned back and were going by the north of Beluadighi. I questioned them then as to whence they were coming. One of them I know to be Dinabandhu. He is an employee in the Pahartali workshop. They said that they were coming from the town. One of those three is Kalpana Dutt (identifies in dock). She was dressed in male attire, dhuti and shirt and handkerchief tied on the head. Dinabandhu said that she was his cousin and they were going on invitation to his house. Dinabandhu's house is at Kattali. I said if they were going to Kattali why they were wandering round aimlessly. I flashed my torch-light at the girl and she turned her face away. I said to Dinabandhu she was a female but he denied it. I asked them who could identify them and they mentioned the name of Suren Doctor and Toka, son of Prasanna Doctor. They accompanied me and our member Ebadulla came up and I told him of my suspicions. After making enquiries from Toka we took them to Suren Doctor's dispensary and made them sit there. The thana was informed by telephone and later Sanjib Babu, S. I. and Pande Ali came from kotwali thana.

Then those three were taken away.

"......these three did not-object to my taking them to Toka or Suren's dispensary. They said themselves to take them there.........when having the conversation then they suggested that they should go to Toka or Suren Doctor." (From the Judgement copy delivered by their lordship in the appeals of Surjya Sen. Page—66/67)

পুরুষবেশীনী কল্পনা দত্তকে গ্রেপ্তার করে কোতয়ালীতে আনা হয় ও তার বিরুদ্ধে ১০৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এই সময় কল্পনার বাবা

রাঙ্গামাটিতে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কন্যার গ্রেপ্তারের খবরে তিনি এসে অনেক চেষ্টায় তাকে জামিনে মুক্ত করেন। আগেই লিখেছি এইভাবে পাহাড়তলীতে গ্রেপ্তার হওয়াতে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্-ক্লাব আক্রমণ প্ল্যানটি কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ১৭-১৮ই সেপ্টেম্বর কল্পনা জেল-হাজতে ও তারপরে জামীনে মুক্তি পেয়ে বাড়ীতে অন্তরীণ অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়। ১৯৩৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রান্ত হয়। কল্পনা ঘুণাক্ষরেও এই ঘটনা জানতে পারেনি। ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে পুলিশের D. I. B. ইন্সপেক্টার যোগেন গুপ্ত কল্পনার সঙ্গে দেখা করে তাকে এই ঘটনা জানান।

যোগেনবাবু কল্পনার বাবার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ও পরিবারের বিশেষ শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা নিয়ে কল্পনার উপর তাঁর "অভিভাবকত্বের" দাবী জানাবার নানা সুযোগ নিতেন। ইউরোপীয়ান্ ক্লাবে প্রীতিলতার মৃত্যু সংবাদটি পরিবেশনের অছিলায় কল্পনার কাছ থেকে পুলিশী তথ্য সংগ্রহের আশায় যোগেনবাবু সেইদিন সকালেই কল্পনার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। কল্পনার মুখেই শোনা—"যোগেনবাবু নাটকীয়ভাবে অনেক অভিনয় করে গেলেন— '…ভগবানের অশেষ দয়া! ভগবানের কৃপা না থাকলে মা আমরা তোমাকেও হারাতাম! আমার প্রীতি-মা আর বেঁচে নেই। পাহাডতলী ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে সেখানেই সে প্রাণ দিয়েছে। তুমি যেরকম পুরুষের পোষাকে পাহাড়তলীতে গ্রেপ্তার হয়েছিলে ঠিক সেইরকম পোষাকেই সজ্জিত প্রীতির মৃতদেহ আমরা পেয়েছি। তাই বলি, ভগবানের অশেষ দয়া—তাঁরই অপরিসীম কৃপায় তুমি সেদিন পুরুবেশে বন্দী হয়েছিলে! তোমাদের মত এমন কৃতী ও অশেষ গুণসম্পন্ন মেয়েদের এভাবে বিপথগামিনী করে তোলা কি সূর্য সেনের উচিত? সূর্য সেনের প্রসাদে প্রীতির পরিবার আজ শ্মশানে পরিণত… … ।'

যোগেনবাবু এইভাবে নানা কথা বলে যাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে যেন বেদনাভিভূত হয়ে চোখ মুছছিলেন ও ক্ষণে ক্ষণে ভগবানের কৃপা স্মরণে ললাট স্পর্শ করছিলেন। এই সঙ্গে অবশ্য পুলিশের কর্তব্য পালনেও ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রশ্নে বিপ্লবী সংগঠনের সংবাদ জানবার চেষ্টার ত্রুটি করেননি।"

যোগেনবাবুকে কিন্তু আশাহত হয়েই ফিরতে হয়েছিল—সংগঠনের কোন সংবাদই তিনি পাননি। বিপ্লবীদের কাছ হতে পুলিশদের বারে বারেই বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয় কিন্তু তবু তাঁদের হাল ছাড়লে চলে না।

কারণ, তাঁদের প্রমোশন পেতে হবে—রায়বাহাদুর বা খান্‌বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হতে হবে। কাজেই "তাঁরা" কখনই নিরাশ হয়ে নিরস্ত হতে পারেন না।

অত্যন্ত নিরীহ শান্তশিষ্ট মেয়ের মত বাড়ীতে অন্তরীণ অবস্থায় থেকে কল্পনা বোধ হয় পুলিশের মনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তা'ছাড়া কল্পনা একজন গভর্নমেণ্ট অফিসারের কন্যা ও রায়বাহাদুর দুর্গাদাস বাবুর দুলালী নাতনী। তাই তার উপর পুলিশের কঠোর নিয়ন্ত্রণাদেশও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিল হয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্‌ব্যবহারে কল্পনা গোপনে ঘোরাফেরা করা ও দলের সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় কিছু পরিমাণে তৎপর হয়ে উঠল। তার চলাফেরা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলো না, সন্দেহ ক্রমেই বাড়তে লাগলো—কল্পনাও অনুমান করলো যে পুলিশ সহসাই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে—বিনা বিচারে জেলেও আটক করে রাখতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত সংবাদ মাষ্টারদাকে জানিয়ে আত্মগোপন করে থাকবার অনুমতি প্রার্থনা করে পাঠালো।

পুলিশ প্রীতিলতার বাবার কাছে গিয়েও কল্পনা সম্বন্ধে অনেক খোঁজখবর নেয় এবং কল্পনা যেন তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে কনকের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ না রাখে তার জন্য তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দেশ দেয়। প্রীতিকে হারাবার পর প্রীতির বাবা (জগৎবন্ধু ওয়াদ্দাদার) বড়ই অসহায় হয়ে পড়লেন। তাঁর শেষ সম্বল সরকারী চাকরীটিও পুলিশের কৃপার উপর নির্ভর করছিল। কাজেই পুলিশের ভয়ে দুয়েকটি কথা তিনি ফাঁস করে দিলেও তৎক্ষণাৎ তা' আবার গোপনে কল্পনাদের জানিয়ে দিতেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের জাজ্‌মেণ্টে ৺জগৎবন্ধুবাবুর জবানবান্দী যা' লিপিবদ্ধ করেছেন তারই কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"I know the accused Miss Kalpana Dutta."

"She used to come to our house to Pritilata occasionally. Kanak is a second daughter of mine and lives with me. After Pritilata had left my house for the last time, perhaps about two weeks later, I was returing from my morning-walk and I saw Kalpana Dutta on the field near my house going to the south with Kanak. I called Kanak but as they

were some distance off, my voice did not carry. I went forward and I asked a man nearly to call to them. He did so, and my daughter Kanak came back but Kalpana did not. I took my daughter home. I gave information to Jagen Babu about this.

"Before that I was told by Jogen Babu that Kalpana was released on a bond and I should not allow the daughters of my house to mix with her.

"......I have known Kalpana Dutta for 5-6 years.

"The people of Durgadas Babu and my people visit each other. Durgadas Babu is Rai Bahadur Durgadas Dutta, the grand-father of Kalpana."

"Pritilata used to come to Chittagong during the holidays and used to go out to vist friends. She took a job as a school-teacher in Chittagong in the end of Aril, 1932., 2-3 students from college and also school students used to come and see her, but not to be coached by her, I was not always present when they came. We are not related to those who used to come but some of them are people with whom we are on visiting terms.

"Kalpana Dutta had been to our house about 2-3 weeks before the incident I mentioned about seeing Kanak with her. Kalpana Dutta had books with her that day. It was about the time of her going to college."

"It was after the 5th July that Jogen Babu warned me about letting my daughter go with Kalpana. I cannot say how long after it would be. I had a bad memory for times, specially after 5th July, 1932."

"I cannot say either how long before 25th September, 1932, I was told this by Jogen Babu. It was certainly before 25th September that I saw Kalpana and Kanak going

together. It may be two months before 25th September, 1932, that Kalpana and Kanak were seen going togther.

"When Kalpana came to our house 2-3 weeks before this meeting outside with Kanak I did not make any objection."

পুলিশের তৎপরতায় বাড়ীতে স্বাধীনভাবে থাকা কল্পনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রমণ ও প্রীতিলতার স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের পর কল্পনা যতই না কেন রায়বাহাদুরের দুলালী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর কন্যা এবং যতই মেধাবী কৃতী-ছাত্রীই হোক্ না কেন এসব কিছুই তাকে পুলিশের কবল থেকে বাঁচবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কল্পনা পুলিশী তৎপরতার সবিশেষ বৃত্তান্ত দিয়ে ও তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কা জানিয়ে মাস্টারদাকে সংবাদ পাঠালো। মাস্টারদা নিজেও এইরূপ একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা পোষণ করছিলেন। আর কালক্ষয় না করে কল্পনা যাতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসে আত্মগোপন করে থাকে সেই উদ্দেশ্যে তিনি কল্পনাকে নিয়ে আসবার জন্য শান্তি চক্রবর্তীকে পাঠালেন।

কত দিনের আশা আকাঙ্খা—কত দিনের আকুল প্রতীক্ষা! চাই অস্ত্র, চাই সুযোগ, চাই মাস্টারদার আদেশ—কল্পনার অন্তরে আজ কুল ছাপানো আনন্দের জোয়ার! কল্পনা প্রস্তুত—"দূরদেশী দাদা" আসবে, তার সঙ্গে সে আজই চিরকালের মত বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাবে। মা-বাবার স্নেহচ্ছায়াচ্ছন্ন শান্ত গৃহনীড়, কৃতী ছাত্রীর কলেজের আকর্ষণ সবই আজ অর্থহীন নগণ্য! কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সকলেই আশা কল্পনা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করবে। তাঁদের প্রভাব খুব সামান্য বা তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা করার মত নিশ্চয়ই নয়। এই রকম কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন বিসর্জন দিয়ে জীবনের গতিপথে দাড়ি টেনে দেওয়া যে কতবড় স্বার্থত্যাগ তাঁরাই কেবল তা' অনুভব করতে পারবেন। কোন বন্ধন, কোন আকর্ষণ, কোন স্বার্থের প্রভাবই আজ কল্পনাকে পিছু টানতে পারলো না। মাস্টারদার অনুমতি পাওয়া গেছে—বিপ্লবের সুদূর কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথের হাতছানিতে তার অন্তর আজ কূলছাপানো আনন্দ-তরঙ্গে উদ্বেল! পিছনে তাকাবার ক্ষমতা আজ তার নেই।

কল্পনার মুখের কথা; সে বলছিল—"সেই দিনটির স্মৃতিতে আজও—

এখনও মন যেন তোলপাড় করে। দূরদেশী দাদার কণ্ঠের গান এখনও যেন বহুদূর থেকে কানে ভেসে আসছে—'দূরদেশী কোন্ রাখাল ছেলে, আমার বাড়ীর বটের ছায়ায়, সারা বেলা গেল খেলে'।" এই দূরদেশী দাদা হোল—শান্তি চক্রবর্তী। এই গানটি শান্তি প্রায়ই আপন মনে গাইত। তাই মাস্টারদা শান্তির ছদ্ম নাম দিয়েছিলেন—"দূরদেশী," কল্পনার "দূরদেশী দাদা"। এই শান্তিই ইউরোপীয়ান ক্লাবে প্রথম বোমা ছোঁড়ে।

গুপ্ত বিপ্লবীদলে সকলেরই ছদ্মনাম ছিল। নিজের নামে শান্তি তখনও কল্পনার কাছে পরিচিত ছিল না। শান্তি যথা সময়ে যথাস্থানে কল্পনার সঙ্গে দেখা করলো এবং সেই রাত্রেই পুলিশের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে কল্পনা উধাও হয়ে গেল।

কল্পনার যতটুকু মনে আছে তা সে বলছিলো—প্রথমে সে "কুটিরে" যায়। এই "কুটির" আশ্রয়স্থলেই ধলঘাট যুদ্ধের পর মাস্টারদা প্রীতির সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বোয়ালখালি থানার জৈষ্টপুরা গ্রামে 'কুটির" নামক এই বাড়িটি। কল্পনার আগমন বার্তা পেয়ে তাকে স্বাগত জানাতে মাস্টারদা ও ফুটুদা (তারকেশ্বর দস্তিদার) সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মাস্টারদার সাক্ষাৎ পাওয়ার পর কল্পনার মনে হয়েছিল কঠিন সাধনায় তার যেন আজ সিদ্ধিলাভ হোল। মাষ্টারদা দু'তিনটি রিভলভার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে একটি বেছে নিতে বললেন। রিভলভার দেখে এবং তিন-তিনটি রিভলভার একসঙ্গে হাতের কাছে পেয়ে কল্পনার আনন্দের সীমা ছিল না। মাষ্টারদা ও ফুটুদা—দু'জনেই তার সামনে বসে। তাঁদের দেওয়া রিভলভার সে বেছে নেবে—এ যে কতখানি সৌভাগ্য—কতখানি বৈপ্লবিক প্রেরণা ও উৎসাহব্যঞ্জক—তার গভীর পরিধি কল্পনা আমাকে ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারছিল না। সেই বয়সে নিজের মনের বিশ্লেষণী শক্তি দিয়েই কল্পনার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা বুঝেছি এ যে উপলব্ধির জিনিষ—ভাষা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়! অন্তরের এই উদ্দাম, উচ্ছল আবেগ-তরঙ্গ কে রোধ করবে—হাতের কাছে বহু আকাঙ্খিত বহু মূল্যবান ধনরাশি ছড়ানো। বিপ্লবীর কাছে রিভলভারের বিনিময়ে মনি-মুক্তা, হীরা-জহরৎ অতি তুচ্ছ অতি নগন্য ও অর্থহীন। একটার পর একটা রিভলভার দু'হাতে তুলে নিয়ে কল্পনা সযত্নে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখতে লাগলো। কোন্টা নেবে? তিনটিই নিলে কেমন হয়? হাত তো দু'টি—তবু তিনটি রিভলভারই সঙ্গে রাখবার তীব্র ইচ্ছা। কিন্তু তা' তো হবার নয়—এ যে স্বার্থপরতা! সব

রিভলভারগুলিই পুলিশ আর্মারী হতে সংগৃহীত এবং প্রতিটিই '৪৫০ ব্যাসের। তিনটির মধ্যে দু'টি কোল্ট ও একটি ওয়েবলী কোম্পানীর মার্কা মারা। মেয়েদের ব্যবহারের জন্য ছোট সাইজের রিভলভার দরকার। আর্মি রিভলভার সাধারণতঃ মেয়েরা ব্যবহার করতে পারে না। এমন কি দুর্বল মুষ্টি ছেলেদের পক্ষেও এগুলি ব্যবহার করা একরকম অসম্ভব। আমার দিদি ও সুহাসিনীদিকে (পুটুদি) কোল্ট ও ওয়েবলী রিভলভারের ব্যবহার শেখবার চেষ্টা করতে দেখেছি। হাতে খুব জোর না থাকলে আর্মি রিভলভারের ট্রিগার টেপা খুবই কষ্টসাধ্য। আমার দিদি সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালীনী ছিলেন। তবু তিনি প্রাথমিক অবস্থায় এই জাতীয় রিভলভারের ট্রিগার টিপে ফায়ার করতে পারেন নি। চন্দননগরের বাড়িতে পুটুদি প্রথম টোটা ছাড়া রিভলভার হাতে নিয়ে ট্রিগার টেপার চেষ্টা করতে গিয়ে স্ট্রাইকার নড়াতেই পারেন নি। অনেক চেষ্টাতেও যখন স্ট্রাইকার স্বস্থান হ'তে কোন মতেই গাত্রোত্থান করলো না, পুটুদি তখন প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

আমি, গণেশ, আনন্দ ও মাখন সকলেই সেখানে বসে—আমাদের সামনে এই 'অক্ষমতায়' পুটুদি ক্রমশঃ যে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হযে উঠছিলেন তা' তার চোখ মুখের ভাবেই সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। পুটুদি বলতে লাগলেন—'আমি পারছি না কেন ? . . এটা কি এতই অসম্ভব—মেয়েরা কি আর্মি রিভলভার চালাতে পারবে না··· ? দেখতে দেখতে পুটুদির চোখে মুখে দৃঢতার চিহ্ন ফুটে উঠলো। তিনি বদ্ধপরিকার—যতই শক্ত বা কঠিন হোক্ না কেন আর্মি রিভলভারকে আয়ত্তে আনতেই হবে। সে এক একনিষ্ঠ সাধনা। পাউডারের টিন নিয়ে এলেন। আঙ্গুলে হাতে পাউডার মাখাতে লাগলেন, কারণ—ট্রিগার টিপে টিপে আঙ্গুলে ইতিমধ্যেই ফোস্কা পড়ে গেছে। পুটুদির ইচ্ছাশক্তির কাছে আর্মি রিভলভারকে পরাজয় স্বীকার করতে হোল।

মাষ্টারদার দেওয়া তিনটি আর্মি রিভলভার থেকে শেষ পর্যন্ত কল্পনা একটা বেছে নিলো। আর্মি-রিভলভারের ক্রিয়া কৌশল ও কাঠিন্যের কথা মাষ্টারদা কল্পনাকে বলে দিলেন এবং এও বললেন যে, এই সব রিভলভারের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনতে হলে কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। হাসি-মুখে কল্পনা জানালো তার দিক থেকে চেষ্টা ও পরিশ্রমের কোন ত্রুটিই থাকবে না।

তারপর অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে মাস্টারদা তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য

নিয়ে বললেন (এই সব কথা কল্পনার মুখেই শোনা)—"..... দেখ আমরা কিভাবে আছি। কোন কিছুই গোছানো নেই। আমাদের স্নান, খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-জামা, ইত্যাদি, কিছুরই কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। আজ হয়ত এ গ্রামে আছি কিন্তু কালই হয়ত আবার অন্য গ্রামে চলে যেতে হবে; যে বাড়িতে যাব সে বাড়িতে হয়ত সামান্য একটু স্থান পাবো, সেখানে জেগেই রাত কাটাতে হবে—বিছানা বালিশ থাকবে না, মশারীর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এইরূপ নানা কষ্ট ও বাধার ভিতর দিয়েই বিপ্লবের এই কণ্টক সমাকীর্ণ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে। এইসব কথা এতদিন কেবল বইতেই পড়েছ ও নানা লোকের মুখে শুনেছ মাত্র। আজ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তোমার যাত্রা সুরু। এ পথের বাঁকে বাঁকে ক্রূর সর্প ছোবল হানতে ফণা বিস্তার করে আছে; রাতে দিনে পুলিশ ও মিলিটারীর রাইফেল আমাদের বুক লক্ষ্যে উদ্যত; মিত্র ব্যূহের মধ্যেও বিভীষণের কুটিল চক্রান্ত আমাদের এই প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য প্রতি মুহূর্তেই সচেষ্ট। এর মধ্যেই আমাদের বাঁচতে হবে—সংগঠিত হয়ে শত্রুকে আঘাত করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ফেরারী জীবনের এত দুঃখ-কষ্ট এত অসুবিধা সহ্য করতে পারবে কিনা একান্তভাবে ভেবে দেখ—নিজের অন্তরের সাথে এখনই খুব ভালভাবে বোঝাপড়া করে নাও। পারবে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটাতে? বিশ্রাম ছাড়া আহার্য ছাড়া পারবে কি সুদীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথে পাড়ি দিতে? পারবে কি মিলিটারীর রাইফেল উপেক্ষা করতে বা ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে? এখনও সময় আছে—এখনও বাড়ি ফিরে যেতে পার।......কোনমতেই বাড়ি ফিরে যাবে না—এই প্রতিজ্ঞায় যদি মনস্থির করে এসে থাক তবে বলছি—বৈপ্লবিক আদেশ অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। তোমার মনঃপূত নাও হতে পারে, তবু দ্বিধাহীন চিত্তে নিষ্ঠার সহিত সেই আদেশ পালন করতে পারবে বলে তোমার যদি স্থির ধারণা থাকে তবেই তুমি এই রিভলভার নাও—আমাদের সাথে থাক। এক্ষেত্রে আমরা তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করবো। বিপ্লবের যজ্ঞে আমরা সবাই আত্মাহুতি দেবো। ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির চট্টগ্রাম শাখার বৈপ্লবিক দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়েছে। আমি সেই দায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারিনি। তাই নিজের হাতে প্রীতিলতাকে রণসাজে সাজিয়ে দিয়েছি—যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করবার জন্য এগিয়ে দিয়েছি। আদেশ যতই কঠিন হোক্ না কেন, বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালনে প্রীতিলতাকে সেই আদেশই আমি দিয়েছি। বিপ্লবের কর্তব্যে

সময়মত তোমাকেও হয়ত কঠোর আদেশ পালনে এগিয়ে যেতে হবে। তুমি ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির একজন প্রথম শ্রেণীর নির্ভীক সৈনিক।... ...কল্পনা! খুব ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে বল, পারবে কি আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিপ্লবের এই দুর্গম পথযাত্রায় অগ্রসর হতে—ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গে পাড়ি দিতে? পারবে কি এই উত্তপ্ত বালুকাময় মরু পথের অসহ্য—অসহনীয় উত্তাপ সহ্য করতে?"

মাস্টারদার কথা কল্পনার অন্তর স্পর্শ করেছিল—মনে ফাঁকি রেখে ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিয়ে মাস্টারদার নেতৃত্বে যে সৈনিক হওয়া যায় না তা' সে আগেও বুঝেছিল আর আজও তা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারলো। খুব সংযতভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সে মাস্টারদকে জানালো—"মাস্টারদা! আমার মনের কথা আমি যা' মুখে বলবো তার সত্যতা আমার অন্তরকে কতখানি প্রভাবান্বিত বা আচ্ছন্ন করেছে তা' কিন্তু আপনাকেই বুঝে নিতে হবে। বহুদিন ধরে এই দিনটির জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। সম্পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই আমি বাড়ি ছেড়ে এসেছি। প্রীতিদি বিপ্লবের প্রজ্বলিত মশাল হাতে এগিয়ে গেছেন। আমি সেই মশাল তুলে নিয়ে আপনার নির্দেশে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মরবো—ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমার হাতের রিভলভার অবসর গ্রহণ করবে না·· ··· !"

কল্পনা সম্বন্ধে মাষ্টারদা যা শুনেছিলেন বা ধারণা করেছিলেন তার যে ব্যতিক্রম ঘটবে না তা' তিনি জানতেন। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে কল্পনার মুখ থেকে এই বৈপ্লবিক স্বীকৃতিটুকু আদায় করা তার প্রয়োজন ছিল। মাস্টারদার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জানবার সুযোগ আমার আরও অনেক হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে আমিও এই পদ্ধতি অনুসরণ করতাম—মৌখিক প্রতিজ্ঞার মূল্যও অনেকখানি। তবে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা আদায়ের পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে Subjectively তৈরী করবার অপরিহার্য কর্তব্য ভুললে যে চলবে না তার উপলব্ধি আমাদের ছিল।

বিপ্লবীদের চারিত্রিক গঠন আমরা যদি কেবল তাদের বোমা পিস্তল ও রিভলভারের মধ্যে দেখি তবে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। বিপ্লবের মরুপথের অবর্ণনীয় দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থেকে দিন কাটানো খুবই কঠিন। সেই যুগে, ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাবো, এই ছিল আমাদের একমাত্র চিন্তা। বিভিন্ন ধরণের বৈপ্লবিক বই পড়া বা মার্কসীয় শাস্ত্র অধ্যয়নের কোন ব্যবস্থাই

তখন ছিল না। এইরূপ শুষ্ক বেকার ফেরারী জীবনের মধ্যেও কিন্তু রস ছিল। মরুভূমিতে মরুদ্যান যেমন ক্লিষ্ট-তৃষিত প্রাণে বল সঞ্চার করে, সাহস আনে, ফেরারী জীবনেও বিপ্লবীরা সেইরূপ গান, কবিতা, আবৃত্তি, ইত্যাদির মধ্যে রস উপভোগ করতেন—আনন্দ পেতেন।

১৯৬১ সালে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রতি সপ্তাহে লেখবার সময় আমি কল্পনার কাছে তার ফেরারী জীবন ও মাস্টারদা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলাম। আবার ত্ব'বছর আগে সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধলঘাট যুদ্ধের বিবরণ ও প্রীতিলতার সম্বন্ধে লেখবার সময়েও মাস্টারদা ও চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে আবার কল্পনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার কাছ থেকে মাস্টারদার জীবনের ছোটখাটো ঘটনা সম্বন্ধে যা' জানতে পেরেছিলাম তা' তখন লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম।

কল্পনার মুখে যে-ভাবে শুনেছিলাম ভাষায় তার হুবহু বর্ণনা দিতে না পারলেও মোটামুটি প্রায় ঠিকভাবেই লিখতে পারবো বলেই আমার বিশ্বাস।

মাস্টারদা গান ভালবাসতেন। নিজে গান গাইতেন। অবশ্য আসরে তিনি কখনও গান করেননি—নিজেদের মধ্যে ও আপনমনে তাঁকে গান করতে শুনেছি। মাস্টারদা অনেক সময় কল্পনাকে গান গাইতে বলতেন। সব বাড়িতে উচ্চকণ্ঠে গান করা সম্ভব ছিল না। তাই কল্পনা মাঝে মাঝে নীচুস্বরে এই গানটি গাইতো—

"হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া···
··· ··· ···।"

কল্পনা আমাকে বলবার সময় এই গানটির এই কয়েকটি লাইন বলেছিল, আমি আবার খাতায় লিখে রেখেছি। গানের সব কলিগুলো তুলে দিয়ে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। কল্পনা আরও একটি গানের কলি মুখে মুখে বলেছিল—

"অতিথি এসেছে দ্বারে
ছিল সে নদীর পারে
··· ··· ···।"

কল্পনা যখন এই গান ত্ব'টি গাইতো, মাষ্টারদা নিবিষ্ট মনে শুনতেন। কোন একদিন খোলা মাঠে বা কোন এক পুকুর পাড়ে মাষ্টারদা, কল্পনা ও

আরও কয়েকজন সাথী উপস্থিত। সেই সময় মাষ্টারদা প্রীতিলতা যে গানটি গাইতো—"ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভোল, পথ ভুলে মর..."—সেই গানটি জানে কিনা কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানলে গাইতে বললেন। কল্পনা মাষ্টারদাকে জানালো—"প্রীতিদির মুখে এই গানটি শুনেছি, কিন্তু পদগুলো সব আমার জানা নেই। প্রীতিদি আর একটি গান গাইতেন, সে গানটি আমি জানি—আমার খুব ভালো লাগতো।" সেখানে উপস্থিত সকলেই গানটি শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করলে মাষ্টারদা কল্পনাকে গানটি গাইতে বললেন। কল্পনা গাইলো—

"ওরে দেবতা আমার পাষাণ দেবতা,
হৃদি-মন্দির বসি আমি তোমার চরণে উজাড়
করিনু, যতেক বাসনারাশি..... ।"

এই গানের লাইনগুলিও কল্পনা আমাকে বলেছিল।

প্রীতিলতার অভাব সকলেই অনুভব করতো। কল্পনার কণ্ঠে প্রীতিলতার প্রিয় গানটি শুনতে শুনতে স্বভাবতই সকলে ক্ষণিকের জন্য হলেও অভিভূত হয়ে পড়েছিলে।

তারকেশ্বর দস্তিদারেরও (ফুটুদা) কয়েকটি খুব প্রিয় গান ছিল। সময় ও সুযোগ পেলে কল্পনাকে সে তার একান্ত প্রিয় গানটি গাইতে অনুরোধ করতো। কল্পনা গাইতো—"হে ক্ষণিকের অতিথি......।"

বিপ্লবীরা স্বভাবই ভাবপ্রবণ—ভাবাবেগে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ। ভগবানের প্রতি তারকেশ্বরের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। প্রথম থেকেই এবং ফেরারী জীবনেও তার এই ভক্তি ও বিশ্বাস নানাভাবে প্রকাশ পেতো। সময় পেলেই সে এই গানটি ও কল্পনাকে প্রায়ই গাইতে বলতো—"প্রভু দাঁড়াও তোমায় দেখি......।" অন্তরের দরজা দিয়ে এই গানটি গেয়ে কল্পনা নিজেও অভিভূত হয়ে পড়তো।

বিনিদ্র রজনীর সদা জাগ্রত সতর্ক আঁখি—প্রতি মুহূর্তে শত্রুর সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কায় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ রিভলভার, গুপ্তচরের উদ্যত গুপ্ত ফণা বিপ্লবীদের ফেরারী জীবনের 'পরমাত্মীয়' ও 'ঘনিষ্ঠ সহচর'। তা সত্ত্বেও উত্তপ্ত বালুকা ভূমিস্থ শীতল নির্ঝরিণীদের মতই—বিপ্লবীদের শত দুঃখ যন্ত্রণাক্লিষ্ট প্রাণেও ছিল ক্লিষ্ট শুষ্ক হাসি আনন্দ ও সঙ্গীতের অন্তধারার শত মূর্চ্ছনা!

চট্টগ্রাম জেলে মাস্টারদাকে গান গাইতে শুনেছি। খোলা মাঠেও মাষ্টারদা কখনও কখনও প্রাণ খুলে গান করতেন—তাও শুনেছি। মাষ্টারদা

ভাল গাইতেন কিনা, সুর জ্ঞান ছিল কিনা তা' আমি বলতে পারবো না। কারণ, সুর বা তাল সম্বন্ধে আমার নিজের কোন জ্ঞানই নেই। তবে মাস্টারদা সুকণ্ঠ ছিলেন—তাঁর দরাজ কণ্ঠের গভীর সুর-ঝঙ্কার আমার খুব ভালো লাগতো।

মাস্টারদা প্রাণ খোলা হাসি হাসতেন। তিনি আমাকে বলতেন—"তুই হাসতে পারিস্ না কেন?" সত্যিই, আমি যে প্রাণ খুলে হাসতে পারতাম না। আজ লিখতে বসে জীবনের প্রায়-ভুলে যাওয়া কথা কটি মনে পড়ছে। আমার পরম বন্ধু ও আত্মীয় স্বনামখ্যাত চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যেন বসুর "বরযাত্রী" ছবিটি তখন কোন এক চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছিল। আমি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ছবিটি দেখতে যাই। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ যেন হাসিতে ফেটে পড়ছে! পাশে বসে আমার বন্ধু শ্রীসলিল সেনগুপ্ত। তিনি নাকি আমাকে খুব গম্ভীর দেখে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছিলেন—"কি অনন্তবাবু হাসি পাচ্ছে?" আমি নাকি গম্ভীর গলায় ধীরে উত্তর দিয়েছিলাম—"হ্যাঁ পাচ্ছে...।" এই নিয়ে আজও সেই দিনকার প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করেন। মাস্টারদার বলা সত্ত্বেও আমি প্রাণ-খোলা হাসি কখনই আয়ত্তে আনতে পারিনি। তবে এই সঙ্গে আবার আরও একটি দিনের কথা মনে পড়ে গেল। প্রায় আট-দশ বছর পূর্বে আমাদের পরম প্রিয় অভিনেতা শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় দু'দিন এক হোটেলে ছিলাম। সেই সময় তাঁর কাছে বসে কয়েক ঘণ্টা নানা কথা ও কৌতুকাভিনয় শোনবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আজও মনে পড়ছে, সেদিন আমি এত হেসেছিলাম যে পেটে একেবারে খিল ধরে যাওয়ার মত। সেখানে উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের বলেছিলাম—"আমার এত হাসি ছিল কোথায়? আমি তো বেশ হাসতে পারি দেখছি!" কাবুলিওয়ালাও গান গায়—ধু ধু মরুভূমিতেও শীতল জলের সন্ধান মেলে।

কল্পনা তার প্রথম ফেরারী জীবনের নানা ঘটনার বিবরণ দিয়েছিল। তার সামনেই সে সমস্ত আমি টুকে নিয়েছিলাম। তা'তে মাস্টারদার জীবন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—'এক হাতে বাঁশের বাঁশী অন্য হাতে উন্মুক্ত অসি'—সবাইকে যে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একটানা শান্ত পরিবেশে ফেরারী জীবন কাটানো সম্ভব নয়। কল্পনা বাড়ি ছেড়ে এসেছে খুব বেশী দিন হবে না। তারকেশ্বর, কল্পনা ও মাষ্টারদা 'কুটির' আশ্রয়স্থলেই দিন কাটাচ্ছেন। গৃহকর্ত্রী রাতে-দিনে সকল সময়েই

সজাগ প্রহরায় থাকতেন। চতুর্থ দিন রাত্রে পুলিশ এই বাড়িতে হানা দিল। কল্পনা নিজে যা বলেছে তারই ভাষায় তা' আমি লিপিবদ্ধ করলাম—" · তখন রাত প্রায় দুটো। আমি একটি কামরায় শুয়ে আছি। মাষ্টারদা ও ফুটুদা পাশের কামরায় ঘুমোচ্ছেন। তখনও কেন জানি না আমার ঘুম আসেনি। গৃহকর্ত্রী মাসীমা হঠাৎ এসে ব্যস্ততার সঙ্গে অস্থির চাপাকণ্ঠে বলে উঠলেন—'পুলিশ! পুলিশ!' সঙ্গে সঙ্গেই বুটের আওয়াজ শুনতে পেলাম। অনেকগুলি বুটের শব্দ আমাদের বাড়ির দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে বুঝতে পারছিলাম। ইতিমধ্যে মাসীমার ব্যাকুলতা ও তৎপরতায় মাষ্টারদা ও ফুটুদা বিছানা ছেড়ে নিমেষেই উঠে পড়লেন। দু'জনের হাতের মুঠোতেই রিভলভার ধরা। আসন্ন চরম বিপদের কথা ভেবে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। অনভিজ্ঞা আমি সহজ ভাবে সব নিতে পারছিলাম না। মাষ্টারদারা কালবিলম্ব না করে পেছনের দরজা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। দুর্ভাগ্য আমার, তখনও আমি আমার রিভলভারটির জন্য বিছানা হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমার এই মারাত্মক দেরী ও মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার খুঁজে না পাওয়ার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য বলেই মনে হচ্ছিল। আমার দেরী দেখে ফুটুদা আমার ঘরে ছুটে এলেন এবং চাপাকণ্ঠে বললেন—'মাষ্টারদা নিরাপদে পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে চলে গেছেন। দেরী কোরো না—মুহূর্তে চলে এসো।' আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ফুটুদাকে অনুসরণ করলাম—আমার রিভলভার আর পাওয়া গেল না। রিভলভারটি হাতের কাছে রেখে প্রস্তুত হয়ে ঘুমোতে যাইনি বলে নিজেকে শত ধিক্কার দিতে দিতে রিভলভার ফেলেই দৌড়ালাম। ফেরারী জীবনের অনভিজ্ঞতাই রিভলভারের প্রতি আমার এইরূপ ঔদাসীন্যের কারণ। আমি ও ফুটুদা দৌড়ে এসে মাষ্টারদাকে দেখতে পেলাম না। দূরে অন্ধকারের মধ্যে মনে হচ্ছিল কে একজন যেন হেঁটে চলেছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হোল যেন তিনিই মাষ্টারদা। তিনিও নির্জন মাঠে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে আসতে দেখে ধরে নিয়েছিলেন যে একজন আমি ও অপরজন ফুটুদা। আমরা তিনজন আবার মিলিত হলাম। বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে জৈষ্টপুরা গ্রামে একটি ছোট্ট মন্দিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এই গ্রামে আমাদের আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত কোন একটি বাড়ি ফুটুদার জানা ছিল। তিনি সেই বাড়ির খোঁজে চলে গেলেন। দুর্জয় শীতের রাত। দারুণ শীতে সর্ব শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। পুলিশের তাড়ায়, উত্তেজনায় বা ভয়ে সে রকম কাঁপছিলাম কিনা জানি না। ভাবছিলাম

সম্মুখে মন্দির, আমার সামনে স্বয়ং মাষ্টারদা দাঁড়িয়ে, তবে আবার ভয় কিসের ?

"সেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিদারুণ শীতের রাতে মন্দিরের সামনে আমার অতি নিকটেই মাষ্টারদা দাঁড়িয়ে আছেন ! একাধারে মানুষ, দেবতা ও বিপ্লবী মহানায়কের উপস্থিতি—বিচিত্র সে অনুভূতি ! মাষ্টারদা মানুষ বা দেবতা তা' নিয়ে আমার মনে কখনও দ্বন্দ্ব জাগেনি। বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন যে অতি বাস্তব সত্য সেই উপলব্ধির বাস্তব গণ্ডীর মধ্যেই মাষ্টারদাকে দেখতে ও বুঝতে চেয়েছি। বিপ্লবী মহানায়ককে "দেবতা" সাজিয়ে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন এক ঠুঁটো জগন্নাথের মূর্তিতে দেখার মধ্যে আত্ম প্রবঞ্চনার বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু তা'তে সত্যের প্রতিষ্ঠা হতে বিচ্যুত হতে হয়। আমার কাছে মাষ্টারদা দেবতাও নন্ বা মানুষও নন্—তিনি বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন !

"রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো—ভোরের আকাশে ঊষার রক্তিমাভা। ফুটুদা বাড়ির সংবাদ নিয়ে এলেন। আমরা নতুন আশ্রয়ে গিয়ে উঠলাম......।"

বিশ্ব বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন, স্ট্যালিন প্রমুখেরাও সাধারণ মানুষ বা দেবতা ছিলেন না—বিপ্লবী মহানায়কই তাঁদের বাস্তব পরিচয়।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণের পর সাংগঠনিক ব্যবস্থায় বাড়ি ছেড়ে অনেকের আত্মগোপন করে দিন কাটানো, অন্তরীণ অবস্থায় নানা বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে কল্পনার ফেরারী জীবন অতিবাহিত করার কর্মসূচী এবং ক্রিকেট মাঠে ইংরেজ শাসকদের উপর আবার আক্রমণ চালাবার প্ল্যান স্থির করবার কাজে মাষ্টারদার পথ-পরিক্রমা চলতে লাগলো।

এই সময় আরও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার কথা বলা দরকার। ১৯৩২ সালের পয়লা মার্চ "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" প্রথম মামলায় আমরা দণ্ডিত হলাম। আমাদের মামলা চলা কালেই, ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে, অম্বিকাদা ধরা পড়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল অম্বিকাদা জেল-হাজতে বন্দী আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার যেন আর মামলা সুরু করতে চাইছিলেন না। মাসের পর মাস বিনা বিচারে জেল-হাজতে বন্দী করে রাখা আইন-বহির্ভূত। বিচার করার ক্ষমতা থাকে তো বিচার কর—চার্জশীট্ দাখিল কর, নাহলে মুক্তি দাও। তারপরেও যদি বন্দী রাখা প্রয়োজন মনে কর তাহলেও-বা তোমাদের অসুবিধা কি ? বিনা বিচারে আটক রাখার অস্ত্র Bengal ordinance' তো তোমাদের হাতেই আছে। তবু কা কস্য পরিবেদনা !

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারকে ঘোমটার আড়াল থেকে বেড়িয়ে এসে বাধ্য হয়েই তাড়াতাড়ি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে অম্বিকাদার বিরুদ্ধে মামলা সুরু করতে হোল।

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টের ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রান্ত হয়। এর পরও সরকার যদি অম্বিকাদার ফাঁসির জন্য তৎপর না হয় তবে তাঁদের শত্রু মিত্র উভয় পক্ষেরই মনে বহু প্রশ্ন জাগতে পারে। কাজেই আর দেরী করা চলে না। ক্লাব-আক্রমণের প্রায় দু' মাস পরে, ১৯৩২ সালের ২২শে নভেম্বর, অম্বিকাদার বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়ে যথারীতি বিচার আরম্ভ হোল। ধরা পড়বার প্রায় দু'বছর তিন মাস পরে এই বিচার প্রহসনের সুরু। এই সুদীর্ঘকাল অম্বিকাদাকে জেল-হাজতে রেখে দিয়ে সরকার পক্ষে উদাসীন থাকার কি কারণ বা যৌক্তিকতা ছিল? বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এর কারণ উদ্‌ঘাটিত করা প্রয়োজন মনে হয়। বিশেষ স্থানে সে আলোচনা করবো।

মনে রাখা দরকার, আমাদের বিচারের রায় প্রদত্ত হয়েছিল ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ। অর্থাৎ, আমাদের জাজ্‌মেণ্টের দশ মাস পরে অম্বিকাদা এবং যুব-বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হেমেন্দুবিকাশ দস্তিদার ও সরোজকান্তি গুহ এই দু'জনের বিরুদ্ধে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" দ্বিতীয় মামলার আরম্ভ।

সরকার পক্ষে মামলা রুজু করার নিয়ম অনুসারে পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অম্বিকাদা ও অপর দু'জনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। সেই দরখাস্তের হুবহু নকল নিয়ে লিপিবদ্ধ হোল:—

"Petetion of complaint by V.W.F. Hicks, Superinrendent of Police, Ex. I.

"In the court of the Commissioners appointment under sub sections (1) and (2) of selection 4 of the Bengal Criminal Law Amendment Act, 1925, at Chittagong.

In the matter of

V. W. F. Hicks……Complainant

Versus

(1) Ambica Charan Chakraborty.
(2) Hemendu Bikash Dastidar alias, Barakhoka.
(3) Saroj Kanti Guha
} Accused.

Sections 121, 121-A and 122, P. C.
The humble petitition of V. W. F. Hicks. the complainant above named.

RESPECTFULLY SHEWETH :

1. That your petitioner is the Superintendent of Police, Chittagong.

2. That between September, 1928, and September, 1930, the accused persons along with Ganesh Ghosh, Ananta Singh, Lokenath Bal and others (convicted in the Main Armoury Raid Case) and Naresh Roy, Tripura Sen, Ardhendu Dastidar, Bidhu Bhattacharjee, Hari Gopal Bal, Hemangshu Bimal Sen, Debu Gupta, Rajat Sen, Jibon Ghosal, Swadesh Ray, Amarendra Nandy, Nirmal Sen and others (who are dead) and Surja Sen, Bhabatosh Bhattacharjee, Tarakeswar Dastidar and others (who are yet absconding), were parties to a criminal conspiracy *to wage war against the king and deprive His Majesty of the Sovereignty of British India* or any part thereof and to overawe by means of criminal force or show of criminal force to the Government of India or the Local Government.

3. That in pursuance of the aforesaid conspiracy the accused persons collected men, arms and ammunitions, purchased motor cars, iron implements, leather requisites uniforms, and made all necessary preparations *with the intention of waging war against the king.*

4. That on the night of 18th April, 1930, the accused persons and their party *in fact waged war against the king* or abetted the waging of such war and raided the Polic Lines, Armoury and Magazine, the A. F. I. Headquarters Armoury, the Telephone Exchange, shot down sentries and officers,

looted arms and ammunitions, and were engaged by the Police in an action at the Police Lines.

5. That the party of the accused persons came in military uniform with the requisites of war and after their depredations marched away and the main body continued their movements in the hills to the north of the town till the evening of the 22nd April, 1930, when there was a heavy engagement at Jalalabad between them and the forces detailed by the authorities, after which they dispersed, leaving 12 of them dead or dying.

6. That on the same night four of the members of the accused's party opened fire upon the Police who had arrested them on suspicion at the Feni Railway Station and escaped.

7. That in the night of 6th May, 1930, sin insurgents were pursued by the villagers and the Police at Kalarpole; they opened fire killing and wounding some villagers, later killed a constable at the kalarpole outpost and eventually there was an action between the Police and four of them at Jhulda and the four rebels were killed.

8. That on the morning of 2nd of September, 1930, there was an encounter between four of the accused's party and the Police at Chandernagore; Ganesh Ghose, Lokenath Bal and Ananda Gupta were arrested and Jibon Ghoshal was killed.

9. That there was a trial in the main case which ended on 1st March, 1932, of 12 persons······

10. That the present accused and others were absconding when the trial started and the accused Ambica Charan Chakravarti was arrested in October, 1930, in village Kachuai, P. S. Patiya.

11. That the accused Saroj Kanti Guha was arrested on 3rd August, 1932, at Dharampur, P. S. Kotwali in the district of Noakhali where he was passing under the name of Sailesh Chandra Roy and working as a private tutor on Rs. 4 per month.

12. That the accused Hemendu Dastidar alias Bara-khoka was arrested on 28th August, 1932, while coming out of mess at 130, Manicktolla Street, Calcutta, by the Police ; he gave his name as Surendranath Roy at the time of arrest, but he had been living in the mess and had signed the mess register as Kshitish Chandra Roy.

13. That there is sufficient evidence to connect the accused persons with offences under sections 121, 121A and 122, I. P. C.

14. That the requisite order of the Local Government authorising your petitioner to prefer this complaint has been obtained and a copy of the order is filed herewith.

Under the circumstances your petitioner prays that the commissioners will be pleased to take cognizance of the case and try the three accused persons for offences under sections 121, 121-A 122 of the Indian Penal Code.

And your petitioner as in duty bound shall ever pray.

Sd. V. W. F. Hicks,

Supdt. of Police, Chittagong."

(Emphasis mine).

From Criminal Bench.

Reference No. 8 of 1933 and Apeal No. 134 of 1933 and also Apeal No. 135 of 1933.—Page : 9, 10, 11).

উপরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা সরোজকান্তি গুহ ও হেমেন্দু বিকাশ দস্তিদার সম্বন্ধে সামান্য কিছু মাত্রই জানতে পারলাম—কি ভাবে ও কোথায় তারা ছিল এবং সেই সময়ে তারা কি ছদ্মনাম ব্যবহার করতো। পুলিশ সাহেব

হিস্কের দরখাস্ত অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ও দু'জন কমিশনারকে নিয়েই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় এবং তাঁদের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন :

(1) Mr. A. Dec. Williams, I. C. S.

District and Session Judge, Chittagong.

(2) Mr. A. F. M. Rahman, I. C. S.

Addl. District and Session Judge, Maimansingh.

(3) Mr. Nrisinha Ranjan Mukherjee, Addl. Disttict Magistrate and Collector Chittagong.

পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে এই পুস্তকের গোড়ার দিকে আমি কিছু কিছু সরকারী গোপন ডকুমেন্টস্ উদ্ধৃত করেছি। সেইসব ডকুমেন্টে সরকারী চক্রান্ত ও তাদের প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাবের তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। Mr. H. Williamson, Director, Intelligence Buroue লিখেছেন—"Seen and retained with thaks. The remedy in future (there is an remedy applicable to the 12 murdered and unavenged policemen and soldiers) is to appoint judges, men who will not flinch from their duty I have suggested elsewhere that the field of recruitment for such tribunals should be extended to other provinces."

অম্বিকাদার বিচারার্থে যে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে তা'তে প্রেসিডেন্ট ও অপর দু'জন কমিশনারই Active service-এর লোক এবং এই দু'জনেই I. C.S.—একজন মৈমনসিং-এর Addl. Judge ও আর একজন চট্টগ্রামের Addl. Magistrate। বেশ জবরদস্ত ট্রাইব্যুনাল বলতে হবে। বিচারও যথাসম্ভব শীঘ্র আরম্ভ হবে ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী অম্বিকাদার প্রাণদণ্ড, সরোজকান্তি গুহের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, হেমেন্দুবিকাশ দস্তিদারের মুক্তিদানে আটত্রিশ দিনে সমাপ্ত হোল।

সেই সময় বড়লাট লর্ড উইলিংডন এবং বাংলার ছোটলাট স্যার জন এণ্ডার্সনের শাসনযন্ত্রের ষ্টীমরোলারের নিস্পেষণ অবাধ গতিতে চলেছে। বৃটিশ প্রেষ্টিজ রক্ষায় বদ্ধপরিকর-জাঁদরেল ট্রাইব্যুনাল ন্যায় বিচারে—অম্বিকাদাকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে কি পারেন? তবে এই বিচারকেও আমি প্রহসন আখ্যায় ভূষিত করছি কেন? যথাস্থানে এই তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যার ইচ্ছা রইল। ১০ই ফেব্রুয়ারী ট্রাইব্যুনালের রায় প্রদত্ত হোল এবং সাতদিনের

মধ্যেই অর্থাৎ, ১৯৩৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর ভিতর সরকার হাইকোর্টে আপীল করবার অনুমতি দিলেন।

অম্বিকাদা ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন; আপীল নিশ্চয়ই হবে কিন্তু আপীলের ফলাফলও অনিশ্চিত! তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা চলবে না, আশু সমাধান চাই—মাস্টারদার কাছে এই সমস্যা খুব সংকট হয়ে দেখা দিল।

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" প্রথম নম্বর মামলায় আমাদের (লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী ও অনন্ত সিংহ) গুলীতে নরহত্যা ও সরকারী সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি সাধন সম্পর্কে সরকারপক্ষের অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ মজুদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কারও প্রাণদণ্ড না হওয়াতে—অম্বিকাদার ফাঁসির হুকুম হতে পারে এ আশঙ্কা মাস্টারদা করেননি। অম্বিকাদার মামলাতেও যদিও প্রথম মামলার সাক্ষ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তবু অম্বিকাদাকে আমাদের মত প্রত্যক্ষ হত্যাপরাধে লিপ্ত করবার মত সরকারপক্ষের কোন সাক্ষী ছিল না। কাজেই ট্রাইব্যুনাল বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হওয়াতে দেশবাসী ও আইনজ্ঞদের সকলের মনেই একই প্রশ্ন—এ কি সম্ভব! একই সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করে প্রথম মামলাতে কাউকেই চরম দণ্ড দেওয়া হয়নি, অথচ ইনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন—এ যে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ঘটনা! তবু এই বাস্তব সত্যই বাংলার লাট স্যার্ জন এণ্ডারসনের প্রতিহিংসা নীতির ঐতিহাসিক দলিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপ্লবীদের মৃত্যুবরণে আবার সমস্যা কি? কেউ হয়ত সাম্রাজ্যবাদীর ফাঁসিকাষ্ঠের শহীদবেদীতে প্রাণ দান করেন আবার কেউ বা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গুলীতে আত্মাহুতি দিয়ে ভবিষ্যতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্রতর করে এগিয়ে দেবার সোপান রচনা করেন। এই রক্তক্ষরা পথে মৃত্যু কখনও ফাঁসির বরণ-মাল্য হাতে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসবে, কখনও বা মহাসমারোহে রণবাদ্য বাজিয়ে রাইফেল ও মেসিনগানের গুলি বর্ষণে বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানাবে!

অম্বিকাদার ফাঁসির হুকুম হয়েছে; আপীল করার অনুমতি পাওয়া গেছে, আপীলের জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হবে এবং আপীলের শুনানীও হবে—তারপর এণ্ডারসনী শাসনের আমলে অনিবার্য ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটা যে সম্ভব নয়, সে সম্বন্ধে মাস্টারদার স্থির ধারণা ছিল।

আই. জি. পুলিশভ্রমে তারিণী মুখার্জীর হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণ-

দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। হাইকোর্টের আপীলে তার মৃত্যুদণ্ডও রহিত হয়নি। ফাঁসির বরণমাল্য ভূষিত রামকৃষ্ণ চিরবিদায় নিয়েছে। অম্বিকাদাকে সাদর আলিঙ্গনে বক্ষোলগ্ন করবার জন্য সুনিশ্চিত পদক্ষেপে মৃত্যু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আর কয়েক মাস মাত্র বাকী। মাস্টারদার মনে ঝড়ের তোলপাড়। সাম্রাজ্যবাদীর এই ফাঁসির ব্যবস্থা কি ব্যর্থ করে দেওয়া যায় না?

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হয় তাদেরই জেলা আদালতে। রায় দেবার পর কর্তৃপক্ষ সুবিধামত দণ্ডিত ব্যক্তিদের অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করেন। অম্বিকাদা ও সরোজকান্তি গুহকে সাতদিনের মধ্যে, অর্থাৎ ১৩৩ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই আপীল করবার অনুমতি দিয়ে চট্টগ্রাম জেল হতে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তারা হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত পাঠান। আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেল থেকে হাইকোর্টে আপীলের তদ্বির করা অম্বিকাদার পক্ষে যদিও সুবিধাজনক ছিল, কিন্তু মাস্টারদার সমস্যা গুরুতর রূপ নিল। সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার পক্ষে কলকাতায় গিয়ে এই কয়টি মাসের মধ্যেই জেল থেকে অম্বিকাদাকে উদ্ধার করে আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই পরিস্থিতিতে মাস্টারদা দুটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করবার বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন। যদিও এই দু'টি কর্মসূচীও সাংগঠনিক শক্তির উপরেই নির্ভরশীল, তবু মাস্টারদা চিন্তা করেছিলেন—অম্বিকাদার ফাঁসির বিনিময়ে কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রতিভূকে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, অথবা কোন উচ্চপদস্থ সরকারী ইংরেজ কর্মচারীকে জামিন স্বরূপ বিপ্লবীদের হাতে বন্দী থাকতে হবে, অম্বিকাদার যদি ফাঁসি হয় তবে তাঁকেও অনুরূপভাবেই প্রাণ দিতে হবে।

দু'বছর ধরে আমরা যখন চট্টগ্রামে আমাদের মামলা চালাচ্ছিলাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তখন আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলের নির্জন কক্ষে ফাঁসির অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছিল। সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবার জন্য আমাদের সাথী অর্দ্ধেন্দু গুহ মারফত আমরা জেল থেকেই মাষ্টারদাকে একটি বিস্তারিত ও সক্রিয় প্ল্যান পাঠাই। অর্দ্ধেন্দু গুহ আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সে তখন জামিনে মুক্ত ছিল। মামলার সময় প্রতিদিন তাকে আমাদের সঙ্গে আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত থাকতে হোত। এই অবস্থায় অর্দ্ধেন্দু পনেরো মণ বন্দুকের বিস্ফোরক পাউডার ও ল্যাণ্ডমাইন প্রস্তুত করে এবং এই জামিনে

মুক্ত অবস্থার সুযোগে সে আমাদের ও মাষ্টারদার মধ্যে নিয়মিত সংযোগ বজায় রাখে। তারই মারফত আমরা মাষ্টারদার কাছে চট্টগ্রাম 'জেলা-শাসক' বা 'বিভাগীয় কমিশনারকে' রামকৃষ্ণের জীবনের বিনিময়ে 'Hostage' (জামিনে বন্দী) রাখার প্ল্যান পাঠাই। সাহেবকে বন্দী করবার এই কাজে ক'জন যাবে, তাদের হাতে কি কি অস্ত্র ও কিরূপ হাতকড়া থাকবে, অজ্ঞান করাবার জন্য কি ওষুধ ব্যবহার করা হবে ও কিভাবে তা' প্রয়োগ করবে, আমাদের কয়টি গাড়ী যাবে ও কোন স্থানে সাহেবের গাড়ী আটক করা হবে, কি ভাবে সাহেবকে গাড়ীতে তোলা ও নামানো হবে, অতর্কিতে কিভাবে রিভলভার বাগিয়ে কি ভাষায় ও কি রূপ ভারী গলায় ছোট ছোট কথায় সাহেবকে কম্যাণ্ড করা হবে—এই সমস্তই বিশদভাবে মাষ্টারদাকে লিখে জানাই। তা'ছাড়াও "জামিনে বন্দী" সাহেবকে কি ধরণের গৃহে আটক রাখা হবে তাও জানিয়েছিলাম। সর্ব প্রকারে আরামপ্রদ আধুনিক সরঞ্জাম যুক্ত যে ঘরটিতে সাহেবকে আটক রাখা হবে প্রয়োজনে ডিনামাইটের সাহায্যে সেই ঘরটি যাতে নিমেষে উড়িয়ে দেওয়া যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বক্ষণ আমাদের প্রহরী মোতায়েন থাকবে এবং কিরূপ সজাগ হয়ে পাহারা দিতে হবে তারও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। এইভাবে Hostage রাখতে কোন গোপন বাড়ির প্রয়োজন নেই বলেই জানাই। চট্টগ্রামে তখন পুলিশ ও মিলিটারীর কঠোর দমন নীতি চলেছে। একজন ইংরেজ জেলা শাসককে "জামিনে বন্দী" রাখার মত গোপন বাড়ি সংগ্রহ করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই গোপন বাড়ির পরিবর্তে রাজ পথের উপরেই একটি বাড়ি চেয়েছিলাম যার গায় বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে—"এ গৃহে রামকৃষ্ণের জীবনের বিনিময়ে জীবনদানে প্রস্তুত হয়ে 'জামিনে বন্দী' জেলা শাসক অপেক্ষারত, পুলিশ যেন তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা হতে বিরত থাকে। কারণ, "জামিনে বন্দী" সাহেবের অতর্কিত উদ্ধার চেষ্টায় এই বাড়িটি ডিনামাইট্ বিস্ফারণে, নিমেষে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

আমাদের এই প্ল্যানটি পেয়ে মাষ্টারদা অর্দ্ধেন্দুর মারফত খবর পাঠিয়ে-দিলেন—

… …অপূর্ব প্ল্যান। এতে নিখুঁত ভাবে তোমরা সব বলেছ। এই প্ল্যান কার্যকরী হলে ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে এক অভিনব আদর্শ থাকবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সংগঠনে এইরূপ কাজের উপযুক্ত ক্যাডার কোথায়? যদি নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, টেগ্‌রা, রজত, প্রমুখ বিপ্লবী সাথীরা আজ বেঁচে

থাকতো তবে একজন জেলা-শাসককে অনায়াসে আমরা 'জামিনে বন্দী' করে আনতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে সেইরূপ সাহসী ও শারীরিক শক্তির অধিকারী বিপ্লবী সাথীর একান্ত অভাব। তাই ইচ্ছে থাকলেও এইরূপ বাস্তব ও সক্রিয় প্ল্যানটিকে আপাততঃ আমাদের বাদ দিতে হচ্ছে......।"

অর্দ্ধেন্দু আদালতের কাঠগড়ার মধ্যেই এই কথাগুলো আমাকে বলেছিল। অর্দ্ধেন্দু এখনও সুস্থ শরীরে বর্তমান।

এরও প্রায় আড়াই তিন বছর পরে—অম্বিকাদার ফাঁসির বিনিময়ে Hostage রাখার প্ল্যান কার্যকরী করার মত সাংগঠনিক শক্তি থাকার কথা নয়। কারণ, ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে—বিপ্লবীরা অনেকে প্রাণ দিয়েছেন ও অনেকে কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করছেন। স্বল্প শক্তি নিয়ে চট্টগ্রাম জেলার বাইরে কলকাতা মহানগরীতে গিয়ে জেল ভাঙ্গার চেষ্টা বা Hostage রাখার প্ল্যান বাধ্য হয়েই মাষ্টারদাকে বাতিল করতে হয়েছে।

চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার মাঠে উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা মিলিত হন, এ তথা আগেই জানা ছিল। ক্রিকেট খেলার মাঠে সরকারী ইংরেজ কর্মচারীদের উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা ছিল। চোখের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত—রক্তের বদলে রক্ত—প্রাণের বদলে প্রাণ চাই। বাংলার তরুণবৃন্দ নির্বাক দর্শকের মত নিশ্চল হয়ে অম্বিকাদার ফাঁসি দেখবে—এ যে চিন্তারও বাইরে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মাষ্টারদার নির্দেশে ক্রিকেট খেলার মাঠে আক্রমণ চালাবার প্ল্যানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য প্রস্তুত হলেন। নতুনভাবে আক্রমণের এই প্রস্তুতি পর্বে, মাষ্টারদা যখন সাংগঠনিক সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তরুণদের মধ্যে নতুন সাড়া জাগাতে চেষ্টা করলেন, তখন কে জানতো মহানায়ক বিপ্লবী সূর্য সেনের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ বিস্তৃত শত্রুর জাল তাঁকে বেষ্টনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? কে জানতো ঘরের শত্রু বিভীষণ মাষ্টারদার এত দিনের দক্ষতা, এত বৈপ্লবিক পারদর্শিতা ও অপরিসীম চাতুর্যকে পরাস্ত করতে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘোর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে? কে জানতো ছদ্মবেশী মিত্র ছদ্মবেশের সুযোগ নিয়ে এই মহানায়কের বৈপ্লবিক ফেরারী কর্মজীবনের অবসানকল্পে ছিদ্রপথে এগিয়ে আসছে?

১৯২৪ সালে সারা বাংলায় বিনা বিচারে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে আমরা অনেকেই একসঙ্গে বন্দী হয়েছিলাম। সেই রাত্রে মাস্টারদা চট্টগ্রামের যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ি, গণেশ ও অম্বিকাদার বাড়ি এবং আমার বাড়ি

পুলিশবাহিনী রাইফেল হস্তে ঘেরাও করে ও আমাদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে জেলে পাঠায়। কিন্তু মাস্টারদা সেই পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে বাড়ির পিছনের কোন এক গুপ্ত পথে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কয়েক বছর ধরে আত্মগোপন করে থেকে মাসের পর মাস তিনি বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করেন। তারপর আসাম যান ও ইউ, পিতে সচীন সান্ন্যালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলা, আসাম ও উত্তর-প্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে আক্রমণ চালাবার সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণের চেষ্টা করেন। রেলে, ট্রামে, বাসে, রাজপথে দিনের পর দিন মাস্টারদাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এবং বহুবারই প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছেন। কখনও মিথ্যা নাম বলেছেন, কখনও উদভ্রান্ত বা নির্বোধ পথিকের ভান করেছেন। কখনও মুসলমানের পোষাকে, কখনও বা নগ্ন-গাত্র দীন-দরিদ্র পুরোহিতের বেশে বাংলার দুর্দ্ধর্ষ পুলিশদলকে বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় করে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তারপর রাজাবাজারের তিনতলা বাড়িটি ঘিরে পুলিশ যখন তিনতলার একটা ঘর ভেঙ্গে প্রমোদ চৌধুরীদের গ্রেপ্তার করলো, সেই দিনও মাস্টারদা সেই দুর্ভেদ্য পুলিশ ব্যূহ হতে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তিনতলা থেকে ড্রেন-পাইপ দিয়ে নেমে অন্ধকার গলির মধ্যে তিনি উধাও হন। ১৯৩০ সালের যুব-বিদ্রোহের পর প্রায় চার বছর ধরে পুলিশের বিভিন্ন চক্রান্ত ব্যর্থ করে চট্টগ্রাম জেলায় ফেরারী জীবন অতিবাহিত করেন তিনি।. তাঁর জন্য নানাভাবে পুলিশের ফাঁদ পাতা ছিল এবং নানা রকমের টোপ ফেলা ছিল। যাতে তিনি কোনমতে একবার সে ফাঁদে পা দেন বা কোন অসতর্ক মুহূর্তে লোভনীয় টোপটি গিলতে এগিয়ে আসেন! পুলিশের সমস্ত আপ্রাণ চেষ্টাই তিনি ব্যর্থ করেন। কোন নির্ভীক বিপ্লবী তরুণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে কোন সূত্রে ঠিক হলেও পূর্ব মনোনীত স্থানে মাস্টারদা কখনই যেতেন না। স্কাউট্ পাঠিয়ে আগে অবস্থা নিরীক্ষণ করাতেন এবং নির্দেশমত তাঁর মনোনীত স্থানেই "আগন্তুককে" দেখা করাতে নিয়ে আসা হোত। কোন বিপ্লবী সাথী বা দরদী বন্ধু নিজ হাতে অর্থ সাহায্য দেবেন বলে খবর পাঠিয়ে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেও মাষ্টারদা তাঁর নিজের ব্যবস্থা অনুযায়ীই এইরূপ দেখা সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রিত করতেন। পুলিশকে ধাপ্পা দিয়ে গোয়ালার বেশে কখনও তাঁকে গোয়াল হতে গরু নিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে, কখনও বা কাপড়ের বোঁচকা মাথায় ধোপার মত পুলিশের পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন তিনি। মাষ্টারদাকে গ্রেপ্তারের

জন্য পুলিশী তৎপরতার অন্ত ছিল না। এত সাবধানতা সত্ত্বেও তাঁকে ধলঘাটে মিলিটারী কর্ডনের মধ্যে পড়তে হয়েছিল—কিন্তু সেখান থেকেও তিনি নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। জৈষ্টপুরা গ্রামের বাড়ি থেকেও পুলিশের বেড়াজাল ভেদ করে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান।

ক্রমবর্দ্ধমান হারে মাষ্টারদার মাথার মূল্য বেড়েই চলেছে। সরকার পুরস্কারের পর পুরস্কার ঘোষণা করছেন। ট্রেন, ষ্টেশন, বাজার, স্কুল-কলেজ, আদালত-প্রাঙ্গণ—সর্বত্র মাষ্টারদার ছবি সমেত পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তিতে ছেয়ে গেছে। মাষ্টারদার নিরাপত্তার জন্য চট্টলবাসী হয়ত প্রতিদিনই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। মাষ্টারদাকে সরকার গ্রেপ্তার করবে--এ কথা চট্টলবাসী যেন চিন্তাতেও স্থান দিতে চাইতেন না। সবাইকে নিরাশ করে সবার আশাআকাঙ্ক্ষা নিশ্চিহ্ন নির্মূল করে কে জানতো ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ঘোর অমঙ্গলের মসীকৃষ্ণ যবনিকা চট্টগ্রাম তথা সারা বাংলাদেশ ঢেকে নেমে আসবে?

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ শান্ত গহন রাত্রি—প্রায় দুটো। গৈরলা গ্রামের এই নির্জন স্তব্ধ নিশীথ পরিবেশ হঠাৎ চঞ্চল শব্দমুখর হয়ে উঠ্‌লো কেন? প্রায় বছরখানেক আগে এমনি এক নিশীথ রাতে ধলঘাট গ্রামও হঠাৎ সচকিত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ক্যাপ্‌টেন কেমারনের পরিচালনায় সরকারের সৈন্যদল অতর্কিতে সাবিত্রী মাসীমার বাড়ি ঘেরাও করেছিল। নির্মলদার গুলীতে কেমারন সাহেব প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতাকে বন্দী করতে অক্ষম প্রাণ দিয়ে সশস্ত্র সৈন্যদল ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

ধলঘাট থেকে দু'মাইল দূরে এই গৈরলা গ্রামে গভীর ঘোর অন্ধকারে আজ আবার মিলিটারীর এই গোপন অভিযান কা'দের বিরুদ্ধে? কে সে? কা'র গোপন ইঙ্গিতে ক্যাপ্‌টেন্ ওয়ামস্‌লে (Capt. Waumsley) পুলিশ ও মিলিটারীর সুবিশাল বহর নিয়ে চলেছেন? নির্ভীক ক্যাপ্‌টেন্ ওয়ামস্‌লের কি থেকে থেকে বন্ধু কেমারন সাহেবের শোচনীয় পরিণতির কথা মনে পড়ছে না? তিনি নির্ভীক সৈনিক বটে, তাই সাবধানতা অবলম্বন না করার মধ্যে সাহসের পরিচয় পাওয়া গেলেও মূর্খতার গ্লানি থেকে তো রেহাই পাবেন না! তাঁকেও হয়ত তাহলে বন্ধু কেমারনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অমূল্য প্রাণটি দান করতে হবে।

ওয়ামস্‌লে সাহেব কেবল সৈন্যদল সঙ্গে নিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, পথ-নির্দেশের গোয়েন্দা পুলিশ ও কতিপয় অ্যাসিস্‌টেন্ট সাব-ইন্সপেক্টারকেও সঙ্গী করলেন।

পথ ভুল হলে চলবে না। ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে হবে। বাড়ি ঘেরাও করে নির্দিষ্ট পথে আচম্‌কা ঘরে ঢুকে বিপ্লবীদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে সাহেব একটি সুপরিকল্পিত প্ল্যান নিয়েই আসরে অবতীর্ণ হলেন।

গৈরলা গ্রামে মাসীমা ক্ষীরোদবালা বিশ্বাসের এই বাড়িটি, জমিদার নেত্র সেনের ছোট ভাই ব্রজেন সেন বিপ্লবীদের নিরাপদ গোপন আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহারের জন্য যোগাড় করেছিলেন। সেই রাতে মাষ্টারদা, মণি দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, ব্রজেন সেন, সুশীল দাসগুপ্ত ও কল্পনা দত্ত সেই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। এই বাড়ির সন্ধান নিশ্চয়ই আগে থেকেই পুলিশের জানা ছিল। এই বাড়িতে মাষ্টারদাকে সদলবলেই গ্রেপ্তার করতে পারবেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই গভীর রাতে ক্যাপ্‌টেন্ ওয়ামস্‌লে সৈন্যদল সঙ্গে উপস্থিত হলেন। বিপ্লবীদের তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় পেতে চান। তাই যথাসম্ভব লঘু পদক্ষেপে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়িটিকে ঘেরাও করবার Tactical advantage নিতে ফৌজী ক্যাপ্‌টেন্ ওয়ামস্‌লে কসুর করলেন না।

শত্রুর এই গোপন অভিযানের সংবাদ বিপ্লবীদের পক্ষে আগে জানা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলে মাষ্টারদার নেতৃত্বে অতি সামান্য হলেও— পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে "পাল্টা গোয়েন্দাগিরি" করার ব্যবস্থা ছিল। তবে পাল্টা ব্যবস্থা থাকলেও—কারও পক্ষে—এমন কি খুব শক্তিশালী সরকারের পক্ষেও প্রতিপক্ষের সকল গোপন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়— এই বাস্তব ধারণা মাষ্টারদা কখনও হারান নি। তিনি জানতেন দলের ভিতরে ও বাইরে পুলিশের গুপ্তচর থাকবেই এবং কোন-না-কোন অসতর্ক মুহূর্তে তারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সুযোগ নেবে এবং অধিকতর শক্তিশালী বলেই অনেক ক্ষেত্রে বেশী সুবিধের অধিকারী হবে।

অতর্কিত আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য বিপ্লবীরা প্রহরার ব্যবস্থা রাখতেন। মাষ্টারদা যে বাড়িতে আশ্রয় নিতেন সেই বাড়ির নিরাপত্তার এবং মাষ্টারদা পুলিশের কবলে পড়বার আগেই যাতে উধাও হতে পারেন যতদূর সম্ভব তার ব্যবস্থা রাখা হোত। খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, মাষ্টারদার নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়েই পুলিশ বাড়িটিতে হানা দিয়েছিল।

পুলিশ ও মিলিটারীর শত গোপনীয়তা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা তাদের আগমন বার্তা টের পেয়ে গেলেন। পুরো বাড়িটি ঘেরাও হবার আগেই ফিস্‌ফিস্ করে বিপ্লবীদের কানে কানে খবর পৌঁছে গেল—"পুলিশ! পুলিশ!" নিমেষে

প্রত্যেকে শত্রুব্যূহ ভেদের চেষ্টায় প্রস্তুত হয়ে উদ্যত রিভলভারের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

অতর্কিতে আক্রান্ত হলে ঠিক সেই মুহূর্তে কি কর্তব্য, কি কৌশল বা চাতুর্যের প্রয়োগ প্রয়োজন—মনের এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব শত মানসিক প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবীদেরও যে সাময়িক ভাবে বিচলিত করে তোলে তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি এবং আশা করি সকলেই নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে স্বীকার করবেন—১৮ই এপ্রিল Water works এর একটি প্রকোষ্ঠ হতে হঠাৎ মেশিন-গানের গুলী বর্ষণ সুরু হওয়াতে কা'র কি মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল! জালালাবাদে আচমকা আক্রমণোদ্দেশ্যে উদ্যত সঙ্গীন হস্তে গুর্খা বাহিনীকে পাহাড় বেয়ে উঠতে দেখে বন্দুকে হাতে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মির চট্টগ্রাম শাখার মৃত্যুভীতি শূন্য বিপ্লবী সৈনিকদলও সাময়িক ভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। রজতের বাড়িতে হঠাৎ পুলিশের হামলায় চারজন সশস্ত্র বিপ্লবীকেও কি বিপদ-শঙ্কায় চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত করে তোলে নি? চন্দননগরে স্যার্ চার্লস্ টেগার্টের মধ্যরাত্রির গোপন অভিযান মুহূর্তের জন্য হলেও কি আমাদের ফেরারী বন্ধুদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয় নি?

যতবড় দুঃসাহসীই হই না কেন, মৃত্যু ভয়হীন প্রাণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য সদা সর্বদা যতই প্রস্তুত থাকি না কেন, অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ প্রাপ্ত শত্রুই যে প্রাথমিক অবস্থার সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবে তা'তে কোন দ্বিমত নেই। তেমন পরিস্থিতিতে প্রাথমিক প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠে যত শীঘ্র সম্ভব শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারলেই অবস্থা অনুকূলে আসার সম্ভাবনা থাকে।

মাষ্টারদাদের আর এক মুহূর্তও দেরী করার উপায় নেই. বাড়িটি এখনও হয়ত শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলতে পারেনি। বাড়িতে থেকে যুদ্ধের মোর্চা তৈরী করে লড়াই সুরু করবেন,—নাকি অসমান যুদ্ধ পরিহার করে মিলিটারী বেষ্টনী ভেঙ্গে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করবেন তা' নিয়ে চিন্তারও অবকাশ নেই—নিমেষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাষ্টারদা স্থির করলেন, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে শত্রুর বেড়াজাল ভেদের শেষ চেষ্টা করে দেখবেন কোন মতে যদি পুলিশের কবল হতে নিস্তার পাওয়া যায়।

বাড়ির পশ্চিমে একটি পুকুর। পুকুরের উত্তর পা'র বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে গিয়ে মিশেছে। এই পথে ঝোপ ও বাঁশ বনের আড়ালে আড়ালে

নিঃশব্দে উধাও হওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। ম্যাগাজিন রাইফেল হাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সতর্ক প্রহরারত মিলিটারী অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাপ্‌টি মেরে কোথায় বসে আছে কে জানে? অন্ধকারে নিজের অবস্থান গোপন রেখে কোন্ পক্ষ অপর পক্ষকে চমকিত ও বিস্মিত করে অতর্কিত আক্রমণে কাবু করবে—দু'পক্ষেরই আপ্রাণ চেষ্টা! অন্ধকারের সুযোগে নিরাপদ অবস্থানে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকার কৌশলের উপরেই এই খণ্ড যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছে।

পুলিশের গোয়েন্দা ও তিনজন পুলিশ সঙ্গে ক্যাপ্‌টেন্ ওয়ামস্‌লে পূর্বদিকে বাড়িটির সামনে চুপি চুপি এসে দাঁড়ালেন। সৈন্যদের উপর বাড়িটি ঘিরে ফেলার আদেশ দেওয়া ছিল। প্ল্যান অনুযায়ী সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে হাবিলদারেরা নির্ধারিত পথে এগিয়ে গেল। সকলেই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সেপাই—সব রকম গেরিলা রণ-কৌশলে পারদর্শী। কাজেই তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সামরিক নিয়ম ও কৌশল অনুযায়ীই নিয়ন্ত্রিত। মিলিটারীদল রাইফেল, রিভলভার ও সেই সময়কার আধুনিকতম মেশিন গান এবং চতুর্দিক আলোকিত করার উদ্দেশ্যে রকেট বোমা ফায়ার করার বড় পিস্তলে সুসজ্জিত। এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়টুকুও দু'পক্ষের কাছেই অতি মূল্যবান! কা'র কাজ আগে সম্পন্ন হবে! আগে বাড়ি ঘিরে ফেলা সম্ভব হবে—নাকি আগে বেড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বা প্রয়োজনে কে আগে গুলী চালাবে? জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ? নিঃশ্বাস রোধকারী মুহূর্ত।

মাষ্টারদা ও ব্রজেন সেন, শান্তি চক্রবর্তী ও সুশীল দাসগুপ্ত এবং কল্পনা ও মনি দত্ত—এই ভাবে দু'জন দু'জন করে ছয়জন বিপ্লবী তিনদলে বিভক্ত হলেন। পরামর্শ করে এই রূপ দল গঠনের সময় ও সুযোগ তাঁদের ছিল না অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামরিক কায়দায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়াও সম্ভব হোল না। অন্ধকারে মিলিটারীর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে অক্ষম বিপ্লবীরা শত্রু বেষ্টনী ভেদ করার কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হলেন।

সম্মুখে—বাড়ির পূর্বদিকে, সৈন্যদল সঙ্গে শত্রুপক্ষের উপস্থিতি মাষ্টারদারা টের পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা বাড়িটির উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই পথে প্রথমে শান্তি সুশীল এগোতে লাগলো এবং তাদের একটু পিছনে কল্পনা ও মনি দত্ত নিঃশব্দে পা বাড়ালো। মাষ্টারদা ও ব্রজেন সেন উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে বেরিয়ে একই পথে না গিয়ে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় দক্ষিণ দিক্ লক্ষ্য করে সন্তর্পণে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

নিস্তব্ধ নিশিথীনীর সূচীভেদ্য ঘোর অন্ধকার—একহাত দূরের জিনিষও চোখে পড়ে না! ছয়জন ফেরারী বিপ্লবী যতই সন্তর্পণে ও সাবধানে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে তাদের নাগপাশ হতে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করুক না কেন, ঝোপ-জঙ্গল, বাঁশবন ও শুক্‌নো ঝড়া পাতা পদে পদে তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতায় লিপ্ত হোল। মাঝে মাঝে খস্ খস্-পচ্ পচ্ মড্ মড্ শব্দে শত্রুকে জানিয়ে দিল যে বিপ্লবীরা পালাবার চেষ্টা করছে।

বাঁশবন, শুকনো পাতা, নর্দমার কাদা, প্রভৃতির সংস্পর্শে সৃষ্ট বিপ্লবীদের পায়ের শব্দের অনুরূপ শত্রুসৈন্যের তৎপরতার নানা ধ্বনি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিপ্লবীদের কানেও এসেছে।

পুকুরের খুব সরু পিচ্ছিল উত্তরেব পার দিয়ে শান্তি, সুশীল, মণি ও কল্পনা আগে-পিছে পথ চলেছে। নিকষ কালো ঘোব অন্ধকারের চাদরে চতুর্দিক ঢাকা। শান্তির হাতে ছোট্ট একটা টচ ও গুলী-ভরা রিভলভার' আন্দা মানে শান্তি চক্রবর্তীর মুখে শোনা—সে তখন মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্তটি ঠিক কি বেঠিক হয়েছিল সে সম্বন্ধে শান্তি তখন কিছু বলতে চাইছিল না, কারণ, তা' বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে গেল এবং যাব দায়িত্ব একমাত্র তারই, সে কথাই সে বললো—"কোন সুযোগে মিলিটারী বেষ্টনী হতে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে মাষ্টারদা ব্রজেনের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলেন। আমার মনে হোল উত্তর-পশ্চিম দিকে আমরা যদি বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য গুলী চালাই তবে হয়ত শত্রুপক্ষ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং সেই সুযোগে মাস্টারদার পালাবার পথ সুগম হবে। সূচীভেদ্য অন্ধকাবে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। একটুখানি আলোর সাহায্যে গমন-পথের সামান্য আন্দাজও যদি পাওয়া যায় তবে অনেকখানি আস্থা ও ভরসা নিয়ে এগোনো সম্ভব। তাই মুহূর্তে আমার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল—এক ঢিলে দুই পাখী মারবো। ছোট টচটি এক সেকেণ্ডের জন্য জ্বালালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে শত্রুর অবস্থান বুঝতে পেরে রিভলভারটি ফায়ার করলাম। আকস্মিকভাবে আমার টর্চের আলো ও রিভলভারের গুলীতে সম্মুখস্থ শত্রুসৈন্য বিচলিত হয়ে রাইফেল ফায়ার করতে সুরু করলো। শত্রুর রাইফেলের জবাবে আমরা মাত্র কয়েক রাউণ্ড ফায়ার করি। আমি ও সুশীল, কল্পনা ও মণি দত্তের কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। পুকুর ধার ধরে এগিয়ে গিয়ে আমরা দু'জনে কোন মতে মিলিটারী বেষ্টনী পেরিয়ে গেলাম। তারপরে সামনেই

ছোট একটি খাল বা খাদের মত একটি পরিখা। প্রথম গুলীটি ছোঁড়ার পর থেকে এই খালটি অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় এক মিনিট সময় অতিবাহিত হোল। এই এক মিনিটের মধ্যেই মিলিটারীর রাইফেলের বহু গুলী সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে। একটি গুলী আমার পিঠে লেগে হৃৎপিণ্ড ঘেঁষে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বুকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল (শাস্তির ক্ষত চিহ্ন আমরা সবাই আন্দামানে দেখেছি)। পিঠের স্যাপুলা অস্থিটি গুলীতে বিদীর্ণ। অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁ-হাতটি প্রায় অবশ হয়ে পড়লো—ডান হাতে তখনও রিভলভার ধরা। বহু দুর্যোগ—বহু দুরবস্থার মধ্যেও অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বাসী সাথী আমার রিভলভারটির স্পর্শ তখনও আমার মনে আশার সঞ্চার করছিল—তখনও ভাবছিলাম মিলিটারীর কবল থেকে হয়ত মুক্ত হতে পারবো। অঝোরে রক্ত ঝড়ছে—অতিরিক্ত রক্তপাতে সমস্ত শরীর ক্রমেই অবশ হয়ে আসছে! তবু মানসিক শক্তি ও সাহসে নির্ভর করে মায়ের ইঙ্গিতেই যেন আমি দ্বিগুণ উদ্দীপনায় পড়ি মরি করে ছুট্‌তে লাগলাম। মিলিটারীরা এবারে 'আলোক-বোমা' ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। সারা পথ মাঠ ঘাট 'রকেট-বোমার' আলোতে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। নিজেকে শত্রুর দৃষ্টির বাইরে রাখতে কখনও মাটিতে সটান শুয়ে, কখন ঝাড় জঙ্গলের আড়ালে, কখনও খানা-ডোবার সুযোগ নিয়ে, আবার কখনও বা হামাগুড়ির সাহায্যে প্রায় দু'শ' গজ এগিয়ে গেলাম। রাইফেল ফায়ার করা ও রকেট-বোমা ফাটানোর বিরাম নেই। আলোক বন্যায় উদ্ভাসিত আমাদের ফেলে আসা বাড়িটির চারিপাশ থেকে রাইফেল মুহুর্মুহু গর্জন করে চলেছে। মাস্টারদা আত্মগোপনে সক্ষম হয়েছেন কিনা তখনও আমি তা' জানি না।

"আমার পাশে আর কাউকে তখন দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম আমি ও সুশীল—আমরাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।......এতক্ষণে মনে হোল যেন মিলিটারীকে পিছনে ফেলে এসেছি। একেবারে নিরাপদ হয়েছি বা Danger Zone থেকে সম্পূর্ণ বাইরে চলে এসেছি বলে অবশ্য ভাবতে পারিনি। তা ছাড়া রাইফেলের গুলীতে যে রকম গুরুতর ভাবে আহত হয়েছি তা'তে জীবন কতখানি বিপন্ন তাও বুঝতে পারছিলাম না। তবে আমার যে আশু চিকিৎসা ও বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন তা' উপলব্ধি করে ছিলাম।......মনে পড়ে গেল হাবিলাশ দ্বীপের 'Amiable Shelter'—এর কথা—আমাদের দরদী বন্ধু রমণী চৌধুরীর বাড়ি। শেষ পর্যন্ত ভরসা করে তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে উঠ্‌লাম। তিনি আমাকে এরকম গুরুতর আহত

অবস্থায় দেখে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হয়ে আমার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের সাথী নেপাল আমার সঙ্গে এই আশ্রয়ে এসে রইল। আস্তে আস্তে আমি আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।·· ···মাস্টারদা ধরা পড়বার প্রায় সাত মাস পরে আমাকে ও নেপালকে এই বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়। অস্ত্র-আইনে আমাদের সাত বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্-ক্লাব আক্রমণে আমার সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা ও মাস্টারদার সঙ্গে গৈরলা গ্রামের বাড়িতে একত্রে অবস্থিতির কথা এবং রাইফেলের গুলীতে আমার বুক পিঠ ভেদ হয়ে যাওয়ার কথা· পুলিশের সম্পূর্ণ অগোচরেই থেকে যায়·· ··· ।"

সরকারী প্রেসে মুদ্রিত হাইকোর্টে মাস্টারদার আপীলের জাজমেণ্টের ২৪৬ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত :—

"The cordon was kept round the house ti!l morning when the inmates came out. The house and grounds were then searched by the police under his supervision. A trail of blood was found at the N.W. corner which he followed about 200 yards to the East, and then deputed Sailendra Kumar Sen, A. S. I., to follow up. After the first search was completed Captain Waumsley left with the Prisoners, Revolver, and ammunition and property found up till then."

এখানে সরকারী নথি থেকে জানতে পারছি দিনের বেলা প্রায় 200 গজ পর্যন্ত তারা রক্ত চিহ্ন অনুসরণ করে, কিন্তু কে আহত হয়েছে বা তার কি হোল শেষ পর্যন্ত তা' জানতে সক্ষম হয়নি।

রাতের সেই নিকষ কালো ঘোর অন্ধকার রকেট বোমার সুতীব্র আলোকচ্ছটায় খান খান হয়ে মিলিয়ে গেল—চতুর্দিক দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট! মাথার উপর দিয়ে কানের পাশ দিয়ে অবিরাম গুলীর স্রোত ছুটে চলেছে! যে কোন আড়ালের সুযোগ নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। সামনেই একটি পানাভরা এঁদো পুকুর। পরিষ্কার কি অপরিষ্কার সে বিবেচনার সময় বা অবস্থা নেই। কোনদিকে না তাকিয়ে কল্পনা ও মণি দত্ত দু'জনেই সেই পুকুরে নেমে পড়ল! গুলি চ'লছে—রকেট বোমার আলো ছড়িয়ে পড়ছে! জলের তলায় সমস্ত শরীর ডুবিয়ে—মুখটাকেও পানার স্তূপের আড়ালে ঢেকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কেবল নাকটুকু জলের উপরে রেখে

দুজনে নিঃসাড়ে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল যে মাথার উপর দিয়ে গুলী চলছে তা নয়, রিভলভার ও রাইফেলের গুলি সশব্দে এসে আশে পাশে জলের মধ্যেও পড়ছে। তারা আমাকে বলেছিল—"কেন যে গুলি লাগল না বা কেন যে আলোক-বোমার সাহায্যেও শত্রুপক্ষ আমাদের দেখতে পেলো না তা অঙ্কের হিসেবে বলা যাবে না। মোট কথা আমরা আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেলাম।"

তারা সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশী এই অবস্থায় ছিল। পুলিশ ও মিলিটারী বাড়িটির চারপাশ থেকে মাঝে মাঝে রাইফেল ফায়ার করে নিজেদের উপস্থিতি জানাচ্ছিল—যেন কেউ পালাতে চেষ্টা না করে। মিলিটারী ও পুলিশের এত আশা ও আকাঙ্খার শিকার—কল্পনা ও মণি দত্ত এক ফাঁকে আস্তে আস্তে পুকুর থেকে উঠে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ও ভোর রাত্রে পটিয়া থানার অন্তর্গত বাগদণ্ডী গ্রামে আমাদের বিপ্লবী সাথী লক্ষ্মণ দের গৃহে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। অন্যান্য সাথীদের ও মাস্টারদার শেষ পর্যন্ত কি হলো সে সংবাদের জন্য সকলেই ব্যস্ত—উৎকণ্ঠিত—কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করবার উপায় ছিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক ঘটনাই ঘটে—সাধারণ হিসেবে যার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না। সুশীল দাসগুপ্তও রাতের অন্ধকারের সুযোগে মিলিটারী বেষ্টনী হতে কোনমতে মুক্ত হলো। বিপক্ষ দল কারো সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত না হয়েই অন্ধকারেই চতুর্দিকে আন্দাজে গুলী ছুঁড়েছিল। শত্রুপক্ষের অস্ত্রসম্ভার প্রচুর—রাইফেল রিভলভারের টোটাও অফুরন্ত, তাই তাদের পক্ষে অবিরাম ধারায় ফায়ার করা অতি সহজ ও স্বাভাবিক—বিপ্লবীদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে টোটা ছিল না বলেই যে তাঁরা খুব সংযতভাবে গুলি চালাচ্ছিলেন তা নয়—শত্রুকে নিজের অবস্থান জানতে না দেওয়ার জন্যই তারা কম ফায়ার করছিলেন। সুশীল দাশগুপ্ত গুলি বর্ষণের মাঝখানে সামান্য বিরতির সুযোগ নিয়ে বাড়ীর কম্পাউণ্ডের নিচু বেড়া টপকে পার হতে যাচ্ছিলেন। খুবই স্বাভাবিক যে তাতে খস্‌খস্ মচ্‌মচ্ শব্দ হয়েছে। হয়তো সেই শব্দ লক্ষ্য করেই গুপ্ত স্থান হতে কোনো সৈনিক গুলী চালিয়েছে। আশ্চর্য! বোঁ করে গুলীটি এসে সুশীল দাশগুপ্তের রিস্টওয়াচে লেগে ঘড়িটিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে পিছলে বেড়িয়ে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রের এইরূপ অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ ছোট ছোট ঘটনা অনেক আছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বিষয়ে সৈন্যদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

অবসরপ্রাপ্ত দু'জন পাঞ্জাবী জমাদার, একজন গুর্খা হাবিলদার ও কিংস রয়েলস্ রাইফেলসের L. C., Mr. Macnamara সাহেবের কাছ হতে এক সময়ে আমার মিলিটারী ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল, সেই সময়ে তাঁদের কাছে শুনেছি যুদ্ধক্ষেত্রে কি রকম আশ্চর্যভাবে রাইফেলের গুলী হতে অনেকে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের Manual-এর শিক্ষা থেকে ও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে বলেছেন যে, ফায়ারিং লাইনে যখন দু'পক্ষে গুলী বিনিময় হয় তখন নিজেকে যে কোন আড়ালের পিছনে রাখার সুযোগ নিতে হয়। দুর্ভেদ্য আড়ালের পিছনে বা বড় শক্ত গাছ প্রভৃতির পাশে আশ্রয় নিতে পারলে নিজেকে বাঁচিয়ে শত্রুকে গুলী করবার সুবিধা পাওয়া যায়। আবার কোনো কোন ক্ষেত্রে ঝোপঝাড়, লতাপাতা প্রভৃতির আড়ালে অদৃশ্য থাকা যায় সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে শত্রুর গুলী প্রতিহত করার উপায় থাকে না। সে অবস্থায় বা একেবারে ধু ধু খোলা মাঠের মধ্যে সামনা সামনি হঠাৎ আক্রান্ত হলেও শেষ আশা ত্যাগ করতে নাই—তখনও প্রাণের আশা রাখতে হয় এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাটিতে ধুপ দিয়ে শুয়ে পড়ে হাতের কাছে একটুকুরো ইট বা মাটির ঢেলা ছোট একটুকুরো কাঠ বা নিজের পকেটের মানিব্যাগ বা চশমার খাপ যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব তাই সেই শোয়া অবস্থায় মাথার সামনে রেখে দিতে হয়। তাঁরা সবাই বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলেন যে এই সামরিক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে কোনো সৈনিকেরই অবহেলা বা উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতাতেও এইটুকুই বলতে পারি, সুশিক্ষিত বৃটিশ-সৈন্যবাহিনী রাইফেল ও মেশিনগানের অজস্র গুলীবর্ষণে জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্র ঢেকে ফেললেও সেই শিক্ষিত হস্তের বহু সহস্র গুলীতে মাত্র বারোজন বিপ্লবী মৃত্যুবরণ করেছেন আর সব গুলীই আশেপাশের গাছের ডালপালা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। একটি গুলী এসে অম্বিকাদার কপাল স্পর্শ করে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেইভাবেই রাইফেলের গুলী সুশীল দাসগুপ্তের রিষ্টওয়াচে লেগে ঠিক্‌রে বেড়িয়ে গেলো। তার পিছনে ছিলেন মাস্টারদা— তিনিও রিষ্টয়াচের আড়ালের দরুণ রক্ষা পেয়ে গেলেন। সুশীল দাসগুপ্ত অক্ষত শরীরে মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে উধাও হয়ে গেলো।

শান্তি রাইফেলের গুলীতে দারুণ আহত হয়েও আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হলো। মণি দত্ত ও কল্পনা অজস্র গুলী বর্ষণের মধ্যেও সেই কর্দমপূর্ণ এঁদো পুকুরে নাক-ডোবা জলে প্রায় আধঘণ্টাকাল আত্মগোপন করে ডুবে থেকে নিরাপদ আশ্রয় লাভে সক্ষম হলো। কিন্তু সেদিন ভাগ্য দেবীই যেন মাস্টারদার

বিরুদ্ধে ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত! তাঁরই ঈশারাতেই যেন বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ ক্যাপটেন ওয়ামস্‌লের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়েছিলেন!

আমরা মনে করতে পারি ইন্‌টেলিজেন্সের সংবাদের উপর নির্ভর করেই ধলঘাটের সাবিত্রী মাসীমার বাড়ীতে ক্যাপ্‌টেন কেমারন হানা দিয়েছিলেন—বহুদিনের ব্যবধানে হলেও অনুরূপভাবেই ওয়ামস্‌লে সাহেবও গৈরলাতে আজ ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে বিপ্লবীদের সন্ধানে উপস্থিত হয়েছেন,—এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকের কোন হাঁত নেই।

বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার গোপন সংবাদ মিলিটারী বিভাগই সংগ্রহ করেছে বলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস দলের বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের অস্তিত্ব গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ-মহল মিলিটারীর সাহায্যে এই অভিযান দুইটি এই ভাবেই সাজিয়েছিলেন। আমার নিশ্চিত ধারণা বিপ্লবীদলের বিশ্বাসঘাতক পুলিশের কোন চর গোপনে পুলিশকে এ তথ্য সরবরাহ করেছিলো। আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে, পুরস্কারের লোভে পাবলিকই ক্যাপ্‌টেন কেমারনকে ধলঘাটে বা আজ ক্যাপ্‌টেন ওয়ামস্‌লেকে গৈরলাতে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানার সংবাদ সরবরাহ করেছে। যথাস্থানে নির্ভরযোগ্য সূত্রের সাহায্যে এবিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

ক্যাপটেন ওয়ামস্‌লের সৈন্য-পরিচালনার বিশেষ পদ্ধতি অনুধাবনে সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা মাস্টারদাকে বন্দী করতে নিশ্চয়ই সফলকাম হবেন—এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই আজ গৈরলা গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। সেই রাত্রে এই বাড়ীর প্রায় আধ মাইল দূরে একটি মাঠে মাস্টারদা, কল্পনা, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্তের এক গোপন বৈঠকে কালী দে ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ও একসঙ্গে মিলিত হবার কথা ছিল। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী পটিয়া থানার হাবিলসদ্বীপ গ্রামে Amiable Lodge আশ্রয় স্থল হ'তে কালী ও তারকেশ্বরও এই সভায় মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সেই রাত্রে উপস্থিত হয়েছিল। বেণী চৌধুরী ও ধীরেন দাস, তারকেশ্বর ও কালীকে পথ চিনিয়ে ঐ স্থানে নিয়ে যায়। রাত প্রায় এগারোটা বাজে—এখনো মাস্টারদা ও অন্যান্য সাথীদের দেখা নেই। এই অস্বাভাবিক বিলম্বে কালী ও তারকেশ্বর চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে হয়ে উঠলো। অনিশ্চয়তার মধ্যে বেশীক্ষণ অবশ্য কাটাতে হলো না—রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ অদূরে রিভলবার ও রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জন শোনা গেল। কারো আর বুঝতে বাকী রইল না

যে মাস্টারদার গৈরলার আশ্রয়স্থল আক্রান্ত হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাইফেলের আওয়াজ তীব্রতর হয়ে উঠলো—ও আলোকবোমার আলো চতুর্দিক দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট করে তুললো। তারকেশ্বর, কালী, ধীরেন ও বেণী সেখানে অপেক্ষা করা বা amiable lodge-এ ফিরে যাওয়া সমীচীন মনে করেন না। তারা উত্তরভূমি গ্রামে একটি নূতন আশ্রয়স্থলে চলে গেলো। এই বাড়ীটি ছিলো এক স্বদেশ-প্রেমিক নিরীহ ব্রাহ্মণ মাস্টারের। বাড়ীটির একটি অপূর্ব ছদ্মনাম ছিলো—"কলসনাচ"।

মিলিটারীর কবল হতে সকলে নিষ্কৃতি পেলেও কিন্তু শাসক-গোষ্ঠীর ঘুম কেড়ে নেওয়া অগ্নিযুগের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের নিষ্কৃতি মিললো না—ভাগ্য দেবী আজ অতি নিষ্ঠুর।—নিষ্করুণ মূর্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এই সর্বত্যাগী মানুষটির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন! সূচীভেদ্য অন্ধকারে এক হাত দূরের জিনিষও দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রথমেই মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন চলেছেন—বেড়া পেরিয়ে যাবার সময়ে অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে মাস্টারদা এক সৈনিকের বাহু-বেষ্টনীর মধ্যেই গিয়ে পড়লেন! একেবারে প্রথম ধাক্কাতেই এই ঘটনা ঘটে গেল—দুজনেই একযোগে আকস্মিকভাবে শত্রুহস্তে বন্দী হলেন।

এই গৈরলা সংঘর্ষের বিবরণ ও মাস্টারদার ধরা পড়ার তথ্য সরকারী দলিল থেকেই উদ্ধৃত করলাম। হাইকোর্টে মাস্টারদার আপীলের শুনানীর মুদ্রিত জাজমেণ্টের ১৪৬ পৃষ্ঠায় :—

"The most incident of importance took place at Gairala, three miles off from Dhalghat where Surjya Sen was arrsted. Witnesses to the occurence are P. W S 94, 103, 104, 105 and 107. P. W. 94 Captain Waumsley states that he went to Gairala, on account of information received on the night of 16-2 33."

এখানে সাক্ষী ক্যাপ্টেন সাহেব আদালতে সর্বসমক্ষে প্রমাণ করতে চাইছেন যে সেই রাত্রেই বিপ্লবীদের খবর পেয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি গৈরালা গ্রামের বাড়ীতে হানা দিতে গিয়েছিলেন। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিভীষণকে রক্ষা করার এই সাধু প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। আবার উদ্ধৃত করছি :—

"His party consisted of 35 Sipoys, 3 A. S. Is. and 3 constables. They sorrounded the house of one Biswas there,

parties starting from the East side, where he and the Police officers took their stand, and going North and South. About 5 minutes later he heard sounds like Revolver shots from the North-West and the reply of his men."

পুলিশ অফিসারদের নিয়ে সাহেব বাড়িটির পূর্বদিকে দাঁড়ালেন—এবং বাড়িটিকে ঘেরাও করবার জন্য সৈন্যদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি রিভলভারের আওয়াজ শুনতে পান। ন্যায়বান ইংরেজ কখনোই আগে গুলী ছোঁড়েন না!—তাই রিভলভারের শব্দ শোনার পরই তিনি তাঁর লোকদের রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলেন।

এই উদ্ধৃতির ঠিক পরের অংশটুকুতে :—

"Then his Habilder Motilal (P. W. 103) came to him for Bombs and a very light Pistol, as he believed the firing came from one building. Captain Waumsley went the North to the place where the firing had occured. He could not see anyone but heard sounds of splashing in water."

ক্যাপটেন সাহেব দুর্বলচিত্ত কাপুরুষ নন—ক্যামারন সাহেবের শোচনীয় পরিণতির কথা জানা থাকা সত্ত্বেও বীরবিক্রমে তিনি যেস্থান হতে গুলীর আওয়াজ আসছিলো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও জলে সাঁতার কাটার মত শব্দ শুনতে পেলেন।

"About half an hour later he heard some Revolver shots on the west-side and a few rifle shots in reply."

আবার সেই পুনরাবৃত্তি—আগে রিভলভারের আওয়াজ তারপরে রাইফেলের।

"Later, his Lance Naik informed him that two Prisoners had been caught. When going round the cordon he saw the two Prisoners tied up on the West-side and was informed that a Webley Revolver and 12 rounds of ammunition and some papers had been taken from one of them. About 2 A. M. on going round the cordon again, he told the Police Officers of the Capture

and took them with him. The Police Officers then identified the Prisoners as Surjya Sen and Brojen Sen. Man Bahadur sepoy pointed out to him Surjya Sen as the person whom he found the Revolver and other things. He identified the Revolvers………"

তাঁর ল্যান্স-নায়েকের কাছ থেকে ক্যাপটেন খবর পান যে তারা হু'জনকে বন্দী করেছে। রাত হুইটার সময় তিনি পুলিশ-অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে বন্দীদের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন যে একজন স্থর্য সেন ও অপরজন ব্রজেন সেন। গুর্খা সেপাই মান বাহাত্বর মাষ্টারদাকে বন্দী করে। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে তিনি মান সাহেবের গায়ের উপর গিয়ে পড়েছিলেন। মান বাহাত্বর মাষ্টারদার কাছ হতে প্রাপ্ত রিভলভার, কিছু কাগজপত্র ক্যাপটেন সাহেবকে দেখায় ও পরে আ'লতে সেগুলি সনাক্ত করে।

তার পরের বিবরণ—পুলিশবাহিনী সারারাত বাড়িটি ঘিরে রাখে এবং পরদিন সকালে তল্লাসীর কাজ স্থরু করে। ক্যাপটেনের আদেশে পুলিশ অফিসার শৈলেন্দ্রবাবু প্রায় হু'শ' গজ পর্যন্ত রক্তচিহ্ন অনুসরণ করেন। তারপরে আবার :—

"Motilal Havildar Coroborates P. W. 94. and says he went with the cordon by the North of the house. Whilst arranging his men to join up with those on the West-side, a torch-light was flashed on the cordon and then some revolver shots were fired from the bamboo grove. His men replied and he heard a shriek and splash in water. He went for a very (Sic) Pistol and his Saheb returned with him. Later he heard more firing south of where he was and was informed two men had been caught. When his Saheb came round the Cordon he reported this to him. In the morning he saw Surjya Sen and another man under arrest and followed a trail of blood some distance to the East."

হাবিলদার মতিলাল বলছেন যখন তিনি উত্তর-পশ্চিম দিক হতে

বাড়িটিকে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করছিলেন তখন তাঁদের বেষ্টনীর ওপর টর্চের আলো পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েক রাউণ্ড রিভলভার ফায়ার হয়। শান্তির বিষয় লিখতে গিয়ে এ ঘটনার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। রিভলভারেব গুলীর শব্দ করে সেপাইরা রাইফেল চালিয়েছিল ও রাইফেলের গুলীতে শান্তি গুরুতর আহত হয়। শান্তি চক্রবর্তী যে পুকুরে সাঁতার কেটে পার পেয়েছিল তার সমর্থনও এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে। শান্তির আঘাত যে অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল তার প্রমাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দু'শ' গজের উপরেও তার ক্ষতস্থান হতে রক্ত চুঁইয়ে পড়েছে। এই উদ্ধৃতিতে আরও একজনের গ্রেপ্তার হওয়ার উল্লেখ আছে।

এর পরের অংশ :—

"Man-Bahadure sepoy proves that on the night in question he was posted in the cordon on the West-side of the house. On his left were Nur-singh and another sepoy. He heard some firing to his North. Later there was more Revolver firing from in front of him. He kept quiet and then heard the ruslting of bamboo leaves. He caught a man whom he identifies as Surjya Sen, and another man was caught on his left.

He made over the papers to the police but took the Revolver and cartridges to the Thana with the Saheb......

"Nur-singh proves his capture of one man, identified as Brajendra sen and the capture of Surjya Sen by Man-Bahadur. He found nothing on the man he captured."

নূর সিং মান বাহাদুরের বাঁদিকে ছিল, সে ব্রজেন্দ্র সেনকে ঝাপ্‌টে ধরে। ব্রজেন সেনের কাছে সে কোন অস্ত্রাদি বা নিষিদ্ধ জিনিস পায়নি। কথাটা ঠিক, কারণ আমরা জানি সেই রাতের পূর্বপরিকল্পিত বৈঠকে মাস্টারদাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্রজেন সেন নিযুক্ত ছিল।

মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে ধলঘাটের মিলিটারীক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা একটি স্থানে মিলিটারী প্রহরায় তাঁদের বহুঘণ্টা আটক রাখে ও পরে সুদৃঢ় মিলিটারী ব্যবস্থায় সাহায্যে চট্টগ্রাম জেল হাজতে নিয়ে যায়।

প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ে সমস্ত উন্মুলিত বিপর্যস্ত করে দিয়ে ধীরে ধীরে কালরাত্রি শেষ হলো। আকাশের বুকে ভোরের রক্তরাঙা ইশারা—গাছের ডালে ডালে ঘুম ভাঙ্গা পাখীর কল-কাকলী। ধীরে ধীরে সারাগ্রামে প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া দেখা দিল। শত্রুহস্তে "মাস্টারদা বন্দী"—এই খবর দাবানলের মত দেখতে দেখতে সর্বত্র ছাড়িয়ে পড়ল। এই অবিশ্বাস্য—নিদারুণ ঘটনায় চট্টলবাসী হতভম্ব—মুহ্যমান! সবার মনে বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা—কে সে বিশ্বাসঘাতক? বিপ্লবী যুবকেরা এই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণকে খুঁজে বা'র করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার, দেশের প্রতি এতবড় শত্রুতার ও জাতির ললাটে এই কলঙ্ক কালিমা লেপনের প্রতিশোধ নিতে তারা বদ্ধপরিকর! কে সে? কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যাবে—কে তার সন্ধান দেবে?

মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে চট্টগ্রাম জেল হাজতে রাখা হয়েছে। সতর্কতার জন্য চট্টগ্রাম জেলটি আগে থেকেই মিলিটারী প্রহরায় সুরক্ষিত। জেল প্রাচীরের বাইরে কাঁটা তারের বেড়া, এই বেড়ার বাইরে স্থানে স্থানে রাইফেল ও মেসিনগান সজ্জিত মিলিটারীর চৌকি বসানো। এই কারা প্রাচীরের অন্তরালে আমরাও দুবছরের অধিককাল কাটিয়েছি। আমাদের পরে এই জেলে অম্বিকাদা, সরোজকান্তি গুহ ও হেমেন্দু দস্তিদারকে আটক রাখা হয়; তাদের বিচার ও ট্রাইব্যুনাল আদালতে চলে। মাস্টারদাকে বন্দী করার দিন সাতেক আগে ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখে ট্রাইব্যুনাল অম্বিকাদাকে প্রাণদণ্ডে ও সরোজকে যাবজ্জীবন কারা দণ্ডে দণ্ডিত করে। হেমেন্দু দস্তিদার মুক্তিলাভ করে। এই রায়ের বিরুদ্ধে অম্বিকাদা ও সরোজকে হাইকোর্টে আপীলের সুযোগ দেওয়া হয়। সাতদি'নর মধ্যেই আপীল করার শেষ দিন ধার্য ছিল—অর্থাৎ ১৭ই তারিখে—যেদিন মাস্টারদাকে চট্টগ্রাম জেলে বন্দী করে আনা হলো সেইদিনই 'অম্বিকাদা'র আপীলের দরখাস্ত কলকাতার হাইকোর্টে পাঠানো হয়।

মাস্টারদার সঙ্গে জেলে অম্বিকাদার সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ হয়ে ওঠার আগেই অম্বিকাদাকে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। আমরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা নিয়ে ভয়াবহ আন্দামান জেলের অন্ধকার সেলে দিন অতিবাহিত করছি; অম্বিকাদা আলিপুর জেলে হাইকোর্টের বিচারপতিদের রায়ের অপেক্ষায় আছেন আর মাস্টারদা ট্রাইব্যুনাল আদালতের সম্মুখীন হবার জন্য চট্টগ্রাম জেলে প্রতীক্ষমান।

তারকেশ্বর দস্তিদার এখনও বাইরে আত্মগোপন করে আছে। সংগঠক হিসাবে তার উপরই এখন দলের প্রধান দায়িত্ব। সংগঠনের সকলে স্বেচ্ছায় আনুগত্য না দিলে—দায়িত্ব নিয়ে কেউ কখনও একা সকল কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। ঈর্ষা, ব্যক্তিগত প্রাধান্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি নানা ছোটখাটো চারিত্রিক দুর্বলতা হতে মধ্যবিত্ত সমাজ-স্তরের বিপ্লবী যুবকেরা মুক্ত থাকবে সেইরূপ আশা করা যায় না। কাজেই এর ব্যতিক্রম মাস্টারদার—বর্তমানে হয়নি—হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ সুদৃঢ় নেতৃত্বের প্রভাবে বিপ্লবী যুবকদের Subjective Preparation-এর (মনঃস্তাত্ত্বিক নৈতিক প্রস্তুতির) অনেকখানি তারতম্য ঘটা খুবই স্বাভাবিক। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে মাস্টারদার বর্তমান থাকা না থাকার মধ্যে অবস্থার অনেকখানি ভালমন্দ নির্ভর করছিল। এই নিদারুণ সত্যটি মাস্টারদা ধরা পড়ার পর থেকেই দলের সভ্যদের মধ্যে ক্রমে প্রকট হয়ে উঠলো।

যখন অক্ষমতা ও পরাজয়ের মনোভাব আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন আমরা নিজেদের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু করি। বিপ্লবের স্লোগানে আমরা আকাশ-বাতাস যতই ফাটাই না কেন, ব্যক্তিগত প্রাধান্যের মোহ বহু সহস্র বিপ্লবকেও অনায়াসে বিসর্জন দিতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের দুর্ভাগ্য! যখন তাদের একতার বিশেষ প্রয়োজন তখনই তারা পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের গৃহ-বিবাদে লিপ্ত হলো। বিপ্লবী দলকে তারকেশ্বরের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ করা ও শত্রুর বিরুদ্ধে সকল সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে যাওয়াই তাদের পক্ষে বিশেষ দরকার ছিল, এই অতি প্রয়োজনীয় বৈপ্লবিক কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করতে তারা চেষ্টা করেনি। আজ এতদিন পরে ইতিহাস লিখতে গিয়ে দলের আভ্যন্তরীণ চিত্ত-দৌর্বল্যের বিবরণ পর্দার আড়ালে ঢেকে রাখলে বাস্তব ইতিহাস ত্রুটিমুক্ত হবে না। কাউকে ছোট করা বা কারো বৈপ্লবিক চরিত্রের উপর কটাক্ষ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। দলের মধ্যে যেসব সমস্যা, দুর্বলতা ও ব্যক্তিগত কারণে পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করতেও সভ্যেরা পরাঙ্মুখ হয়নি—সেই সব ঘটনাবলীর বিবরণ যদি আমরা জানতে পারি, তবেই সার্বিকভাবে বিপ্লবীদের দোষত্রুটি নিয়ে তাদের সম্বন্ধে একটা বাস্তব ধারণা করা সম্ভব হবে। কেবল গুণাবলীর ইতিহাস রচনা করেই বিপ্লবীদের দেবতার পর্যায়ে তুলে ধরে দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার চেষ্টায় সার্থক ইতিহাস সৃষ্টি ব্যাহত হবে। আমার লেখায় যদি

কেবল প্রকাশ যায় যে, বিপ্লবীরা এক একজন অতিমানব—দেবতা—তাহলে দেশবাসীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অতীত সাথীরা ও চট্টগ্রামদলের যুবক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, কারো অতীত জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনায় তাঁর বর্তমান জীবনকে কলুষিত করতে চাই এ অভিপ্রায় আমার নেই। সেই অতীত যুগের, অতীত দিনের বাস্তব অবস্থার মধ্যে কে কি করেছিলেন বা কে কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবার পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন সেই বিচার করার ভারও আমার নয়। আন্তরিকভাবেই আমি বিশ্বাস করি বন্ধুরা নিজেদের দোষত্রুটির পর্যালোচনা করে নিজেরাই মনে মনে হাসবেন এবং নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি স্বীকার করবেন। সত্যিই তো—কতযুগ অতীতের কথা—সেই বাস্তব অবস্থায় হয় তো নিজের অজান্তেই ভুলভ্রান্তির দাস হয়ে পড়েছিলাম--যার উপরে স্থির শান্ত মস্তিষ্কের কোন প্রভাবই স্থান পায় নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি এবং আমার বিশ্বাস বন্ধুরাও আমার মত মনোভাব [illegible] করেন ও আমি যা লিখেছি তারাও তা' সমর্থন করবেন।

অনেক কাজ ও সাংগঠনিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সবার মনেই প্রশ্ন—মাস্টারদা ধরা পড়ার জন্য কে দায়ী? দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের সন্ধান করে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেরূপ চেষ্টা হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাকে প্রাধান্য না দিয়ে তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে একটি অংশ মেতে উঠলো। শুনতে হয়ত খুবই অবাক লাগবে তবু অতি রূঢ় সত্য যে, দলের এই অংশ একজনের নেতৃত্বে মাস্টারদার ধরা পড়ার জন্য তারকেশ্বর দস্তিদারকেই দায়ী করল!

এর আগের ঘটনা একটুখানি বলা দরকার। মাস্টারদা [illegible]-রাতে ধরা পড়লেন—সেই রাত্রেই মাস্টারদার সঙ্গে কালী দে ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা হয়েছিল। তারা দুজন ব্যবস্থা অনুযায়ী গৈরলার বাড়ী থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে রাত দশটা, এগারোটার সময় একটি পুকুরের ধারে এসে উপস্থিত হয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই মাস্টারদার বাসস্থান ঘেরাও করে ফেলে ও সংঘর্ষ শুরু হয়। গুলীর শব্দ ও রকেটবোমার আলোতে, এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে তারকেশ্বর ও কালী আর বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করা বা যে আশ্রয়স্থান থেকে তারা এসেছে সেখানে ফিরে যাওয়া সমীচীন মনে করল না। তাই সেই রাত্রে 'কলসনাচ' ছদ্ম·[illegible]মের অন্য আর একটি বাড়ীতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। এই বাড়ীটির মালিক, উত্তরভূমি গ্রামের একজন দরদী শিক্ষক।

শান্তি চক্রবর্তী রাইফেলের গুলীতে আহত অবস্থায় পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করতে যে সমর্থ হয়েছিল তা আগে বলেছি। সেই রাতের ঘটনার পরে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রায় ছয় সাত দিন পরে শান্তি চক্রবর্তী এই 'কলস-নাচ' বাড়ীতে তারকেশ্বর ও কালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে! পরে কল্পনা দত্তও 'কলস-নাচ' বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। কিছুদিন পরে বা প্রায় সেই সময়েই মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দে তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে ঐ স্থানে সাক্ষাৎ করতে যায়। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সভ্যদের বৈঠকের প্রয়োজন—মাস্টারদার অবর্তমানে নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করার ও জেলের মধ্যে মাস্টারদার সঙ্গে আশু যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করছিল। তবু এইসব সাংগঠনিক দায়িত্বের গুরুত্ব সকলের নিকট প্রাধান্য পেলো না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাংগঠনিক "দুর্বলতা" সম্বন্ধেই বেশী সচেতন হয়ে উঠলেন। সেই যুগে সেই আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে মেয়ে সভ্যাদের ভূমিকা ও ছেলে মেয়েদের মেলামেশার মধ্যে কিরূপ ব্যবধান থাকা উচিত সে সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা নিয়ে "সাংগঠনিক দুর্বলতা" বিচারের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে গিয়ে যুক্তি বিচার সমস্ত বিসর্জন দিয়ে তাঁরা ভাবপ্রবণতার স্রোতে নিজেরাই ভেসে গেলেন।

বৈপ্লবিক সংগঠনের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সভ্য-সভ্যাদের মিলিত ব্যক্তিগত জীবনের কোন সমস্যার বিবরণ—কি প্রাচ্যের বা কি রুশ চীনের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই অতি অবান্তর ও অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তাঁরা কখনও মাথা ঘামায় নি। আর আমাদের দেশ এত আবর্তন বিবর্তনের মধ্যেও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই সহজ প্রশ্নটিকেই ঘোরালো করে তুলেছে।

শ্রীঅরবিন্দের যুগে ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠের প্রভাব বাঙ্গলার বিপ্লবীদের মন ও হৃদয় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বামী সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে ঋষি বঙ্কিম ব্রহ্মচর্যের রক্ষাকবচের গণ্ডীতে বিপ্লবীদের আবদ্ধ রেখে বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ—আদর্শ ব্রহ্মচারীর গুণাবলী বর্জিত 'দুর্বল চরিত্র' সভ্যকে বৈপ্লবিক পথে চলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে! এইরূপ চিন্তাধারা হতে ১৯২০-২২ সালেও আমরা মুক্ত ছিলাম না। তারপর ১৯২৮-৩০ সালে চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী দলের এক অংশ এইরূপ অবাস্তব প্রশ্নকে

সমস্যা মনে করার ভুল বুঝতে পারল। আত্মবিশ্লেষণ ও যুক্তিবাদের প্রভাব—এই অবাস্তর সমস্যা নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার পর্দার আড়ালে না থেকে বৈপ্লবিক সৎসাহসে বলীয়ান হয়ে মিথ্যা—'দেবতার' আসন ত্যাগ বিপ্লবীদের সাহায্য করল।

আমার লেখা থেকে ভুল বোঝার অবকাশ হয়ত থাকবে। তাই সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া দরকার যে ঋষি বঙ্কিম ও শ্রীঅরবিন্দের যুগে "আদর্শ" বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য "ব্রহ্মচারী" বিপ্লবীদের প্রয়োজনও ছিল। সেই যুগে এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু ইতিহাসের গতির সঙ্গে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ১৯২৮-৩০ সালে সেই পরিবর্তন আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল। ১৯৩৪ সালে আমরা যখন আন্দামানে এই চিন্তাধারার প্রবাহ চট্টগ্রাম দলের সকলকেই যে মানসিক জড়তা মুক্ত করতে পেরেছিল তা নয়। বিপ্লবী সংঘের কর্মক্ষেত্রে সবাই একই সঙ্গে যে স্ত্রী-পুরুষের সহজ ও স্বাভাবিক মিলন প্রশ্নে একমত হয়ে যাবেন তা সম্ভবও নয়। মানসিক জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন জনের বিভিন্ন পরিবেশ ও সময়ের প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের একটি অংশ তখনও স্ত্রী-পুরুষ সভ্যাসভ্যাদের সহজ ও স্বাভাবিক মিলনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাঁদেরও তেমন দোষ দেওয়া যায় না। মেয়েদের সঙ্গে হয়ত তাঁরা সহজ ও সরলভাবে আগে কখনও মেলামেশা করেন নি—স্কুলে-কলেজে ছাত্রছাত্রীর সহ অধ্যয়ন ব্যবস্থা তখন ছিল না—আর থাকলেও সবেমাত্র তা হয়েছে। কল্পনা কলেজে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে এসেছে—ছেলে সহপাঠিদের সঙ্গে কল্পনার যে সহজভাব ছিল, সেভাবেই বিনা সংকোচে সে ফেরারী জীবনেও সবার সঙ্গে মিশতে গেছে। সেই দিনের সংস্কার থেকে মুক্ত নয় বলে নিজের সংকুচিত চিত্তের প্রভাবে যদি কেউ সরল ও সোজা জিনিষকে সমস্যার পর্যায়ে নিয়ে যায় তবে তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না; আবার বাস্তবতার স্বাভাবিক গতিকে যাঁরা বিনা সংকোচে মেনে নিতে পারেন নি তাঁদের প্রশংসাও করা চলে না। তাঁদের মনে সংশয়—বিপ্লবী কল্পনা কি বিপ্লবী তারকেশ্বরের সঙ্গে সরল পরিচ্ছন্ন মনে স্বাভাবিক ভাবে মিশতে পারে! সমাজের অগ্রগতির কতখানি পিছনে তাঁরা পড়ে ছিলেন—আজ নিজেরাই তা স্বীকার করবেন। মন সংস্কারমুক্ত ছিল না বলেই যদি এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেন তবে এই প্রসঙ্গে আর

বলার কিছু থাকে না। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন—"সংস্কার" না কি "হিংসা," "প্রাধান্য লাভের মোহ", না কি "প্রতিদ্বন্দ্বিতা" কোনটি তাঁদের বিচলিত করে তুলেছিল? আত্ম-বিশ্লেষণের সাহায্যে যে দোষে নিজেরা দোষী, প্রবঞ্চক মন দিয়ে সেই দোষের বিকৃত সন্ধান আবিষ্কারে তারকেশ্বরের চরম শাস্তি বিধান করার উদ্যম যে কতখানি মারাত্মক অপরাধ তা বুঝে আজ তাঁরা নিজেরাই লজ্জা বোধ করবেন।

"কলস-নাচ" বাড়ীতে দলের দু'জন সভ্য ঠিক করে এসেছেন তাঁরা তারকেশ্বর দস্তিদার কে হত্যা করবেন। আর একজন সদস্যের কাছে তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করলেন। সেই বিশেষ সদস্য "এই সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে জানতে চাইলেন।" তাঁরা বললেন "দলের প্রায় সকলেই এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে।" দলের বিশেষ সভ্যটি এই মারাত্মক ব্যবস্থায় মত দিলেন না। তিনি জোর দিয়ে বল্‌লেন, "এ ব্যাপারে সকলের মিলিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। তা ছাড়া তিনি (একজনের নাম বল্‌লেন) "তার" উপস্থিতি ভিন্ন ফুটুদাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতেই পারি না……।"

পর্দার অন্তরালে—দলের অভ্যন্তরে এতবড় চক্রান্ত চলতে লাগল! হায় হতভাগ্য তারকেশ্বর!

মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই—প্রাণদণ্ডই একমাত্র শাস্তি। তারকেশ্বর সত্যই যদি এই অপরাধে অপরাধী হয় তবে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণায় কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু আগে তার অপরাধের প্রমাণ চাই! এই আসল অপরাধীর অনুসন্ধানই সংগঠনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য হওয়া উচিত ছিল। তা না হয়ে নিজেদের দুর্বলতাবশতঃ শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার শক্তি হারিয়ে সভ্যবৃন্দ নিজেরাই অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লেন।

কি হওয়া উচিত ছিল বা ছিল না তা নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে অতীত ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। কিন্তু কি কারণে বা কি পরিস্থিতিতে বা বিপ্লবী সমাজের কোন্ পরিবেশে আমাদের পরিশিষ্ট সংগঠনকে সেইযুগে কি অবস্থা বা দুরাবস্থার মধ্যে চলতে হয়েছিল তার বিশ্লেষণ বা সভ্যদের আত্মসমালোচনা বা ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করার দ্বার চির উন্মুক্ত।

যে শক্তিতে বিপ্লবীবাহিনী গঠন করে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রবল পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে মাস্টারদা অভিযান সুরু

করেছিলেন—তার চার বৎসর পরে "সাংগঠনিক বৈপ্লবিক শক্তি যে" সীমিত গণ্ডীতে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। অধিক শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধ করে বৃহত্তর স্বার্থে যে সীমিত গণ্ডীতে "সাংগঠনিক দুর্বলতাকে" ক্রমে ক্রমে বরণ করে নিতে হবে তা মহানায়ক সূর্য সেনের উপলব্ধির বাইরে ছিল তা ভাবারও কোন কারণ নেই। "সীমিত গণ্ডীর সাংগঠনিক দুর্বলতা" বা সেই সংগঠনের সাম্রাজ্যবাদ বিরুদ্ধ আপোষহীন সংগ্রামের সাময়িক পরাজয় হলেও তা যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রবল প্লাবনের দুর্জয় ও দুর্বার গতিস্রোতকে আরো তীব্র, আরো শক্তিশালী এবং আরো অনেক বেশী ব্যাপক করে তুলবে সেই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তিনি সেই স্মরণীয় ১৮ই এপ্রিলের যুব-বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তাঁর ধরা পড়ার পর হতাশায় বিশৃঙ্খলায় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে সুবিশাল সমুদ্রের বুকে তরঙ্গমালায় ঘাতপ্রতিঘাতে নাবিকহীন তরণীর মত সংগঠনকে দিক্‌হারা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে তুলল। যেখানে সমস্ত সংগঠন একযোগে ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়বে—"কোথায় সে বিশ্বাসঘাতক?—কে সে বিভীষণ যে মাস্টারদাকে ধরিয়ে দিয়েছে?—তাকে চাই—তার মৃত্যু চাই।"—সেখানে সংগঠন কিনা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারকেশ্বরের হত্যার জন্য। যে "অপরাধের" ভ্রান্ত সংজ্ঞায় আমরা সকলেই "অপরাধী," সে অপরাধের জন্যই তারকেশ্বরের প্রাণদণ্ডের মঞ্চ সাজানো যে কতখানি হাস্যকর তা আজ হয়ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

একজনের তীব্র প্রতিবাদে তারকেশ্বর সেইদিন বেঁচে গেলেন। দায়িত্বশীল সকলে একসঙ্গে উপস্থিত থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন স্থির হল।

এদিকে বিশ্বাসঘাতক বহাল তবিয়তে খোস মেজাজে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হয়ত তখন সে "সাম্রাজ্যবাদী সরকার প্রেমের" দশ বিশ হাজার টাকা পুরস্কারও লাভ করেছে। আমাদের বড় বড় নেতারা তখন তারকেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও নেতৃত্ব লাভের জন্য পথ পরিষ্কার করার "গুরুত্বদায়িত্ব" বহনে ব্যস্ত ছিলেন বলে যুবক বন্ধুরা বিশ্বাসঘাতকের অনুসন্ধানে উদাসীন বা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না।

দলের সর্বনাশে উদ্যত—দলের মধ্যেকার ও বাইরের বিশ্বাসঘাতকদের বিষয়ে কোন সময়েই বা কোন প্রকারেই বিপ্লবীদের উদাসীন থাকা উচিত নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে আমাদের ধারণা যে-কোন একটি ঘটনার বা

কোন একজনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা বোধ হয় কেবলমাত্র একজনই করে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। নিজস্ব অনুচর মারফৎ পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবীদলের সভ্যদের হাত করতে চেষ্টা করে, এবং বিভিন্ন সূত্রের তথ্যের উপর নির্ভর করে একই ঘটনা বা একই ব্যক্তির সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে থাকে।

সুদীর্ঘকাল আগের কথা। মহা-বিপ্লবী বাঘাযতীন মুখার্জী জার্মানী হতে মেভারিক জাহাজে প্রেরিত তিরিশ হাজার রাইফেল ও রাইফেলের টোটা নাবিয়ে নেওয়ার জন্য দিনের পর দিন বিপ্লবীসাথীদের সঙ্গে রায়মঙ্গলের তীরে অপেক্ষারত ছিলেন, কিন্তু হায়রে! মেভারিক আর এলো না—তার পরিবর্তে উপস্থিত হলো স্যার চার্লস্ টেগার্টের পরিচালনাধীনে সুবৃহৎ পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী। এই ঘটনা এখন প্রায় বিস্মৃতির কোলে বিলুপ্ত! কিন্তু এ ঘটনায় কে সে বিশ্বাসঘাতক—বা কতজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার অনুসন্ধান সমাপ্ত হয়েছে বলে আজও মনে হয় না। মনে প্রশ্ন জাগে—অত পুরনো দিনের বিপ্লবী ইতিহাসের এই "নগণ্য" বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ তোলা কি বেশী বাড়াবাড়ি নয়? হয়তঃ মনে হবে বর্তমানে এই অবাস্তব বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই প্রশ্নের বিচারের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে, এবং সেই অধিকারেই বলছি উচ্চস্বরে যাঁরা ইন্দো-জার্মান বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবল একজন নয়—একজনের বেশী বিশ্বাসঘাতক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার বিশ্লেষণিক ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আজও যে কয়জন বেঁচে আছেন এবং "ইন্দো-জার্মান" ষড়যন্ত্রের বৈপ্লবিক মূলধন ভাঙ্গিয়ে জীবন নির্বাহ করছেন তাদের মধ্যেই বিভীষণ এখনও সশরীরে এবং সসম্মানে বর্তমান।……

প্রশ্ন জাগে: "তুমি যদি এতই জান তবে সেইসব নাম প্রকাশ কর না কেন?" প্রমাণ দিয়ে প্রকাশ করা এবং সেইরূপ অভ্রান্ত প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে নানা মতের লোকের সমর্থন পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য সেইপ্রকার চেষ্টা হতে আপাততঃ বিরত না থেকে উপায় নেই। কিন্তু এই সম্বন্ধে আমার মত ও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে আমাকে বিরত করার অধিকারও কারো নেই।

দীর্ঘকালের ব্যবধানেও এই বিশেষ বিষয়টি, অর্থাৎ বিপ্লবীদলে বিভীষণদের কার্যকলাপ রুখবার জন্য একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী যে থাকা উচিত সে বিষয়ে আমার একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। আমার সম্পূর্ণ অজানা অবস্থায়ও

আমি যেন তাতে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ি—। কোথায় সেইসব বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের দল? কোথায় তাদের খুঁজে পাওয়া যায়? এই গবেষণা নিয়েই আমার দিন কেটে যায়!

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়বার সময় বিপ্লবী সরকারের "Committee of Public Safety"-র গঠনমূলক কাজের বিবরণই আমার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে দেখেছি। তিনটি পার্টি—(i) "Girondists" (ii) "Jacobins" এবং (iii) "Plainists" কে নিয়ে বিপ্লবীরা কন্‌ভেনশ্যান্ ডাকলেন এবং এই কন্‌ভেনশ্যানই ১৭৯৩ সালে Committee of Public Safety-র হাতে "Supreme Executive Authorty" তুলে দিলেন। Committee of Public Safety-র হাতে দুটি দপ্তরের ভার ন্যস্ত হলো। প্রথম দপ্তরটি হলো—Committee of General Security"—এদের হাতে পুলিশের ক্ষমতা দেওয়া হলো—যাতে সারা দেশের জনসাধারণ বিপ্লবী সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য দেয়। দ্বিতীয় দপ্তরটি Revolutionary Tribunal- -যে কোন ব্যক্তি ফরাসী গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি সামান্যতম বিরুদ্ধতা করার চেষ্টাও করবে, তাকেই Guillotine-এ হত্যা করার ক্ষমতা এই ট্রাইব্যুনালকে দেওয়া হলো। তখন মনে হয়েছে—ভারতবর্ষে বিপ্লবী সরকার গঠিত হলে দেশের ও বিপ্লবী সরকারের নিরাপত্তার জন্য Security পুলিশের প্রয়োজন অপরিহার্য। আবার যখন একাগ্রচিত্তে লেনিনের নেতৃত্বে রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছি, তখনও ভেবেছি রুশ বিপ্লবী সরকার ও জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য কমরেড্ Zirziusky-র ভূমিকার প্রয়োজন কতখানি অপরিহার্য! কমরেড্ Zirziusky-র উপর রুশ বিপ্লবী সরকারের নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত। কতখানি দায়িত্ব, কতখানি কর্মদক্ষতা, কতখানি বিচক্ষণতা এবং ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে কমরেড্ Zirziusky-কে এই গুরুভার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে!……হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি কমরেড্ Zirziusky-র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটুখানি বলি। Central Committee-র মেম্বার Zinovier ও Kmanev একদিন লেনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন্—"It is strange that the Security Chief Comrade Zirziusky is after us. He is not sparing even the members of the Central Committee who are being watched by the Police……." লেনিন তাঁদের এই অভিযোগ শুনে একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন—"Comrade Zirziusky is such a

'favatic' that he doesn't trust anybody and puts spy on himself also !" লেনিনের মুখে Comrade Zirziusky-র এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়ে আমি Zirziusky-র প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। দেশের অতবড় দায়িত্ব যাঁর হস্তে ন্যস্ত, তাঁকে তো সত্যিই অতখানি মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বিপ্লবী সরকারের ও দেশের নিরাপত্তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে !

অতীত দিনের এই কথাগুলো আজ বিশেষ করে মনে পড়ে গেল ! কি দুর্ভাগ্য আমাদের ! দেশবরেণ্য বীর যতীন মুখার্জীর প্রতি যিনি বা যাঁরা ঐ ক্ষমতাহীন বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন—আমাদের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ তাঁদের অনুসন্ধান করে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করার কথা দূরে থাক—অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে তাঁরা বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বার করার মনোভাবও গ্রহণ করেননি। আমার অভিযোগ এখানে, কেন আমরা গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিভিন্ন সূত্রের মারফৎ শত্রুচরদের খুঁজে বার করার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করিনি, বরং এই ব্যাপারে উদাসীন থাকাটাই যেন শ্রেয় মনে করেছি !

চট্টগ্রাম দলের বিপ্লবী সাথীরাও এই ঐতিহাসিক অবিপ্লবী মনোবৃত্তির প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। যে বা যে সকল বিশ্বাসঘাতক দল মাস্টারদাকে বন্দী করার ব্যাপারে হাত মিলিয়েছে তাদের অনুসন্ধান স্থগিত রেখে তারকেশ্বরকে হত্যা করাই তারা অধিকতর বৈপ্লবিক দায়িত্ব বলে মনে করলেন।

মাস্টারদাকে বন্দী করার পর পুলিশ অধিক মাত্রায় অনুপ্রাণিত ও সক্রিয় হয়ে উঠলো ও কি উপায়ে বিপ্লবীদলের আভ্যন্তরিক খোঁজ খবর নেওয়া যায় তার জন্য নতুন নতুন পথ আবিষ্কারে মনোনিবেশ করল।

আমরা যখন তারকেশ্বরের হত্যা ব্যাপারে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—সরকার তখন বিপ্লবীদলের মধ্যে অবস্থিত বিভীষণদের হাত করার জন্যও নতুন নতুন গুপ্তচরদের সভ্য হিসাবে দলের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

তা ছাড়াও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের খেলা ও প্রতিযোগীতার মাধ্যমে ব্যাপৃত রাখার জন্য চট্টগ্রামের প্রতিটি স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক খেলাধুলার ব্যবস্থা হলো। ফুটবল ও হকি প্রতিযোগীতায় ছাত্রদের আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সরকারী নির্দেশে আট-দশটি ফুটবলটিম গঠিত হলো।

ছাত্রদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক খেলার আকর্ষণ বাড়াবার জন্য আন্তঃ-থানা এবং সংলগ্ন আন্তঃ-জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতাও বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা হলো, এবং এই ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত হলো M. I. O (Military Intelligence Officer) Mr. Stevens-এর উপর।

ব্রহ্মদেশের 'Tharwardy Rebellion' দমনকারী এই কুখ্যাত M. I. O মিঃ ষ্টিভেন্স, নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ দমননীতির তাণ্ডবতার রথচক্রে চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবশক্তিকে চিরকালের জন্য নির্জীব, নিঃস্তব্ধ ও পঙ্গু করে দেবার চেষ্টায় বিজয় গৌরবে এগিয়ে এলেন। এই স্বনামধন্য পুরুষ M. I. O যেমন একদিকে নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণভাবে দমননীতি চালিয়েছিলেন ঠিক তেমনি আবার অবৈপ্লবিক নৈতিক বিচ্যুতির প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে অভিনব কৌশল প্রয়োগেও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ছাত্রদের ও অভিভাবকদের ওপর অবৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করার অভিপ্রায়ে নানা প্রলোভন, নানা রঙীন আশা, নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য—কাউকে চাকরী, কাহাকে গোয়েন্দাগিরিতে বহাল, কাউকে আবার নৈতিক পথ হতে ভ্রষ্ট করার "সুমহান দায়িত্ব" নিয়ে সর্বপ্রকার নীতি বর্জিত পরিবেশ সৃষ্টি করে নিলেন।

অগ্নিযুগের সব্যসাচী মাস্টারদাকে বন্দী করার পর সভ্যতার শেষ মুখোসটুকুও খুলে ফেলে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পুলিশবাহিনী বাংলা উদ্বেলিত তরুণ যুবশক্তিকে আঘাতে অপমানে, অত্যাচারে উৎপীড়নে পঙ্গু করে দিতে হিংস্র হায়েনার রূপে সমস্ত শক্তি নিয়োগে আত্মপ্রকাশ করলো। কাউকেই রেহাই দেওয়া চলবে না—সদাশয় সরকার প্রতিহিংসা নেবার এমন সুযোগ কোনমতেই হারাতে পারেন না! কাজেই যাকে যখন ইচ্ছা যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করতেই হবে! জনসাধারণ তটস্থ। বালক, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলের জন্যই আলাদা আলাদা লাল, নীল, সাদা পরিচয়পত্র। এ পরিচয়পত্র ভিন্ন কারো এক পা চলার উপায় নাই—বিপ্লবীদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্য সঙ্গীয় পরিচয়পত্রে প্রত্যেকেই চিহ্নিত ছিল। বহু যুবক, কিশোর, বিনাবিচারে জেলে আটক হল—বহুজন গ্রামে অন্তরীণ ও স্বগৃহে নজরবন্দী হয়ে রইল। যেসব যুবক গ্রামে ও স্বগৃহে অন্তরীণ হয়েছিল তাদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কঠোর ও বিস্তারিত নির্দেশ ছিল।

এই তো গেল বিনাবিচারে আটক রাখার ও বিনাবিচারে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার নিদারুণ চিত্র। সভ্যজগতের সমস্ত আইন-শৃঙ্খলাকে উপহাস করে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদী সরকার শাসনদক্ষতার যে সকল নিদর্শন চট্টগ্রামে রেখে

গেছেন তার উপমা জগতে বিরল। কবির ভাষায় বলতে হয়—"দোষী জানিল না কি দোষ তাহার, বিচার হইয়া গেল"। বিচারক স্বয়ং Mr. STEVENS, The M. I. O.। আর আদালতগৃহ—লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁরই অফিস ভবনের একটি শীতল ক্ষুদ্র নির্জন কক্ষ। অতি ভয়াবহ, অতি ভয়ঙ্কর। পুলিশ কর্তৃক সাব্যস্ত অপরাধীর একতরফা সমস্ত "প্রমাণাদি" সর্বময় কর্তা পুলিশ ও সামরিক দপ্তরের হাতে। বিচারার্থে যে অপরাধীকে বন্দী করে এখানে আনা হোল তার পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল ব্যারিষ্টার থাকার কথা তো ওঠেই না। বরং বন্দী যে কে তাও কারো জানা সম্ভব ছিল না।

"বিচার" সুরু হোল--"বল তুমি কি জান? নাম বল, সব বল, যা জান সব খুলে বল " যদি উত্তর হলো "জানি না"—তখন মহানুভব বিচারক Mr. Stevens আর তার সহকারী একজন বাঙ্গালী পুলিশ ইনস্পেক্টার (যার নামটি আমার সংগৃহীত টুকে-রাখা-কাগজের মধ্যে এখন খুঁজে পাচ্ছি না) "বিচারের" সুযোগ গ্রহণ করে বলেছেন—"টাকা দেবো, চাকরী দেবো, ইন্দ্রলোকের অমৃত সুরা দেবো—তুমি ভাই আমাদের সঙ্গে যোগ দাও ।" তারপরও যদি উত্তর আসে—"না, না—না। আমি কিছু জানি না। যদি জানি তবু বলবো না—তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাবো? গুপ্তচর হব? তোমাদের স্পর্দ্ধার সীমা থাকা দরকার • • ।"

"অপরাধীর" মুখের ঐরূপ তীক্ষ বীরত্ব-ব্যঞ্জক উত্তরে মুহূর্তে "বিচার" সমাপ্ত হ'ল এবং তখনই সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডাদেশ পালিত হ'ল। কেউ খোঁড়া হলো, কারো হাত ভাঙ্গলো, কেউ-বা চক্ষু হারালো। ১৯৩০ ১৯৩৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসনের আমলে চট্টগ্রামের বুকের উপর বাদশাহী আমলের বিচার-পদ্ধতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নির্মম শারীরিক অত্যাচারে বিপ্লবী যুবকদের কেবল যে বিকলাঙ্গ করা হয়েছিল তা নয়, সংঘর্ষে বিপ্লবী যুবকরা কেবল যে প্রাণ দিয়েছিল তাও নয়, বর্বর অসভ্য বৃটিশ-শাসনের কলঙ্কময় ইতিহাসের পাতা আরো গভীর মসীলিপ্ত হয়েছিল। যখন বিনা বিচারে কেবলমাত্র সন্দেহের বশে বা বিপ্লবী যুবকদের অনমনীয় দৃঢ় মনোভাবের নিকটে পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষিপ্ত Stevens সাহেব কারো কারো প্রাণ নিতেও দ্বিধাবোধ করেন নি।

M. I. O-র গুপ্ত দলিলপত্রে বীর বিপ্লবী যুবক পরোজ চৌধুরী "অপরাধী" সাব্যস্ত হলো। আর নিস্তার নেই। "আসামী" উপস্থিত। "বিচারক"

Mr. Stevens ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত শৃঙ্খলিত পয়োজকে প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন—"বল, বল,—বল সব"। "না—না", উত্তরে হয়ত Stevens-এর গর্জন একেবারে ডুবে গিয়েছিল। আমরা কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। পযোজের মুখে একটি কথাও শোনার সুযোগ আমাদের কারো হয়নি। এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য—একেবারে চিন্তার বাইরে! পুলিশ যমদূতরা পযোজকান্তিকে ধরে নিয়ে গেল "আজ" সকালে, আর তারপরদিন তখনও ভোরের সূর্য দিনের আগমনবার্তা জানায়নি—পযোজ তার নিজ বাড়িতে ফিরে এলো! দেখা গেল নির্জীব, স্পন্দনহীন, পয়োজের শীতল মৃতদেহটি বাড়ির ফটকের সামনে পড়ে আছে।

বাড়ীর মধ্যে বুকফাটা কান্নার রোল উঠলো। ভাই বোনের দীর্ঘশ্বাস, পিতামাতার হাহাকার পয়োজকে আর ফিরিয়ে আনতে পারলো না। ভারতবাসীর ক্রুদ্ধ গর্জনই মাত্র শোনা গেল—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-সরকার ধ্বংস হউক

সরকার ও পুলিশের চক্রান্তের জবাব আমরা খুব কমই দিতে পেরেছি। অধিক শক্তিশালী ইংরেজের বিরুদ্ধে মাস্টারদার গণতন্ত্র-বাহিনীর বিধ্বস্ত অংশটি সামান্য হলেও সীমিত শক্তি নিয়ে হার মানতে রাজী হয় নি। এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে গ্রামেও স্বগৃহে যুবকদের অন্তরীণ রেখে এবং খেলাধূলো ও প্রতিযোগিতার নূতন পরিবেশের মাধ্যম বৈপ্লবিক মনোভাব দুর্বল করে তোলার সাধারণ জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ এগিয়ে ছিলেন এবং সেইপথে বেশ সফলতাও অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু তাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বিপ্লবীদলে বিভীষণদের প্রতিষ্ঠা করা। সেইজন্য গ্রামে ও স্বগৃহে অন্তরীণ রেখে পুলিশ ও মিলিটারী Intelligence বিভাগ যুবকদের নানা ভাবে হাত করবার চেষ্টা করত। যখন তখন নজরবন্দীদের বাড়ীতে গিয়ে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশের লোকেরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গুপ্তচর রিক্রুটের ব্যবস্থা করতো।

আমাদের দলের বিপ্লবী সভ্য রোহিণী বড়ুয়া গ্রামে অন্তরীণ। পুলিশের কর্তারা এবং, থানার দারোগা মিলিতভাবে চেষ্টা করল রোহিণীকে নৈতিক বিচ্যুতির পথে ঠেলে দিতে। চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ও মাস্টারদার শিক্ষা শত্রুপক্ষের এইরূপ হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রোহিণীকে অনুপ্রাণিত করল। রোহিনীর দৃঢ় সংকল্প সে একটি নিদর্শন রেখে যাবে যাতে পুলিশ তাদের এই হীন চক্রান্ত থেকে ভবিষ্যতে বিরত থাকে।

যদি কারো হৃদয়ে একবার বিপ্লবী শক্তি জাগে—যদি সাহস—আরও সাহস—ও অপরিসীম সাহসের অধিকারী হয় তবে দুর্দমনীয় শক্তি নিয়ে সে যে শত্রুকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ' বীর বিপ্লবী যুবক রোহিণী বড়ুয়া পুলিশের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। থানার যে দারোগার তত্ত্বাবধানে রোহিণী আছে—তাঁর বিরুদ্ধেই রোহিণীর আজ এই "অভিযান"। তার ক্ষমা নেই—তাকে আজ এ পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হবে। .....রোহিণী থানার দারোগাকে হত্যা করল। পালাবার উপায় ছিল না। পালাতে চেষ্টাও করল না সে। বিচারে রোহিণীর ফাঁসীর হুকুম হোল। হাসি মুখে ফাঁসির রজ্জুকে বিদ্রূপ করে unwept, unhonoured ও unsung এই বীর বিপ্লবী দেশবাসীর কাছ হতে চির বিদায় নিল।

আমার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের তৎপরতা ও অভিনব কর্মকৌশলের বিষয় সম্বলিত এই বিশেষ অধ্যায়টি এখানেই শেষ করব ইচ্ছা করেছি। যেসকল ব্যাপারের উল্লেখে এই ছোট্ট অধ্যায়টির সমাপ্তি সেটি মাষ্টারদার ফাঁসি হয়ে যাওয়ারও প্রায় দেড় বৎসরকাল পরের ঘটনাবলীর বিবরণী।

মাস্টারদা ধরা পড়ার পর পুলিশ স্বভাবতই যে এই সাফল্যে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিল এবং আমরা যে সেই অনুপাতেই নিরুৎসাহবোধ করেছি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই অবস্থার সন্ধিক্ষণে বিপ্লবীদের ও পুলিশের মধ্যে প্রতিযোগিতা—কে কা'কে বিধ্বস্ত করবে। শক্তিশালী সরকারের প্রচণ্ড ক্ষমতা। তারা বহু ছাত্র যুবককে গ্রামে ও স্বগৃহে অন্তরীণ রেখে তাদের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে নিল। পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের এইরূপ গোপন সাক্ষাৎ অত্যন্ত ভয়াবহ। তাদের মধ্যে কে কতখানি পুলিশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে ছদ্মবেশী বিপ্লবী সেজেছে তা কারও পক্ষে সহজে জানা সম্ভব ছিল না। বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের মিথ্যা ধ্বজা উড়িয়ে কত বিভীষণ যে ছদ্মবেশে দলে সভ্যদের প্রতারণা করতে সমর্থ হয়েছে তার সঠিক হিসাব কে দেবে!

আগেই লিখেছি একটি ঘটনার বা একজন বিপ্লবীর গোপন আস্তানার সন্ধান প্রকাশ হওয়াটা যে কেবল একজনেরই দুষ্কৃতির ফল তা নয়। মাস্টারদার বন্দী হওয়াটা একজনেরই বিশ্বাসঘাতকতায় হয়েছে এবং কেবল একজনই

তাঁর সন্ধান দেওয়ার জন্য দায়ী, তা ভাবলে ঠিক হবে না। তা'হলে এই একটি দোষে দোষী অনেক বিভীষণ নিষ্কৃতি লাভ করবে।'

যুবকদের স্বগৃহে ও গ্রামে অন্তরীণ রেখে তাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দলের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য ফাঁদ পেতে পুলিশ প্রচুর সুফল পেয়েছে।

মাস্টারদার অবর্তমানে সংগঠন যখন নাবিকবিহীন তরণীর মত মহাসাগরের বুকে দিক্‌হারা হয়ে দোল খাচ্ছে দলের অবশিষ্ট তাঁদের পূর্ণ দায়িত্ব পালনে অক্ষমতাবশতঃ অন্যান্য জেলায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন। আত্মগোপনকালের নিষ্ক্রিয় জীবন অনেককেই তাদের অজান্তেই আত্মকেন্দ্রিক করে তুলে ছিল। এইরূপ একটি জটিল পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্লবীরা যখন নেতৃত্বহারা তখন সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে মাস্টারদার উত্তর-সাধক তেজেন্দ্রলাল দত্ত নিজ গ্রামে ফিরে এলেন, তাঁকেও স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হলো।

পাঁচ বৎসর বন্দী জীবন যাপনের পর তেজেন্দ্র যখন চট্টগ্রামে তাঁর স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন তখন মাস্টারদা আর ইহজগতে নেই, কৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে যাঁরা ক্রিকেট খেলার মাঠে ইংরেজদের ওপর আক্রমণ চালাতে গিয়েছিলেন তাঁরাও শত্রুর প্রতি আক্রমণের মুখে প্রাণত্যাগ করেছেন। ১৮ই এপ্রিল যুববিদ্রোহের দিনে যাঁরা প্রথম সারির যোদ্ধা বলে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ভগ্নাংশের মত যে বা যাঁরা তখনও বেঁচে ছিলেন এবং তখনও আত্মগোপন করে কাল কাটাচ্ছিলেন—তেজেন্দ্র তাঁদেরও কর্মক্ষেত্রে দেখতে পেলেন না। তাঁরা নিরাপদে আত্মগোপন করে থাকার অভিপ্রায়ে চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

মাস্টারদার বৈপ্লবিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য—মৃত্যু সেও ভাল—তবু যে নেতৃত্ব দেবে তার পক্ষে প্রধান সমর শিবির পরিত্যাগ করা একান্ত অনুচিত এবং অমার্জনীয় অপরাধ। মাস্টারদা তাঁর বিপ্লবী সৈনিকদের নৈতিকবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই হেড কোয়ার্টার কখনও পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর অবর্তমানে আজ যখন দৃঢ় হস্তে হাল ধরার প্রয়োজন তখনই চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের এই শোচনীয় পরিণতি।

এই সন্ধিক্ষণে তেজেন্দ্রের স্বগৃহে অন্তরীণ হওয়া যেন ভাঙ্গা আসরে এক বিপ্লবী নায়কের অবতীর্ণ হওয়া। অনেক নিয়মাবলীর অধীনে থেকে সাংগঠনিক কাজ করা অন্তরীণ অবস্থায় খুব সহজসাধ্য নয়। যাঁদের নিয়ে কাজ করতে হবে তাঁদের মধ্যে যদি একজনেরও নির্বাচন ভুল হয় তবে

সংগঠনের কর্মোগুমের সংবাদ সেই বিশ্বাসহন্তা নিশ্চয়ই পুলিশের গোচরীভূত করবে। এই পরিস্থিতির সম্যক উপলব্ধি তেজেন্দ্রের ছিল। বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ এই দুর্গম পথের নানা ভয় ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দ্বিধাহীন চিত্তে তেজেন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে যুবকদের নৈতিক ও বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন।

সেইযুগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশাসকগোষ্ঠীর কাউকে কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে হত্যা করা এবং বিপ্লবীদের পথে যেসব ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিশ বা দলের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকদল বাধাস্বরূপ এসেছে তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা দলের শক্তি অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। মাস্টারদার অবর্তমানে কৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে চট্টগ্রাম শাখার ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর তিনজন সদস্য সাফল্যের সম্ভাবনা একরূপ নাই জেনেও Cricket Ground-এ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

দলের শক্তি সীমিত। যারা তখনও মাথা নত করতে চাইছিলেন না—তাঁরা প্রায় সকলেই গৃহে অন্তরীণ। তাছাড়া তাঁরা এমন একটি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন যে সামান্য একটু ষড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচীর প্রাথমিক আলোচনাও পুলিশের অগোচরে রাখা কোনমতে সম্ভব হচ্ছিল না। স্বভাবতঃই কারো বুঝতে বাকি রইল না যে—অন্তরীণাবদ্ধ বিপ্লবীযুবকদলের মধ্যেই বিভীষণ উপস্থিত। কিন্তু সে কে বা তারা কারা যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে? বাস্তবে দেখা যাচ্ছে মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিশ্বাসঘাতকের ছিন্ন শিরের নিদর্শনও বিভীষণের কর্মোগুমকে নিরুৎসাহ করতে সক্ষম হচ্ছে না। স্বার্থের লোভে তারা পুলিশের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

তেজেন্দ্র ও তাঁর সাথীরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে দলের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দাকে খুঁজে বার করতেই হবে এবং তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে গুপ্তচরেরা অন্ততঃ কিছুটা ভয় পায় এবং এইরূপ অবাধগতিতে শত্রুতা করার সাহস না করে। স্বগৃহে অন্তরীণ থাকলেও ইচ্ছা করলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে মেলামেশা করা যায় এবং বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে বাস্তব রূপও দেওয়া যায়। তেজেন্দ্রের নেতৃত্বে যে কয়জন বিপ্লবী যুবক তখন সুসংবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা নানাভাবে খোঁজ-খবর করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, দলের কর্মী পরেশ গুপ্তই গোয়েন্দা পুলিশকে রীতিমত আভ্যন্তরীণ খবরাদি সরবরাহ করে চলেছে।

এক গোপন সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে—"পরেশ গুপ্ত পুলিশের চর, তাকে আর অবাধ বিচরণের সুযোগ দেওয়া হবে না। তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার চাইতে চিরকাল বিকলাঙ্গ করে রাখার ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত। তাতে জনসাধারণও তার দুষ্কৃতির বিষয় অবগত হবে এবং এইরূপ একটি আদর্শ শাস্তিতে বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে সেও সারাজীবন অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরবে। পরেশকে নিভৃতে একাকী পাওয়া খুব সহজ। দলের গুপ্ত-সভায় সে যথারীতি উপস্থিত থাকতো—এবং অন্তরীণ আইন লঙ্ঘন করে গোপনে মিলিত হতো বলে ব্যক্তিগত চলাফেরা ও আনাগোনা পরিচিত লোকের দৃষ্টির অগোচরেই করত।

তেজেন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে—গুপ্ত সভার নির্ধারিত দিন, সময়, ও স্থান সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে খবর দেওয়ার জন্য পরেশের কাছে লোক পাঠানো হলো। তাকে জানানো হলো বোয়ালখালী থানায় শ্রীপুর গ্রামে 'কানুর দীঘির' পাড়ে রাত দশটা থেকে এগারটার মধ্যে দলের গুপ্ত সভায় মিলিত হওয়ার জন্য পরেশ যেন সেইদিন নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত হয়।—"যুব বিদ্রোহের একজন বলিষ্ঠ কর্মী ভবতোষ ভট্টাচার্য ১৯৩০ সাল থেকে আত্মগোপন করে আছেন, বিশেষ প্রয়োজনে তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হতে আসবেন……! এই মিলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরেশ গুপ্তের জানা কোন মতেই সম্ভব ছিল না। সে যথারীতি উৎসাহের সঙ্গে সভায় যোগ দিতে চলেছে—আজ হয়তো আশা করেছে অনেক নতুন খবর পাবে এবং গোয়েন্দা বিভাগকে সেইসব সংবাদ সরবরাহ করে মোটা অর্থলাভ করবে। কিন্তু হায়রে পরেশ! তুমি এখনো জান না তোমার অঙ্গ লক্ষ্যে শাণিত অস্ত্রখানি বিপ্লবী যুবকের দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ!

কানুর দীঘির পাড়ে তেজেন্দ্র বসে আছেন, ভবতোষের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করবেন। তাঁর সঙ্গে আরও চার পাঁচ-জন সাথী কথা বলছে! এমন সময় দেখা গেল পরেশ গুপ্ত সভায় যোগ দিতে আসছে। ঠিক ছিল পরেশের সঙ্গে তারা সামান্য কথাবার্তা চালাতে চালাতে আরও দুজন সদস্য উপস্থিত হয়ে পরেশকে অতর্কিতে—'দা' দিয়ে আঘাত করবে। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল—পরেশ গুপ্তের ডান হাতটি কেটে নিয়ে বাজারে ঝুলিয়ে রাখবে এবং সেই হাতের নীচে বড় বড় অক্ষরে সাইন বোর্ডে লেখা থাকবে—"বিশ্বাসঘাতক পরেশ গুপ্তের এই পরিণাম।"

পরেশ সভায় যোগ দিল। তেজেন্দ্রকে ভবতোষ ভেবে প্রণাম করল। তারা নির্দ্ধারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলো। দুই-এক মিনিট

কথা বলার পরই প্রসঙ্গটা হঠাৎ পাল্টে গেল—"দলের গোপন কথা পুলিশ কিভাবে জানতে সমর্থ হচ্ছে? তোমার কি মনে হয়?....." আর কথা বাড়ানো প্রয়োজন ছিল না। সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন—তাদের সঙ্গে যে দু'জন সবেমাত্র যোগ দিলেন তাঁদের দুজনের হাতে দুটি ধারালো দা অকস্মাৎ দেহ আবরণের মধ্য হতে বেড়িয়ে এলো। আসন্ন বিপদের উপলব্ধিতে পরেশ গুপ্ত চীৎকার করে উঠলো। যদি সময় পেতো হয়তো তার সাথীদের কাছে করুণা ভিক্ষা চাইত। কিন্তু সেই সময় ও সুযোগ সে আর পেলো না—চোখের সামনে শাণিত দা'টি ঝল্‌সে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার ডান হাতখানি কাঁধ হতে একেবারে ঝুলে পড়ল ও হাতের কয়েকটি আঙ্গুল সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। প্ল্যান ছিল ডান হাতটি সম্পূর্ণভাবে কেটে নিয়ে আসা হবে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে সেইরূপ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ডান হাতটি আর কেটে আনা গেল না।

মাস্টারদার আশ্রয়স্থলের গোপন সংবাদ শত্রুকে সরবরাহ করার অপরাধে গুপ্তচরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়। তার জন্য চট্টগ্রামবাসী এমনকি সারা ভারতবর্ষের লোক বিভীষণ নিধনের জন্য কতই না আনন্দ উপভোগ করেছিল। সেই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে এই বিশ্বাসঘাতক পরেশ গুপ্তকে বিকলাঙ্গ করার সংবাদেও চট্টগ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উল্লাসের অবধি ছিল না।

ইংরেজ সরকারের খবরাদি সংগ্রহের একটি সক্রিয় কৌশল ধরা পড়ে গেল। এ পরাজয় মেনে নেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বগৃহে অন্তরীণ যুবকদের মারফৎ সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা বানচাল করার জন্যই পরেশ গুপ্তের উপর এই আক্রমণ। কাজেই পরেশ গুপ্তকে বিকলাঙ্গ করার ষড়যন্ত্রের অপরাধে পুলিশ (১) অবিনাশ দত্ত, (২) দেবেন্দ্র দত্ত, (৩) নোয়াব মিঞা, (৪) বিমল বিশ্বাস, (৫) বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, (৬) অমূল্য আচার্যকে গ্রেফতার করল। সরকার নিশ্চয়ই কোন তথ্যের উপর নির্ভর করেই এই ছয়জন যুবককে গ্রেফতার করেন—তাঁরা সকলেই তখন স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন।

এই ছ'জনের বিচারও ট্রাইব্যুনালে হয়। তিনজন বিচারককে নিয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলো—জেলাজজ মিঃ ওয়েট প্রেসিডেণ্ট, অবসরপ্রাপ্ত জজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ও সদর এস্. ডি. ও।

যাদের বিরুদ্ধে মামলা, তাদের আর্থিক সঙ্গতি তেমন ছিল না। তবু এই ছয়জন যুবকের অভিভাবকেরা কোন ভাল আইনজ্ঞকে দিয়ে তাদের পক্ষে মামলা তদ্বির করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবিনাশ দত্তের অবস্থা সচ্ছল না হলেও তাঁর অভিভাবকেরা জমিজমা বিক্রয় বা বন্ধক দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করলেন ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলকাতায়—দেশবরেণ্য প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হলেন। আমাদের বিচারের সময় শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট হতে আমরা যে আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিলাম চট্টগ্রামের সকলেই তা জানতেন। সেই ভরসা নিয়েই অবিনাশের দাদা ও শরৎবাবুর সাহায্য লাভের আশায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শরৎবাবু প্রখ্যাত শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার জে. পি. মিত্রকে এই মামলার ভার নিতে অনুরোধ করেন। শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার জে. পি. মিত্র সাগ্রহে অভিযুক্ত বিপ্লবী যুবকদের সমর্থনে মামলার দায়িত্ব নিলেন।

যথারীতি মামলা আরম্ভ হলো। সরকার বৈপ্লবিক ইতিহাসে এই বিচার প্রহসন—'চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুবিদিত'। সাহেবের সঙ্গে নিজের মত প্রচারের উদ্দেশ্য যদি স্বীকারোক্তি করা হয়, তবে সেই স্বীকারোক্তি নিজের বিপক্ষেই শত্রুর হাতে ব্যবহৃত হয়। অমূল্য আচার্য অবস্থাবিশেষে একটি স্বীকারোক্তি করেছিল। ব্যারিষ্টার মি. জে পি মিত্র অভিযুক্তদের জানালেন যে "স্বীকারোক্তি যদি প্রত্যাহৃত না হয় তবে যে স্বীকারোক্তি করেছে তার তো শাস্তি হবেই এবং বিচারে অন্যান্যদেরও মুক্ত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তাই ট্রাইবুনালের কাছে অমূল্যের স্বীকারোক্তি যেন প্রত্যাহৃত হয়—কোনরূপ প্রচারের উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে না রাখাই ভালো।' যুবকেরা তাঁর কথা মেনে নিয়েছিলেন এবং অমূল্য আচার্য তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহৃত করেছিলেন।

ট্রাইব্যুনাল বিচারের রায়ে অমূল্য আচার্যের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও বাকি পাঁচজনের মুক্তির আদেশ হলো। অমূল্য আচার্য এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে হাইকোর্টের বিচারপতিরা অমূল্যের দণ্ডাদেশ হ্রাস করে তাঁকে দশ-বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিলেন।

আমরা তখন আন্দামানে। বাংলা ও ভারতবর্ষের নানাস্থান হতে বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামান জেলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। কিন্তু মহান্ সরকার মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে অম্বিকাদাকে মেডিকেল গ্রাউণ্ডে আন্দামান জেলে স্থানান্তরিত করলেন না। অম্বিকাদা সত্যই খুব অসুস্থ ছিলেন—টিউবার-

ফুলেসিস্ বলে মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট ছিল। সরকার তাঁদের মহানুভবতা প্রচারের উদ্দেশেই অম্বিকাদাকে আন্দামান জেলে স্থানান্তরিত করে নি। অমূল্য আচার্যকেও আন্দামানে পাঠানো হয়নি। বাংলাদেশের জেলেই অম্বিকাদার সঙ্গেই অমূল্য আচার্যকে কারাদণ্ড ভোগের জন্য রেখে দেওয়া হয়। তাই অমূল্যের সঙ্গে জেলে আমাদের আর সাক্ষাৎ হয়নি।

বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ইতিহাস পর্য্যালোচনায় বিপ্লবীদের হাতে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের প্রতি চরম দণ্ড বিধানের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কানাইলালের রিভলভারের মুখে দেশদ্রোহী নরেন গোসাইয়ের মসীলিপ্ত জীবনের অবসান কাহিনী জনসাধারণ আজও আলোচনা করে। মাস্টারদার পরিচালিত বিপ্লবীদলে—অতুলনীয় শৌর্যবীর্যের জন্য যে হিমাংশু ভৌমিক "রাজা" নামে পরিচিত ছিল, তার সবল বাহুর নিষ্পেষণেও বিশ্বাসহন্তা গুপ্তচর যুবককে প্রাণ দিতে হয়েছে। মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ গুপ্তচরের ছিন্নশির ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। বিপ্লবীদের হাতে বিকলাঙ্গ দেহ নরেশ গুপ্ত আজও দেশদ্রোহীতার শাস্তির নিদর্শন বহন করে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। দেশের বুক হতে তবু কি দেশদ্রোহী, বিশ্বাস-হন্তা, গুপ্তচর-বাহিনী বিলুপ্ত হয়েছে? বিশ্বাসভঙ্গ ও "দশের" সঙ্গে শত্রুতা করার অপরাধে সুনিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড ও জেনেও স্বার্থপরতা, লোভ ও এক "আনন্দজগতের" বিলাস স্বপ্নের মোহে আচ্ছন্ন মানুষ তার প্রিয় সাথীদেরও সমাধি রচনায় বিরত হতে সক্ষম হয় না। আশ্চর্য মানব-চরিত্র। আজও যারা সাথী, সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে যাদের সঙ্গে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে একত্রে অংশ গ্রহণ করেছে মুহূর্তে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে—শত্রুর চরণে আত্ম-বিক্রয় করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হয়ে ওঠে, এ এক বিচিত্র ব্যাপার। কে কিভাবে মুহূর্তে স্বার্থে অভিভূত হয়ে পড়ে বিশেষভাবে তা যদি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা না যায় তবে বহু দেশদ্রোহী তাদের বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা সম্পূর্ণ গোপন রেখে দলের মধ্যে নেতাদের পদ অলংকৃত করেই সারাজীবন যে অনায়াসে কাটিয়ে যেতে সক্ষম হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। দেশবরেণ্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ হিসাবে যাঁরা সুপরিচিত তাঁদের প্রত্যেকের জীবনই কি সকল জিজ্ঞাসার উর্দ্ধে? সন্দিগ্ধ বিশ্লেষণী মন নিয়ে বিপ্লবী জীবনের সুরুতেই যে গবেষণার আরম্ভ আজও আমার জীবনে তার সমাপ্তি ঘটে নাই। আমার গবেষণার Conclusion (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত)—যতীন মুখার্জীর প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের মধ্যে সবাই বেঁচে

না থাকলেও কেউ কেউ আজও "নেতার" গদিতে বসে ভাঙ্গাহাটে অতীত বিপ্লবী জীবনের নকল পণ্যে ব্যবসা চালাতে পিছ পাও নয়। আর এই মরীচিকার বিভ্রান্তিতে মুগ্ধ কত সরল সুন্দর নিঃস্বার্থ প্রাণ যে এই আলেয়ার পিছনেই অন্ধের মত ছুটে চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই!

মাস্টারদাকে ধরিয়ে দেবার অপরাধে বিপ্লবীদের খড়গে অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদের বিবরণ দেশবাসীর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তারা জানে না যে মাস্টারদার সন্ধান পাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। যুবকদের স্বগৃহে বা গ্রামে অন্তরীণ রেখে তাদের কাছ হতে মেলামেশার মাধ্যমেই কেবল যে পুলিশ সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে তা নয়— অত্যন্ত গুরুতর গোপন সংবাদ সংগ্রহ করাও সহজ হয় যদি বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় কাউকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হয়। বিনাবিচারে বন্দী, বা দশ বছর, বিশ বছর বা পঁচিশ বছরের জন্য নিবাসন দণ্ডে দণ্ডিত—এমনকি আন্দামানে নির্বাসিত—সব "অসূর্যম্পশ্যা রথী মহারথী" বিপ্লবীদের প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা হতে পুলিশ বিরত হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। আন্দামান সেলুলার জেলে সবাই যে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী ছিলেন তা নয়। তিন চার বছরের জেল ভোগের দণ্ড প্রাপ্ত অনেকেও সেখানে ছিলেন। অনেকে স্বাস্থ্যের অজুহাতে ও অনেকে সরকারী ডাক্তারের অনুমোদনে বাঙ্গলার জেলে পুনঃস্থানান্তরিত হয়েছেন। কারো কারো কম মেয়াদ ছিল বলেও মুক্তির জন্য বাঙ্গলার কারাগারে ফেরৎ আসেন। 'কার কত কাল দণ্ড ভোগ ছিল' বা 'কার ফাঁসির হুকুম হোল', সেইরূপ দণ্ডাদেশের বাহ্যিক গুরুত্ব দেখে, বিপ্লবী-দলের "নেতাদের" যোগ্যতা বা তাদের সততা বা বিশ্বাসঘাতকতার মাপকাঠি নির্দ্ধারণ করা যায় না। এমন এমন বিশেষ ক্ষেত্র আছে যেসব ক্ষেত্রে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে কারো শাস্তি বেশী হয়, কারো কম হয়, আর কেউ বা মুক্তিও পায়। কারো কারো আবার ফাঁসির হুকুম হয়েও High Court-এ প্রাণদণ্ড Commuted হয়। গ্রেফ্তারের বহু রকমফেরের, দণ্ডাদেশের বহু তারতম্যের বহুঅভিজ্ঞতায় বুঝেছি—আন্দামানে নির্বাসনে নাকি বাংলার জেলে রাখা—পুলিশ কোনটি শ্রেয় মনে করেছে। কে কিভাবে মুক্তিলাভ করেছে আপাতঃদৃষ্টিতে তা কিছু বোঝা যায় নি—যায়ও না। প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করে তবেই পুলিশের এইরূপ বিভিন্ন ধরণের চাপের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। স্বভাববশতঃ এইরূপ চেষ্টার ত্রুটি আমার কখনও ছিল না, আজও নেই।

ধলঘাটের বাড়ির খোঁজ পুলিশ কি করে পায়? সেই কাছাকাছি এলাকায় মাস্টারদার গৈরলার বাড়ির ঠিকানাও কি সেই একই বিশ্বাসঘাতক সরবরাহ করেছিল? আবার গৈরালাতে যেখানে তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা বন্দী হয় এবং মিলিটারী ও পুলিশের গুলিতে দুজন বিপ্লবী মৃত্যুবরণ করে— গৈরালার সেই বাড়ির ঠিকানাই বা পুলিশকে কে দিয়েছিল? সেই সকল বিশ্বাসঘাতক নিজেদের আজও বিপ্লবী বলে পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছদ্মবেশে ছদ্ম ভূমিকায় নিজেদের "বিপ্লবী অস্তিত্ব" বজায় রাখবার চেষ্টায় বিশ্বাসঘাতকেরা অত্যন্ত সুকৌশলী। জেলে থাকাকালে পুলিশের আওতায় এসে কোন বিপ্লবী "নেতার" কি পরিণতি ঘটেছে তার হদিশ পাওয়া খুবই কঠিন। তবু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সন্তর্পণে সাবধানে এগোতে পারলে ছদ্মবেশী বিভীষণদের দূরে রাখা সম্ভব হলেও হতে পারে।

আমাদের তরুণ বিপ্লবী সাথীরা তখনও যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়নি তখনও তাঁরা আনন্দমঠের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তখনও তারা পেটিবুর্জোয়া স্খলন ও বিচ্যুতি হতে মুক্ত ছিলেন না বলে অনেকেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। একটু অবাস্তব হয়ে পড়বে যদি বলি পেটিবুর্জোয়া বিচ্যুতির প্রভাবে অগ্নিযুগের তরুণ বিপ্লবীরাও ভেসে গিয়েছিলেন, যদি মনে করি যে মার্কসবাদ লেনিনবাদ অধ্যয়ন করেছেন বলে বর্তমান যুগে বিপ্লবীরা পেটিবুর্জোয়া বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে—তা হলে ভুল হবে—বাস্তব ইতিহাসকে উপেক্ষা করা হবে। ক্রুশ্চেভ থেকে আরম্ভ করে তরুণ মার্কসবাদী লেনিনবাদীরাও জ্ঞানের অহমিকা, নেতৃত্বের মোহ, গোপনচক্র সৃষ্টির বাসনা ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার অবৈপ্লবিক বিচ্যুতি হতে মুক্ত নহেন।

হউক না কেন অগ্নিযুগ, বা আজিকার বর্তমান—অন্তরে যদি ঐকান্তিক বিপ্লব সাধনা, নিষ্ঠা, ও সততা না থাকে তবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পুস্তকাদি চিবিয়ে খেয়ে ফেললেও বিচ্যুতির প্রভাব মুক্ত থাকা সম্ভব নহে। অগ্নিযুগে যাঁরা একনিষ্ঠ হয়ে বিপ্লবী কর্মসূচীর সফলতাই কামনা করেছিলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ, অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রগলভতা বিচ্যুতির পথে তাঁদের ঠেলে দিতে সক্ষম হয় নি। ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রভাবের সঙ্গে অন্তরের গভীরতা ও নিষ্ঠার অভাব যুগের পরিবর্তনেও মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আনতে পারে না।

অবিনাশ দত্ত সম্বন্ধে আগে লিখেছি। বর্তমানে তিনি Writers

Buildings-এ সরকারী কর্মে নিযুক্ত। 'পরেশ গুপ্তকে' বিকলাঙ্গ করাতে "চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলার" একজন প্রধান "আসামী" হিসাবে অবিনাশকে অভিযুক্ত করা হয়। সরকারী কৌঁশুলীর মতে অবিনাশই প্রথমে 'দা' দিয়ে পরেশকে আঘাত করে। এই creditটা অবিনাশ অনায়াসেই নিতে পারত—কিন্তু সে তা করেনি। পরেশ গুপ্তকে কে প্রথমে আঘাত করেছিল তার কাছে জানতে চাওয়াতে—কোনরূপ বড়াই না করেই অবিনাশ অকুণ্ঠচিত্তে বলেছিল—"প্রথম আঘাত করেছে নোয়াব মিঞা।" অতিরঞ্জিত আত্মপ্রচারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবিনাশের একটি সহজ ও সংযতভাব লক্ষ্য করেছি। আমার খুব ভাল লেগেছে। কতগুলি ঘটনার বিবরণ দিয়ে অবিনাশ আমাকে প্রায় দশপৃষ্ঠা লিখে দিয়েছে। তা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিলাম—"……এই নতুন কৌশলের পরিণতিতে ছাত্রদের উজানমুখী গতি কোন কোন ক্ষেত্রে স্তিমিত হইয়া আসিল—খেলাধুলার প্রতি অনুরক্তি দেখা দিল এবং ক্রমে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য বিমুখী একটি পরিবেশ সৃষ্টি হইল। এই নতুন অবস্থায় মাস্টারদার অনেক উত্তর-সাধক নেতার মধ্যেও ক্রমে উদ্দীপনাহীনতার লক্ষণ দেখা দিল ফলে এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমে আত্মকেন্দ্রীকতা ও আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বড় হইয়া দেখা দিল। এই অবস্থায় কিছু কিছু বিপ্লবী কর্মী চট্টগ্রামের মূল কেন্দ্রস্থল ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন "

আগেই লিখেছি—দলের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য—বিশ্বাসঘাতকদের অনুসন্ধান ত্যাগ করে দলের দু'জন সভ্য তারকেশ্বরকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে অগ্রণী হলেন। একজন বাধা দিল। তার মতে ফুটুদার (তারকেশ্বরের) বিরুদ্ধে চরম দণ্ড প্রয়োগ করতে হলে সংগঠকদের পূর্ণাঙ্গ বৈঠকেই সে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। মাষ্টারদার অবর্তমানে যে কর্ণধার তার বিরুদ্ধে এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কখনও সবার উপস্থিতি ভিন্ন নেওয়া চলে না।"

সেই দু'জন অগ্রণী সাথী তখনকার মত সাময়িকভাবে নিরস্ত হয়েছিলেন। তারপর সংগঠকদের নিয়ে তারা পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে তারকেশ্বরের বিচারের ব্যবস্থা করলেন। দলের নেতৃত্বভার তারকেশ্বরের হস্তে ন্যস্ত—তার বিরুদ্ধে যে কি এক বিরাট চক্রান্ত চলেছে, তার অনুপস্থিতিতেই যে তার বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে—এবং সেই বিচারে যে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হবে—সে তা কল্পনাও করতে পারল না!

তারকেশ্বর যে কেবল মাস্টারদার অবর্তমানেই নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিল তা নয়—১৯২৪-২৮ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে আমরা যখন জেলে আটক ছিলাম

তখনও তারকেশ্বর, অর্দ্ধেন্দু দত্ত, মণীন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির ওপর নেতৃত্বভার ন্যস্ত ছিল। সেই সময় মুক্তি পেয়ে আমি বাইরে এলাম। গণেশ ও মাস্টারদা তখনও ছাড়া পাননি। আমাদের অবর্তমানে নেতৃত্বভার কাদের হাতে ন্যস্ত তা জানতে অবশ্য বেশী সময় লাগেনি। গোপন সংগঠনটিকে পরিচালনা করার দায়িত্ব-গ্রহণকারীদের খোঁজ পাওয়া সত্বেও তাদের কাছে আমি ধরা দিলাম না। আমার বিপ্লবী ষড়যন্ত্রকারী পদ্ধতিতে নিজ দক্ষতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বপ্রথমে অর্দ্ধেন্দু দত্তকেই বেছে নিলাম—তার সঙ্গে শর্ত হলো—সে যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বা যেসব কাজে লিপ্ত তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে —সে যেই হোক্ না কেন ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবে না।

অর্দ্ধেন্দুর হেপাজতে আমাদের দলের দু'তিনটি রিভলবার পিস্তল গোপনে রক্ষিত ছিল। এই মাপকাঠিতে বিচার করে "তখনকার মত" তার বৈপ্লবিক সততা সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আপন বিপ্লবী দলে কেবল আমরা দু'জনে আরো গোপন বড় যন্ত্রমূলক কাজে লিপ্ত হলাম। একেবারে প্রথম থেকেই এইরূপ সর্তক হয়ে এগিয়ে ছিলাম বলেই চট্টগ্রামের মত ছোট্ট সহরে পুলিশকে বোকা বানিয়ে "১৮ই এপ্রিল" সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত করা সম্ভব হয়েছিল।

অর্দ্ধেন্দু দত্ত বি. এস্. সি.-তে কৃতী ছাত্র। তারকেশ্বর দস্তিদারের সহপাঠী। তারকেশ্বরের প্রতি অর্দ্ধেন্দুর অগাধ বিশ্বাস। মাস্টারদা মুক্তি পেয়ে আমার পর দেখেছি তিনিও তারক, অর্দ্ধেন্দু ও রামকৃষ্ণের ওপরই খুব বেশী নির্ভর করতেন। তাই বলে কেউ যেন মনে করবেন না যে, মাস্টারদা সকল তরুণ বিপ্লবীদেরই কর্ম-শক্তি ও বিপ্লবী নিষ্ঠার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখতেন।

অর্দ্ধেন্দু ও আমার মধ্যে ঐরূপ "গোপন চুক্তি" ছিল বলেই আমি খুব সহজে ধরে ফেললাম কি করে আই, বি, ইনস্পেক্টার সারদা ভট্টাচার্য অম্বিকাদাকে বললেন—'...ঐ দিন আপনাদের রিভলভারটি আসকর খাঁ দীঘির পাড়ে একটি বাড়িতে ছিল।...' মূর্খ সারদাবাবু, "মূর্খ" অম্বিকাদা!—সেই খবরটি আবার স্বয়ং অম্বিকাদা দিয়েছেন আমার মত একটি "মূর্খ-ঘুঘুকে"! আমি অর্দ্ধেন্দুর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানলাম কোথায় এবং কে সে ব্যক্তি যে সেখানে রিভলভারটি রেখেছিল?

রিভলভারটি এনেছিলাম কার্তুজ তৈরী করার জন্য। চল্লিশ বছর আগে বয়স ছিল অনেক কম—জ্ঞানও বয়সের অনুপাতে সীমাবদ্ধ। তবু জেলে বসে চিন্তা করে মনে মনে (Theory-তে) রিভলভারের কার্তুজ তৈরী করার

একটি Design (নক্সা) ঠিক করেছিলাম। ১৯২৪—২৮ সালে জেলে যাওয়ার আগেও আমি রিভলভারের কার্তুজ তৈরী করি—কিন্তু খুব ভাল হয়নি। যুব-বিদ্রোহের পূর্বে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমার কর্মসূচী ছিল—প্রথম দিকে গোপনে কার্তুজ তৈরী করবো ও পরে আস্তে আস্তে আরো অনেককে পরখ করে নিয়ে বৃহত্তর কর্মসূচীতে হাত দেবো।

অর্দ্ধেন্দুর মারফৎ ৩০০ ব্যাসের একটি কোল্ট রিভলভার এনে নিজ বাড়িতেই কার্তুজ তৈরীর কাজ আরম্ভ করে সাফল্য লাভ করলাম। আজও মনে পড়ে কি আনন্দে মন প্রাণ সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল! অর্দ্ধেন্দুও সেদিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তার সেই আনন্দের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

"ষড়যন্ত্রমূলক বৈপ্লবিক কাজের" জন্য অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে "গোপন চুক্তি" করার পর অর্দ্ধেন্দু আমাকে বহুবার বলেছে—"দাদা আমি বলছি আপনি অনায়াসে তারকেশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন। সে আমার চেয়ে অনেক বেশী কর্মঠ, অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে—তার উপর আমার চেয়েও বেশী নির্ভর করতে পারবেন। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—আপনি কখন তার সঙ্গে দেখা করবেন তার জন্য সে খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে!"

রিভলভারের কার্তুজ তৈরীতে সাফল্যের পর অর্দ্ধেন্দু বারে বারে অনুরোধ করতে লাগলো আমি যেন তারকেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার না করি। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমার ও তারকেশ্বরের বৈপ্লবিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো।

অর্দ্ধেন্দুর অনুরোধে তারকেশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমার চেয়ে কিছুটা লম্বা, সুস্থ, সুন্দর চেহারা, শান্ত দুটি চোখ যেন প্রশ্নেভরা মনের ছবি আঁকা। বি, এস, সি পরীক্ষার্থী। তখনকার দিনের চট্টগ্রামের অনন্ত সিং—আমি তার সামনে! নিজের বড়াই নিজে করা যে কতখানি অশোভন তার সম্যক উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও কেবল তারকেশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্যই এখানে এর অবতারণা। কোন বিপ্লবী তরুণের এইরূপ দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার আর চোখে পড়েনি।"…আমি সে যুগের অনন্ত সিং! অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র-অভিযানের পুরোভাগের অনন্ত সিং! জমিদার বাড়ি লুঠ, রেল কোম্পানীর টাকা কারায়ত্বকারী অনন্ত সিং! নাগরখানা পাহাড়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনন্ত সিং! ন'টি মাস ধরে চট্টগ্রামের বুকের উপর আলোড়ন সৃষ্টি করে অম্বিকাদা ও অনন্ত সিংহের বিচার চলেছে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের আইনের কূটতর্কে বিপর্যস্ত পরাজিত হয়ে সরকার-পক্ষ মাস্টারদা ও অম্বিকাদার সঙ্গে অনন্ত সিংকেও সসম্মানে মুক্তি দানে বাধ্য হয়েছে। তারপর বিনাবিচারে জেলে আটক বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেই অনন্ত সিং শরীরচর্চার জন্য স্থানে স্থানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠাতে মন দিয়েছে। দেখতে দেখতে অনেক ক্লাব গড়ে উঠেছে—ব্যায়াম শিবিরে ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রদর্শনীতে লোহার পাত দোমরানো, চলন্ত মোটরগাড়ীর গতিরোধ করা, বুকের উপর দিয়ে ৮০ মণ ওজনের ভারী রোলার চালিয়ে এই অনন্ত সিং দর্শকবৃন্দের মনে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। তখনও গণেশ তারা মুক্তি লাভ করেনি। অনন্ত সিং ব্যায়ামাগার, শক্তি ও ক্রীড়া প্রদর্শনীতে অন্যান্যদের সঙ্গে বিশেষ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শান্তি রক্ষার কাজে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায়, গুণ্ডা দমন প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনন্ত সিংহের কাহিনী সাধারণের মনে চমক সৃষ্টি করে চলেছে!

অনন্ত সিংকে নিয়ে মাস্টারদার বিপ্লবী সংগঠনে সবাই গর্বিত! সেই অনন্ত সিং, তারকেশ্বর দস্তিদারের সামনে উপস্থিত। তারকেশ্বরও অনন্ত সিংকে সান্নিধ্যে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

তারপর ধীরে ধীরে তারকেশ্বরের ভিতরের আসল মানুষটির দৃঢ় বৈপ্লবিক মনের দ্বার আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো। আমার তৈরী রিভলভারের কার্তুজ নিয়ে কথা চলতে লাগল—"...দাদা, অনেকের কাছে অনেক কথা শুনে শুনে হতাশা হয়ে পড়েছি। কাউকে যেন আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। নিজের চোখে না দেখলে কোন কিছুতেই আস্থা রাখা সম্ভব নয়—। আপনি কিছু মনে করবেন না। কোনরূপ অশিষ্টতা প্রকাশ করলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি শুনেছি কার্তুজ তৈরীতে আপনি কৃতকার্য হয়েছেন। আমার ভয়ানক ইচ্ছা—পরীক্ষা করে দেখার। নিজে পরীক্ষা করে দেখার আগে আমি এর কৃতকার্যতায় বিশ্বাস করতে পারছি না। এ আমার জোর নয়। বহু ঠকেছি—বিশ্বাস করে কেবল ধোকাই খেয়েছি—আস্থা রাখতে গিয়ে দেখেছি কেবল তাসের ঘরই আমরা তৈরী করেছি। তাই আমার পক্ষে অন্যায় হলেও কোন দ্বিধা না রেখেই আমার মনের কথা খুলে বললাম—আপনার নিজ হাতে প্রস্তুত কার্তুজ কতখানি নির্ভরযোগ্য—তা আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চাই...।" তারক আমাকে অবাক করে দিল! আমার অতবড় ব্যক্তিত্ব মুহূর্তে সে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে মুখের উপর বলল—'পরীক্ষা না

করে বিশ্বাস করা যায় না। কারো ওপরেই আস্থা রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়—।' কেবল আশ্চর্য হয়েছিলাম তা নয়—মনে হয়েছিল এই তো একজন খাঁটি তরুণ বিপ্লবী পেলাম, আমার চেয়েও এই তরুণ বিপ্লবী কত বড, কত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তার বৈপ্লবিক অন্তরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালাম। একবার অবশ্য একটুখানি অবিশ্বাস মনের দরজায় উঁকি দিয়েছিল বৈকি! হস্তনির্মিত কার্তুজ নির্ভরযোগ্য কিনা—রিভলভার ফায়ার করে পরীক্ষা করতে চায—এর পেছনে পুলিশের কোন জাল পাতা নেই তো? মানুষ চেনার যেটুকু ক্ষমতা ছিল এবং অর্দ্ধেন্দুর মাধ্যমে তারকের সঙ্গে যেভাবে আমি পরিচিত তাতে তার সঙ্গে কথা বলার পর তাকে সন্দেহ করার মত কোন কারণ ছিল না। তবুও যদি তাকে আমি সন্দেহ করতাম, তবে আমিও আমার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বাস্তব জগতের কর্মক্ষেত্রে রিক্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে পডতাম। তারকের সঙ্গে আমিও আমার তৈরী কার্তুজ সফলতার সঙ্গে ফায়ার করে দেখলাম। তারপর থেকে তারকেশ্বর আমাকে চিনেছিল এবং আমিও নিশ্চয়ই তার মধ্যকার মঙ্গল মানুষটিকে চিনেছিলাম।

নিদারুণ বিস্ফোরণে আহত অর্দ্ধদগ্ধ, তারকেশ্বর মুমূর্ষু অবস্থায় আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো—"অনন্তদা, আপনি এসেছেন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি—আর কেউ পারবে না……আপনি আমাকে গুলী করুন…।" সে এক অসম্ভব নিদারুণ পরিস্থিতি! গুরুতরভাবে দগ্ধ তিনজন সাথীকে কোথায় লুকিয়ে রাখবো? তা ছাডা তারকেশ্বরের বেঁচে ওঠার কোন আশাই যেন ছিল না। আমি গণেশ আর মাস্টারদাকে বললাম—"উপায় নেই। তারককে এ ভীষণ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দেওয়া দরকার!" হয়ত সেইদিন সেই সময় তারকের শান্তির জন্য আমি তাকে গুলী করতাম—আর যদি তাই হতো, তবে চার বছর পরে দলের সাথীরা তার প্রাণদণ্ডের আয়োজনে গোপন সভায়—গোপনে বিচারের সুযোগ পেতেন না। সেই সময় বন্ধু গণেশ ঘোষ দৃঢতার সঙ্গে আমাকে ঐ ব্যাপারে নিরস্ত করেছিলেন এবং অগ্নিদগ্ধ তারক ও অর্দ্ধেন্দুকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম।

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার ছোট্ট গ্রাম—বারাসত। গ্রাম্য পরিবেশে সারদাবাবুর অতি সাধারণ ছোট্ট বাডিটি। বিপ্লবীদলের চেনা

সদস্যদের তিনি সাবদা-দা। এঁরই বাড়িতে তারক, কল্পনা ও কালী দে আত্মগোপন করে আছে। যে সব বাড়িতে বাড়ির পরিজনদের সঙ্গে বিপ্লবীদলের সভ্যেরা আত্মগোপন করে থাকতেন সেই সব বাড়ির লোকদের শ্রদ্ধা, সমর্থন ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিপ্লবীরা সব সময় যত্নবান হতেন। শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা একসঙ্গে এক আশ্রয়ে থাকলেও তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানের অভাব ছিল না।

ধলঘাটের যে বাড়িতে নির্মলদা ও অপূর্ব সেন শহীদের গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুবরণ করেন স্নেহলতা সেই বাড়ির সাবিত্রী মাসীমারই কন্যা। কন্যা স্নেহলতাকে পুলিশ বন্দী করে। স্নেহলতা স্বামীর আদেশে মাস্টারদা, তারক ও কল্পনার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সাক্ষী দেয়। কলকাতা হাইকোর্ট মাস্টারদার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে যে জাজ্‌মেণ্ট দিয়েছে, সেই মুদ্রিত জাজ্‌মেণ্টের ৫৮ পৃষ্ঠা থেকে স্নেহলতার সাক্ষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :—

"This photograph (Ex 68) is of Masterda. He is in Dock (identifies Surjya Sen). He was in our house on the night of firing. Ashuda, Manindra and Masterda had been in our house for eight days. They used to remain upstairs··· I saw her in our house. She was in our house on the night of firing. She came to our house two days before the firing. She used to sleep downstairs with my mother·· ··· I gave evidence in the Dhalghata harbouring case. I did not mention then about the presence of the girl in our house··· My mother and brother were convicted in the harbouring case······. I remember the day when there was firing in our house. It would be about a year ago······I know a man by the name kshirode. Masterda (pointing Surjya Sen in Dock) is also called kshirode· ····I say, this Chaddar is Masterda's and I have seen him to wear it......"

মাস্টারদাকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মাতা ও ভ্রাতা অভিযুক্ত। আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধেই কন্যা স্নেহলতার এই সাক্ষ্যদান। ভ্রাতা রামকৃষ্ণ জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন সুরু করলেন করলেন। জেলে অনশন করা গুরুতর অপরাধ। কাজেই অনশনের সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণের পায়ে

লোহার "ডাণ্ডা-বেড়ী" পড়লো—চরম দৈহিক অত্যাচার আরম্ভ হোল। মরণ-শঙ্কাহীন, দৃঢ়চিত্ত রামকৃষ্ণের সুকুমার ক্ষীণ দেহ এই বর্বর অত্যাচার সহনে সক্ষম হলো না—সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নির্মম যুপকাষ্ঠে এই তরুণ যুবক উৎসর্গীকৃত হোল। আরও এক বছর পরে ভগ্নী স্নেহলতার সাক্ষ্যে প্রমাণ হোল "ক্ষীরোদ' ছদ্মনামে মাস্টারদা সেই বাড়ীতে থাকতেন এবং তাঁর গায়ের একটা চাদরও স্নেহলতা সনাক্ত করলো। ক্যাপ্টেন্ কেমারন যেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন সেখানে মাস্টারদা' যে উপস্থিত ছিলেন—এইটি প্রমাণ করাই সরকার-পক্ষের উদ্দেশ্য। স্নেহলতার সাক্ষ্যে আরও জানা গেল যে, একটি মেয়েও দুদিন আগে এই বাড়িতে আসে এবং সে স্নেহলতার মায়ের সঙ্গে নীচে ঘুমোতো।

দিন ঘনিয়ে এলো। রোমের সিংহাসনে জুলিয়াস সিজারের (Julius Ceasar) আর অধিকার নেই। জরুরী সভায় যোগদানের জন্য সংগঠকদের কাছে নির্দেশ গেল। চট্টগ্রাম শহর হতে চোদ্দ মাইল দূরে—'কুমীরা' নামক স্থানে সুরেশ বণিকের বাড়িতে গোপন সভার আয়োজন হ'ল। সুরেশ বণিক আমাদের দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর দায়িত্ব জ্ঞান, কর্মতৎপরতা ও চট্টগ্রামের ফেরারী যুব বিদ্রোহীদের আশ্রয়দানের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

সুরেশের বাড়িতে এই গোপন-সভার আয়োজন—মহাকবি শেক্সপীয়র রচিত "Julius Ceasar" নাটকের ব্রুটাসের বাড়ির ফলের বাগানের অশুভ দৃশ্যটিকেই যেন আজ স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত করে তুলছে বিনিদ্র রজনীতে ব্রুটাসের নিদারুণ অস্থিরতা—ভৃত্য লুসিয়াসকে (lucious) তিনি বারে বারে জিজ্ঞাসা করছেন—"রাত আর কত বাকী?" লুসিয়াস্ বন্ধ খামে ব্রুটাসের হাতে গোপনপত্রখানি এনে দিল—ছদ্মনামে লেখা বন্ধুদের পত্র পড়ে রোমের প্রতি কর্তব্য সাধনের জন্য জুলিয়াস্ সিজারের অপসারণের যে একান্ত প্রয়োজন সে সম্বন্ধে ব্রুটাস্ নিজের মনে আলোচনা করে স্বগতোক্তি করলেন—"It must be by his death : and, for my part, I know no personal cause to spurn at him, but for the general····· ". গভীর মনের অতলস্পর্শী জিজ্ঞাসাকে পাশ কাটিয়ে ব্রুটাসের স্বগতোক্তি শোনা গেল—"না, না, এতো আমার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপার নয়—সর্ব-সাধারণের কল্যাণ কামনায় এ যে আমার কর্তব্য!"

ব্রুটাস চিন্তিত—উদ্বিগ্ন—অশান্ত! জুলিয়াস্ সিজারকে রোমের সিংহাসন

হতে তথা এই পৃথিবী হতে চিকালের জন্য অপসারিত করার চেষ্টায় সেই রাত্রে ক্রটাসের সঙ্গে মিলিত হলেন—Cassius, Casea, Decius, Cinna, Metellus, Cimber, Terbonius এবং সর্বশেষে ব্রুটাসকে অনুসরণ করলেন Lagarius।

সেই গভীর রাত্রে ফলবাগানের এই গুপ্ত-সভায় ব্রুটাসের সহধর্মিনী Potria হঠাৎ প্রবেশ করে ব্রুটাস্কে সচকিত করে তুললেন। তার চোখ স্বামীর প্রাত্যহিক জীবনের ছোট্ট ছোট্ট সূক্ষ্মতম ব্যতিক্রমগুলি ধরা পড়েছে! স্বামী কেন এত বিষাদগ্রস্ত, কেন এত অসুস্থ, কেন এত চিন্তিত—আকুল হয়ে Portia তা' জানতে চইছেন—

> "Why you are heavy, and what men to-night
> Had have resort to you, for here have been
> Some six or seven, who did hide their faces
> Even from darkness."

—এই গভীর রাত্রে এত লোক নিয়ে কেন তুমি এত ব্যস্ত?—এই সাত আটজন লোক অন্ধকারেও কেন তাদের মুখ ঢেকে রাখতে চেষ্টা করছে?

সুরেশ বণিকের বাড়ির গোপন সভায় জুলিয়াস্ সিজার হত্যার ষড়যন্ত্রে মিলিত ব্রুটাস্ বা কেসিয়াস প্রমুখ কেউই নেই। রোমের মঙ্গলের জন্য—রোমের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্রুটাস্, কেসিয়াস্ প্রমুখের দায়িত্ব অনেক। মাস্টারদার অবর্তমানে—চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সংগঠনের মঙ্গলের জন্য সভ্যদের নৈতিক মানের উন্নতির জন্য গুরুতর দায়িত্ববোধই সংগঠকদের এই গোপন সভা! উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সদস্য সভাপতির আসন অলংকৃত করে উপবিষ্ট। এই গোপনসভায় মিলিত সংগঠকেরা স্থির করবেন—তারকেশ্বর দস্তিদারের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থাকা সংগঠনের অগ্রগতির পথে সহায়ক, নাকি ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর ঐতিহ্যের প্রতি একটা প্রচণ্ড বাধা।

সেই গুপ্ত-সভায় মিলিত সদস্যরা সকলেই অকৃতদার। যদি ব্রুটাসের সহধর্মিনীর মত কারও পত্নী থাকতেন তবে হয়ত স্বামীর খাওয়ার টেবিলে অন্যমনস্কতা, কোন সামান্য প্রশ্নে চম্‌কে ওঠা, দু'টি কথা বলতে গেলেও অধৈর্যভাব, ম্লান, বিষণ্ণ মুখে ঘন কালীমার ছায়ায় "ব্রুটাসের" অবয়ব ঢাকা পড়ে গেছে দেখে তিনিও হয়ত প্রশ্ন করতেন—"এরা কারা? রজনীর গাঢ় মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে থেকেও মুখ ঢাকতে চাইছে!"

সভার কাজ স্বরু হোল। গুরুগম্ভীর ভাব। সভায় তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা অনুপস্থিত। তাদের অনুপস্থিতিতেই তারা দোষী সাব্যস্ত হোল। ঋষি বঙ্কিমের "আনন্দমঠ"ই তখনকার আইন গ্রন্থ—নবীনানন্দ ও জীবানন্দ, মহেন্দ্র ও কল্যাণী। স্বামী সত্যানন্দের মহান্ আদর্শ মাষ্টারদার বিপ্লবী সংগঠনের সভ্যদের আদর্শ ও সাধনা। সহকর্মী বিপ্লবী ফুটুদা ও কল্পনার একত্রে চলাফেরা—বিপ্লবী ছেলে মেয়ের বন্ধুত্ব আনন্দমঠের আইন-শাস্ত্র বহির্ভূত! কাজেই তারকেশ্বর নিশ্চয়ই দোষী—সব দোষ তার।

সেই গুপ্ত-সভায় যে আটজন উপস্থিত ছিলেন তাদের প্রায় সবার কাছ হতেই বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই ঘটনার বর্ণনাকারীদের মধ্যে চারজনের কাছ থেকেই authentic ও objective বিবরণ শুনেছি। জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিবরণ বিচার করে যা সত্য ও স্বাভাবিক মনে হয়েছে তাই পরিবেশন করেছি।

সেই দিন গুপ্ত-সভায় শেষ পর্যন্ত তারকেশ্বরের মৃত্যুদণ্ডই বহাল হোল। সকলেই চুপ চাপ মুখে কথা নেই। এই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ক্ষীণকণ্ঠের জিজ্ঞাসা শোনা গেল—"আমি জানতে চাই - 'ফুটুদাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক্', এই বিষয়ে আমরা সকলেই কি একমত? তাকে কি আমরা গুলী করে মারবো?"

ছোট্ট ঘরের পরিবেশ আলোড়িত করে উত্তর এলো—"হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই এই মত।" "আমাদের সকলেরই এই মত" কথাটি সভাপতির মুখেই শোনা গেল। ঘরের চারটি দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হোল—"And thou too Brutus!" প্রত্যেকেই নিজের মুখে এই মৃত্যুদণ্ডের স্বপক্ষে বলেছিল কিনা নানাভাবে জানবার চেষ্টায় এইটুকু বুঝেছি যে, সভাপতি ভিন্ন উপস্থিত অন্যান্য সদস্যেরা সকলেই চুপ করেছিলেন। মৌন থাকাতেই এ ব্যাপারে তাঁদের সম্মতি বোঝা গিয়েছিল।

আনন্দমঠের স্বামী সত্যানন্দ এই সভাকক্ষের অন্তরালে দাড়িয়ে ভাবছিলেন—"বিচ্যুতি, স্খলন বা পতনের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের অধিকার আমি কি কাউকে দিয়েছিলাম? কাউকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ভেবে তার ওপরেও কি ঐরূপ গুরুদায়িত্ব আমি অর্পণ করতে পেরেছিলাম? সাধারণ পরিবেশের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে 'নৈতিক স্খলনের' জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার আমার নিজেরও আছে বলেও কি কখনও ভাবতে পেরেছিলাম? আজ এই সভায় যাঁরা তারকেশ্বরের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন

করলেন তাঁদের সেই অধিকারজারীর নৈতিক উৎস কোথায়? আমি কেবল সন্তানসেনার অধিনায়কদের শিখিয়েছিলাম তাঁরা নিজেরাই যেন তাঁদের স্খলন বা নৈতিক পতনের জন্য যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন। তাই তো জীবানন্দ, ভবানন্দ নিজেদের প্রাণ বিসর্জনে 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলে— ।...... আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-জীবনের এই ছিল আদর্শ ও শিক্ষা।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে আনন্দমঠের ভাবধারারও নতুন রূপ পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অবিস্মরণীয় উপন্যাস "পথের দাবী:তে"—ডাক্তার, অপূর্ব, ভারতী তলওয়ারকার প্রভৃতির অতি স্বাভাবিক জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে বৈপ্লবিক সংগঠনের মধ্যে এইরূপ সমস্যার সমাধান রচনা করেছেন। মনে হয় মাস্টারদা বেঁচে থাকলে যুগের এই এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও "পথের দাবী"র ডাক্তারের ভূমিকা অনুসরণ করে এই অতি সহজ ও সাধারণ সমস্যার সমাধান করতেন।

ফাঁকি দিয়ে কোন অজুহাতে তারকেশ্বরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা হবে সে প্ল্যানও এই গুপ্তসভায় স্থির হোল। তারকেশ্বর যাকে খুব বিশ্বাস করে, সে রকম "একজনকেই" তারককে ডেকে আনবার ভার দেওয়া হোল। তারপর কিভাবে কে তাকে হত্যা করবে তারও সব ব্যবস্থা স্থির হোল। দু'এক দিনের মধ্যেই দলের সভ্যদের এই বিশেষ কর্মকাণ্ড সমাপনের বিশেষ বিশেষ কার্যভার গ্রহণ করার কথা।

এখানে আরও একটি বলা প্রয়োজন। তারকেশ্বরের—হত্যা-চক্র সম্বন্ধে যা লিখলাম তা' বাস্তব সত্য। কারও বিরুদ্ধে কিছু লেখবার কিছুমাত্র উৎসাহ বা উদ্দেশ্য আমার নেই। বিপ্লবী যুগের যে অধ্যায়টির সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচিতি তার সার্বিক চিত্রটি দেওয়ার প্রয়োজনেই এই ঘটনার অবতারণা। তারকেশ্বর দস্তিদারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে কা'র কি ভূমিকা এবং কে কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল, বর্তমানে তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ অবস্থা পরিবেশে বিপ্লবী সংগঠনের আভ্যন্তরিক যে ছবি রচিত হয়েছে তার বাস্তব রূপ প্রকাশের প্রয়োজনেই এই ঘটনার পরিবেশন ও বিশ্লেষণ।

বাস্তব ঘটনাটিই যদি ত্রুটিহীনভাবে উপস্থাপিত করতে পারি তবেই এই বিশেষ ভয়াবহ ইতিহাসের পাতা কটি ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ভুল পথের ইঙ্গিত দিতে সাহায্য করবে।

প্রথম প্রশ্ন হলো বাস্তব ঘটনাটি আমি নির্ভুলভাবে পরিবেশন করেছি

কিনা ? এই ঘটনার অন্তরকম বিবরণ আমি শুনেছি। দায়িত্বশীল নেতৃস্থানীয় কোন কোন বিপ্লবী পাঠকের মুখেই এর বিশেষ জোরদার বিকল্প কাহিনী শুনেছি তাঁদের বিবরণ এইরূপ: "কুমিরাতে গোপন সভায় যে আমারা আটজন মিলিত হয়েছিলাম তা সত্য। সেই সভায় আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—কারাগার হতে মাস্টারদাকে মুক্ত করে আনা। আমরা—চট্টগ্রাম শাখার গণতন্ত্র বাহিনীর সৈন্যদল সর্বশক্তি নিয়োগে জেল আক্রমণ করবো এবং সিংহদ্বার ভেঙ্গে মাস্টারদাকে উদ্ধার করে আনবো। এই সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত প্লানও রচনা করি······সেই সভায় তারক ও কল্পনাকে নিয়ে মামুলি ধরণের সামান্য আলোচনা মাত্র হয়েছিল। তারক ও কল্পনার প্রশ্নে আমাদের তিনটি বিকল্প সিদ্ধান্ত ছিল—(২) আমরা কল্পনাকে কোন action-এ পাঠাবো এবং সেখানে যুদ্ধে সে প্রাণ দেবে। (২) তারক ও কল্পনাকে একসঙ্গে কোন action-এ পাঠাবো এবং সেখানে তারা দুইজনেই মৃত্যুবরণ করবে। (৩) তৃতীয়তঃ আমাদের সবার সঙ্গে জেল ভাঙ্গার অভিযানে তারা দু'জনেও অংশ গ্রহণ করবে।····· এই গোপনসভায় তারকেশ্বরের মৃত্যুদণ্ড বিধানের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। প্রধান কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার সময় খুব casually তারকেশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে এবং সেই প্রশ্ন পূর্বে বিবৃত তিনটি ব্যবস্থার যে কোন একটির মাধ্যমে সামাধান করার ইচ্ছাই আমরা প্রকাশ করেছিলাম······।"

এই ভাষ্যের সত্যতা বাস্তবতার কষ্টিপাথরে একান্তভাবেই ম্লান হয়ে পড়ে। জেল ভেঙ্গে মাস্টারদার উদ্ধারই যদি এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তবে তারক কল্পনারও সেখানে উপস্থিত থাকার কথা। তাদের বাদ দিয়েই কেন এই সভার গোপন অনুষ্ঠান ? কাজেই অনায়সেই ধরে নেওয়া যায় যে তারকেশ্বরের মৃত্যুদণ্ড বিধানই কুমিরার এই গোপন-সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

তাছাড়া এঁদের মুখেই শুনেছি এক ঘণ্টার মধ্যেই এই সভার কাজ শেষ হয়েছিল। জেল ভাঙ্গবার পরিকল্পনা ও সেইরূপ একটি অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ অ্যাকশনের বাস্তব প্ল্যান এক ঘণ্টায় স্থির করা সম্ভব নয়।

স্বয়ং মাস্টারদা জেলে বন্দী! কর্তৃপক্ষের চোখে ঘুম নেই। পুলিশ ও মিলিটারীর কড়া সর্তক পাহাড়ায় চট্টগ্রাম জেল সুরক্ষিত—। Eastern Frontier Riflesএর এক কোম্পানী সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য জেলের চারিপাশের কাঁটা তারের ঘেরার বাইরে দুর্ভেদ্য শিবির স্থাপন করে জাঁকিয়ে বসেছে। এইরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুব্যূহের বিরুদ্ধে operation-এর জন্য যদি বাস্তব

প্ল্যান গ্রহণ করতে হয়, তা কার্য্যকারী করার চেষ্টায় লোকবল, অস্ত্রবল ও যানবাহনের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাঁদের কাছ থেকেই শুনেছি এবং পাহাড়তলীতে ইউরোপীয়ান ক্লাব-আক্রমণের বিবরণ থেকেও জেনেছি যে সেই সময়ে আমাদের অস্ত্রের ভাণ্ডার শূন্য প্রায়—সংগঠনে নির্ভীক যুবকের সংখ্যাও ক্রমেই কমে আসছিল। ঐরূপ "Desperately জেল ভাঙ্গার পরিকল্পনার "বাস্তব রূপ দিতে যে একটি বলিষ্ঠ Shock troops Detachment এর প্রয়োজন এবং তাদের সঙ্গে যে যানবাহনের ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে থাকা উচিত, তা কি অস্বীকার করা যায় ?

ভাবাকুল মনের বাসনা এক কথা, আর বাস্তবে জেল ভেঙ্গে মাস্টারদাকে উদ্ধার করে আনার সত্যিকার প্ল্যান করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। যদি মাস্টারদাকে উদ্ধার করে আনা বা মাস্টারদার ফাঁসী রোধ করার উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য নিয়ে কুমিরায় গোপন-সভার আয়োজন করা হয়েছিল—এবং এটাই যদি তাদের মুখ্য কর্মসূচী ছিল তবে নিঃসন্দেহে যে কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে যে তারকেশ্বর কল্পনাকে নিয়ে এই অতি তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনার কোন স্থানই সেখানে থাকতে পারে না। এই অতীত ঘটনাটির বিবরণ দিতে গিয়ে আজ কোন পক্ষই এইটুকু কোন মতেই অস্বীকার করতে পারছেন না যে—সে সভায় তারকেশ্বর কল্পনাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি—এবং তাদের প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার অভিমত—মাস্টারদাকে উদ্ধার করে আনার প্ল্যানটি একান্তই মানসিক—সংগঠকদের ভাবপ্রবণ মনের একটা বিলাসস্বপ্ন মাত্র, বাস্তবতার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই ছিল না। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তারকেশ্বরের মৃত্যুদণ্ড।

বৈপ্লবিক কর্মশক্তি হারিয়ে সংগঠন যখন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে, ও শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানার সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তখনই আত্মঘাতি কলহ, তিক্ততা ও পারস্পরিক শত্রুতা—সংগঠনের সভাদের স্বার্থপরতা ও পরাজিত মনোভাবের অগাধ পঙ্কে নিমজ্জিত করে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত